ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

ডিসেম্বর ২০১৭ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ৩০

বিশেষ সংখ্যা

ক্রেতা সুরক্ষা

ক্রেতা অধিকার ও সচেতনতা : নীতি ও আইনকানুন
অবিনাশ কে. শ্রীবাস্তব

ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা : সূচনা ও হালফিলের অবস্থা
ডি. পি. এস. বর্মা

ডিজিটাল ভারতের সাফল্যের অন্যতম শর্ত ক্রেতাসাধারণের সুরক্ষা
সীতারাম দীক্ষিত

ক্রেতা সুরক্ষায় নতুন আইন
পুষ্পা গিরিমাজি

JAGO GRAHAK JAGO

मानकः पथप्रदर्शकः

বিশেষ নিবন্ধ

ক্রেতা অভিযোগ ফয়সালা : বিধিবদ্ধ আইনি সংস্থান
বি. সি. গুপ্ত

ফোকাস

প্রসঙ্গ আর্থিক পরিষেবা উপভোক্তার স্বার্থরক্ষা
জি. সুন্দরম

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে নতুন ট্রেন, বন্ধন এক্সপ্রেস

কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস, ভারত ও বাংলাদেশ, দু'দেশের মধ্যে নতুন এই ট্রেনের আনুষ্ঠানিক চলাচল শুরু হল কলকাতা স্টেশন থেকে গত ৯ নভেম্বর, ২০১৭ দিনটিতে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই যাত্রার শুভ সূচনা করেন। এছাড়াও দুই দেশের সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব যৌথভাবে আরও দু'টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে। একটি হল বাংলাদেশের ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে দ্বিতীয় ভৈরব ও দ্বিতীয় তিতাস রেলসেতুর উদ্বোধন। এবং দ্বিতীয়টি, মৈত্রী এক্সপ্রেস ও বন্ধন এক্সপ্রেসের যাত্রীদের জন্য কলকাতা স্টেশনে এন্ড-টু-এন্ড অভিবাসন ও শুল্ক ছাড়পত্রের বন্দোবস্ত-সহ আন্তর্জাতিক রেলযাত্রী টার্মিনাসের উদ্বোধন। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় করতে ও সমঝোতা বাড়াতে সীমান্তের দু'পারের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানো দরকার। মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেন দু'টি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির সূত্রে মানুষের মধ্যের সেই যোগসূত্রকেই আরও মজবুত করে তুলবে। বাংলাদেশে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়ে তথা সম্পূর্ণ করে ভারত যে ইদানীংকালে বাংলাদেশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাথী দেশ হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছে, সেই বিষয়টির প্রতি প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই উদ্যোগের মুক্তকণ্ঠে তারিফ করে আশা প্রকাশ করেন যে উভয় দেশের মধ্যে রেল সংযোগ ও যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতে এধরনের আরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এন্ড-টু-এন্ড অভিবাসন ও শুল্ক ছাড়পত্রের বন্দোবস্ত-সহ আন্তর্জাতিক রেলযাত্রী টার্মিনাসের উদ্বোধনের ফলে মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেন দু'টির যাত্রাপথের সময় যে অনেকটাই কমে আসবে সে তথ্যটির প্রতি শেখ হাসিনা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গত ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের মধ্যে মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনটির পর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চালু হওয়া দ্বিতীয় ট্রেন হল বন্ধন এক্সপ্রেস। দু'দেশের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী যোগাযোগের সুযোগ বাড়াতে পেট্রাপোল-বেনাপোল রুটে কলকাতা থেকে খুলনা পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করবে এই ট্রেন। আপাতত বন্ধন এক্সপ্রেস প্রতি সপ্তাহে কেবল বৃহস্পতিবার যাতায়াত করবে। এদেশের মাটিতে অভিবাসন ও শুল্ক দপ্তরের পরীক্ষা করা হবে কলকাতা স্টেশনের আন্তর্জাতিক যাত্রী টার্মিনালে। রেল মন্ত্রক অভিবাসন ও শুল্ক দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে কলকাতা স্টেশনে এজন্য আন্তর্জাতিক রেলযাত্রী টার্মিনাসটি (International Rail Passenger Terminus) গড়ে তুলেছে যথাযথ পরিকাঠামো ও সুযোগসুবিধা-সহ। বাংলাদেশে আপাতত এই দুই পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে বেনাপোল সীমান্তে। পরে এজন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে খুলনা স্টেশনে। এর ফলে বন্ধন এক্সপ্রেসের সাথে সাথে মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রীরাও প্রভূত উপকৃত হবেন। কারণ, এতদিন মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের আনুষ্ঠানিকতা সারতে হ'ত চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ও মুর্শিদাবাদের গেদে সীমান্তে। এবার থেকে ওই ট্রেনের বাংলাদেশ অংশের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবে ঢাকা ছাড়ার আগেই। গন্তব্য শেষে কলকাতা স্টেশনে হবে ভারতীয় অংশের ইমিগ্রেশন। তাতে যাত্রীদের ভোগান্তি কমার পাশাপাশি যাত্রার সময়ও কমে আসবে তিন ঘণ্টা।

ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে ভৈরব ও তিতাসের পুরোনো সেতু দু'টি নির্মাণ করা হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। ভারত সরকারের সহযোগিতায় সেখানে নতুন দু'টি সেতু তৈরি হওয়ায় ডাবল লাইনে ক্রসিং ছাড়াই ট্রেন চলাচল করতে পারবে এবং যাতায়াতের সময় ১৫ মিনিট কমে যাবে। ভারতীয় ঠিকাদার ও কনসালট্যান্টরা এই এক কিলোমিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় ভৈরব রেলসেতুটি মেঘনা নদীর উপর নির্মাণ করেন ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে। তিতাস নদীর উপর ২১৮ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় তিতাস রেলসেতু নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্প দু'টির মোট ব্যয়ের, অর্থাৎ, এই একশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা এক হাজার কোটি টাকার মধ্যে ঋণ হিসাবে ভারত দিয়েছে ৮২৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।❑

ডিসেম্বর, ২০১৭

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ক্রেতা অধিকার ও সচেতনতা : নীতি ও আইনকানুন — অবিনাশ কে. শ্রীবাস্তব ৫
- ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা : সূচনা ও হালফিলের অবস্থা — ডি. পি. এস. বর্মা ১১
- ডিজিটাল ভারতের সাফল্যের অন্যতম শর্ত ক্রেতাসাধারণের সুরক্ষা — সীতারাম দীক্ষিত ১৪
- ক্রেতা সুরক্ষায় নতুন আইন — পুষ্পা গিরিমাজি ১৮
- ক্রেতা সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা : ভারতের প্রেক্ষাপট — চন্দ্রকান্ত লহরিয়া ২১
- উপভোক্তা সচেতনতা ও সুরক্ষায় দেশে অগ্রণী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ — অরুণ কর ২৭
- ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় গ্রাহকের অধিকার — দিবাকর লেঙ্কা ৩৪
- গ্রামের ক্রেতাকে সচেতন করতে — রাহুল সিং ৩৮
- ভারতীয় মানক ব্যুরো : গ্রাহকের সুরক্ষা ঢাল — — ৪৪
- উপভোক্তার উপর জিএসটি-র কী প্রভাব? — টি. এন. অশোক ৪৮

বিশেষ নিবন্ধ

- ক্রেতা অভিযোগ ফয়সালা : বিধিবদ্ধ আইনি সংস্থান — বি. সি. গুপ্তা ৫২

ফোকাস

- প্রসঙ্গ আর্থিক পরিষেবা উপভোক্তার স্বার্থরক্ষা — জি. সুন্দরম ৫৬

অন্যান্য নিবন্ধ

- উচ্চ ফলন ও আর্থিক মুনাফার লক্ষ্যে ফসল বৈচিত্র্য — রীতেশ সাহা, সিতাংশু সরকার, বিজন মজুমদার ও সোনালি ভট্টাচার্য্য ৬০
- ভারতমালা পরিযোজনা — জি. রঘুরাম ৬৬

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো ৬৯
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৭১
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৭২
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৭৪
- উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

গ্রাহকই রাজা

মানুষ কোনও কিছু কেনাকাটা করতে গিয়ে প্রথমেই যে জিনিসটা বেশ মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয়, তা হল দামের লেবেলটি। নিজের বাজেটে কুলাচ্ছে কিনা দামটা, প্রাথমিকভাবে সেটাই ব্যক্তিবিশেষের কাছে একমাত্র জিজ্ঞাস্য হয়ে দাঁড়ায় প্রায়শই। জিনিসটা কতটা টেঁকসই বা তার Expiry Date ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামানোটা আমাদের ধাতে নেই বললেই চলে। ক্রেতা সচেতনতার শুরুটা হয় এখান থেকেই। বিক্রেতা বা ব্যবসায়ীরা হরেক ফন্দিফিকিরের মাধ্যমে গ্রাহক তথা ক্রেতাদের হামেশাই ঠকিয়ে চলে। কখনও অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য দিয়ে, কখনও ওজনে কম দিয়ে বা দাম বেশি নিয়ে, আবার কখনও বা নিম্নমানের পণ্য গছিয়ে। এধরনের অনৈতিক আচরণের দরুন ক্রেতারা যে কেবল আর্থিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হন এমনটা নয়, তাদের শরীর-স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা হানিকারক প্রতিপন্ন হতে পারে এবং মানসিক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ও বিশ্বায়নের এই বাজারে সমস্ত পণ্য উৎপাদকই সর্বোচ্চ মুনাফালাভের লক্ষ্যে আদাজল খেয়ে লড়ে যাচ্ছেন। আর গ্রাহক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সেই লক্ষ্যপূরণে হাতিয়ার হিসাবে বেছে নেওয়া হচ্ছে আগ্রাসী ও মানুষকে বিপথে চালিত করার মতো বিজ্ঞাপন ও বিপণন প্রক্রিয়াকে। কাজেই এই প্রেক্ষাপটে, কোনও পণ্য কেনাকাটা তথা পরিষেবা নেওয়ার আগে তার বিশদ খুঁটিনাটি জেনে নেওয়াটা এবং নিজেদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করাটা গ্রাহক, উপভোক্তা বা ক্রেতাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রেতা হিসাবে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠতে পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য বা MRP যাচাই করা, কোনও দীর্ঘ আইনি দস্তাবেজে সই করার আগে তা আগাগোড়া ভালোভাবে পড়ে দেখা, সম্পত্তি ক্রয় ইত্যাদির মতো বড়োসড়ো লেনদেনের সময় যাবতীয় দিক খতিয়ে দেখে তবে এগোনো উচিৎ। খাদ্যসামগ্রী, মুদিখানা সামগ্রী ইত্যাদি কেনাকাটার সময় উৎপাদনের দিনক্ষণ, কতদিন পর্যন্ত নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য, কী কী উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে তার তালিকা ইত্যাদি বিশদভাবে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঝুঁকিটা মাথার উপর খাঁড়ার মতো ঝুলতে থাকে।

পরিষেবার ক্ষেত্রে গ্রাহক সচেতনতার বিষয়টি অবশ্য বেশ খানিকটা জটিল। পরিষেবার ক্ষেত্রে গ্রাহকের অধিকারের ধারণাটির বিষয়ে অধিকাংশ মানুষই খুব একটা অবগত নন। আমাদের কাছে অজানা নয় যে, হাসপাতালগুলি হরবখত রোগী বা তার পরিজনদের ফাঁকা ফর্মে তথা আমজনতার কাছে সহজবোধ্য নয় এমন পরিভাষায় লেখা ফর্মে সই করিয়ে থাকে। আর রোগী বা তার পরিজনেরাও উদ্বেগ ও বিহ্বলতার এমন ঘোরের মধ্যে থাকেন যে, কিসে সই করছেন, তার পরিণতি কী হতে পারে, না পারে ঠিকমতো সেসব না জেনেবুঝেই চোখকান বুঁজে যেখানে বলা হয় সেখানেই সই করে দেন। পরে যখন এই ভুক্তভোগী গ্রাহকেরা আইন-আদালতের দ্বারস্থ হন, উল্লিখিত ফর্মগুলি তাদের সম্মতির প্রমাণপত্র হিসাবে পেশ করা হয়। বিল্ডার, ঋণ প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রত্যক্ষ করা যায়। হরবখত এমন গোল গোল পরিভাষা ব্যবহার করে এসব দস্তাবেজ প্রস্তুত করা হয় যে মানুষজন ঋণ নেওয়ার বা বাড়িঘর, ফ্ল্যাট কেনার সময় কী লেখা কাগজপত্রে সইসাবুদ করছেন তা বুঝতেই পারেন না এবং অন্যপক্ষ তাদের বোকা বানিয়ে চলে যায়।

এই জায়গাতেই গ্রাহক অধিকার এবং গ্রাহক সুরক্ষার প্রশ্নটি চলে আসে। গ্রাহক সুরক্ষার ধারণাটি আদপেই নতুন কিছু নয়। আমাদের প্রাচীন লেখাপত্রেও এর উল্লেখ আছে। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে গ্রাহক সুরক্ষার উপর যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তাতে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, ভারতে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, কৌটিল্যের সময়েই কীভাবে ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা উচিত তথা গ্রাহকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে হবে সে বিষয়ে সরকারের জন্য নীতিনির্দেশিকা ছিল।

আধুনিক ভারতে গ্রাহক সুরক্ষা আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৮৬ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইন (Consumer Protection Act of 1986) প্রণয়নের মাধ্যমে। এই আইনে পণ্য ক্রয় এবং পরিষেবা গ্রহণ উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট গ্রাহক বা ক্রেতার স্বার্থ সুরক্ষায় বহু সূত্র বা ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই আইনটির সংশোধনের জন্যই সরকার ক্রেতা সুরক্ষা বিল এনেছে। বিলটি সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এছাড়াও পণ্য ও পরিষেবার গুণমান যাচাইয়ের জন্য সরকারের তরফে বিভিন্ন ধরনের মানক (standards) ও মানদণ্ড (measurements) প্রচলন করা হয়েছে। যেমন, ISI চিহ্ন, গয়নার জন্য হলমার্ক, রেশম সামগ্রীর জন্য সিল্কমার্ক, এবং অতি সম্প্রতি RERA (রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে প্রচলিত অনৈতিক রেওয়াজের বিরুদ্ধে গ্রাহক বা ক্রেতাদের সুরক্ষাকবচ হিসাবে সরকারের তরফে গৃহীত এবং যুগান্তকারী নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ)। সরাসরি উপকার হস্তান্তর (DBT), উজ্জ্বালা (Ujjawala) ইত্যাদির মতো আরও বেশকিছু উদ্যোগের মাধ্যমেও আমজনতার স্বার্থ সুরক্ষিত করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ন্যায্য সুবিধা প্রাপকদের এখন আর বঞ্চিত করতে পারছে না এক শ্রেণির দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ। ভুক্তভোগী গ্রাহক বা ক্রেতাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সে বিষয়েও পণ্য ও পরিষেবার উপভোক্তা, ক্রেতা বা গ্রাহকদের অবগত থাকাটাও সমান জরুরি। ক্রেতা সুরক্ষা আইনের আওতাতেই ক্রেতা অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাপত্রের সংস্থান রাখা হয়েছে। লোক আদালত, জেলা ক্রেতা ফোরাম, রাজ্য ক্রেতা ফোরাম, জাতীয় ক্রেতা বিবাদ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে প্রতারিত বা ভুক্তভোগী গ্রাহক বা ক্রেতারা তাদের অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য আবেদন জানাতে পারেন।

সরকার ইতোমধ্যেই গ্রাহক বা ক্রেতা সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বহু প্রকল্প ও কর্মসূচি হাতে নিয়ে উদ্যোগী হয়েছে। কাজেই গ্রাহক বা ক্রেতা যেন এই ধরনের সুরক্ষাকবচগুলির পুরোমাত্রায় সুযোগ নিতে নিজেও এগিয়ে আসেন, সেই ব্যাপারটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পণ্য ক্রয় বা পরিষেবা গ্রহণের সময় নিজেদেরও বেশকিছু বিষয়ে তত্ত্বতালাশ করে দেখাটা অপরিহার্য। গ্রাহক বা ক্রেতা হিসাবে নিজেদের অধিকার প্রয়োগে দড় হয়ে উঠলেই আমজনতাই বাজারের চালিকাশক্তি হিসাবে নিজের জায়গাটা পাকাপোক্ত করে ফেলতে সক্ষম হবেন। দয়াদাক্ষিণ্যের মতো গ্রাহক সুরক্ষার ব্যাপারটিও নিজেকে দিয়েই শুরু করতে হবে বৈকি।❑

ক্রেতা অধিকার ও সচেতনতা : নীতি ও আইনকানুন

অবিনাশ কে. শ্রীবাস্তব

এদেশে ক্রেতা সুরক্ষা আইনটির রূপায়ণকে যে এক সার্থক প্রচেষ্টা হিসাবে ধরা যেতে পারে, তা নিয়ে কোনও দ্বিমতের অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও ক্রেতা কল্যাণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়ার নিরিখে ঘাটতি রয়েই গেছে। এজন্য দায়ি নানাবিধ কার্যকারণ। রয়েছে গুণমানঘটিত পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে খামতি। বহু পণ্যের তথা পরিষেবার ক্ষেত্রেই নিয়ামকের খামতিও রয়েছে, যার দরুন স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এছাড়াও বহু পণ্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মানকের অভাব রয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার বেশ কিছু নির্দেশমূলক নীতির সংস্থান রেখেছেন সংবিধান রচয়িতারা। এই নীতিসমূহ আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও দেশের প্রশাসন পরিচালনার বনিয়াদ তা। রাষ্ট্রকে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই এই নীতিগুলির লক্ষ্য। বলা হয়েছে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এক সমাজব্যবস্থা গড়ে নাগরিকদের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করে যাবে রাষ্ট্র। ভারতীয় সংবিধান ব্যক্তিবিশেষের অধিকারকে সুরক্ষিত ও সেই অধিকারের গণ্ডি প্রসারিত করতে তথা নাগরিকদের মর্যাদা ও কল্যাণের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে একজন উপভোক্তা, একজন গ্রাহক এবং একজন ক্লায়েন্ট হিসাবে ধরে সেকাজে সচেষ্ট হবে। উপভোক্তাদের সুরক্ষা প্রদানের অন্যতম দিকগুলি হল, ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যবিধি সুনিশ্চিত করা, পণ্যের গুণমান ও সুদক্ষ পরিষেবার বন্দোবস্ত, পাশাপাশি ক্রেতারা যাতে নিজেদের পছন্দ অপচন্দ অনুযায়ী বেছে নিতে পারেন সে জন্য পণ্যের গুণমান, পরিমাণ, গুণাগুণ, উপাদান ও দরদাম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের নাগাল যাতে তারা পেতে পারে তার সংস্থান করতে হবে।

ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা/ক্রেতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলকের মধ্যে অন্যতম হল, ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ লাগু হওয়া। সমস্ত পণ্য ও পরিষেবাকে শামিল করে এক অত্যন্ত আধুনিক মানের স্বয়ংসম্পূর্ণ আইনি ছত্রছায়ার উদাহরণ এটি। দেশের অন্যান্য আইনবিধিতে যেখানে মূলত শাস্তির ও প্রতিরোধক ব্যবস্থার উপর জোরটা দেওয়া হয়, সেখানে এই আইনে ক্ষতিপূরণের সংস্থানও রাখা হয়েছে। ক্রেতা সুরক্ষা আইনের ৬ নং ধারায় উপভোক্তাদের ছয়টি বুনিয়াদি অধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ছয়টি অধিকার হল :

(১) **নিরাপত্তার অধিকার :** তাদের জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে হানিকারক এমন পণ্য ও পরিষেবার বিপণনের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত রাখার অধিকারের হকদার তারা। যদি কোনও নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা তাদের জীবন এবং সম্পত্তির পক্ষে বিপজ্জনক এবং হানিকারক হয়, উপভোক্তাদের সে সম্পর্কে অবশ্যই অবগত করাতে হবে ও সেই পণ্য বা পরিষেবার ব্যবহারবিধি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

(২) **তথ্যের অধিকার :** অনৈতিক বাণিজ্যিক কারবারের হাত থেকে উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে কোনও পণ্য বা পরিষেবার গুণমান, গুণাগুণ, বিশুদ্ধতা, মানক এবং দরদাম সম্পর্কিত সব রকমের তথ্য উপভোক্তার জানার অধিকার আছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত তথ্য অবশ্যই উপভোক্তাকে জানাতে হবে, তার বাজেট, জীবনশৈলী এবং ফ্যাসান অনুযায়ী পছন্দসই জিনিসটি সে বেছেবুছে

[লেখক সচিব, উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর, উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : secy-ca@nic.in]

নিতে পারে।

(৩) **বাছাই করে নেওয়ার অধিকার :** প্রতিযোগিতামূলক দামে রকমারি পণ্য বা পরিষেবার নাগাল পাওয়ার অধিকারের হকদার উপভোক্তারা। সর্বোপরি, সর্বনিম্ন ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে যাতে বিপুল পরিসরের পরিষেবা বা পণ্য উপভোক্তাদের জোগান দেওয়া যায়, সেজন্য ন্যায্য প্রতিযোগিতার বাতাবরণ প্রসারে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে।

(৪) **বক্তব্য পেশের অধিকার :** ক্রেতা সুরক্ষা আইনের ভিত হচ্ছে এই অধিকারটি। কারণ, এই অধিকারের আওতায়, উপভোক্তাদের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে, যদি তাদের সাথে অন্যায্য কোনও কিছু ঘটে, তবে সঠিক উপভোক্তা ফোরামে তাদের স্বার্থরক্ষার্থে যথাযথ যত্নসহকারে নিজের সপক্ষে তাদের পেশ করা বক্তব্য শোনা হবে।

(৫) **ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার :** অনৈতিক বাণিজ্যিক কারবারের জেরে বা একচেটিয়া বাণিজ্যের সূত্রে যদি কোনও উপভোক্তার লোকসান হয় বা তিনি শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং ভুক্তভোগী উপভোক্তা নালিশ জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করার পর যদি তা প্রমাণিত হয়, তবে নির্দিষ্ট যে ফোরামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, সেই ফোরাম ভুক্তভোগী উপভোক্তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে।

(৬) **শিক্ষার অধিকার :** বাজারে কী ধরনের কারবারের রীতি চালু আছে এবং তার সাপেক্ষে কী ধরনের প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে, সে ব্যাপারে উপভোক্তাকে তথ্য জোগায় এই অধিকার। এ বিষয়ে শিক্ষা তথা সচেতনতার প্রসার ঘটাতে গণমাধ্যম বা স্কুলের পাঠ্যক্রমকে এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপকে মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

দেশে দেওয়ানি আদালত ও অন্যান্য আইনি প্রতিবিধানের যে ব্যবস্থাপত্র চালু আছে, তার এক বিকল্প হিসাবে এই আইনের মাধ্যমে ত্রিস্তরীয় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সংস্থান রাখা হয়েছে। যেখানে কি না তার কেনা কোনও পণ্যে কোনও খুঁত থাকলে বা

প্রাপ্ত পরিষেবায় কোনও ঘাটতি মিললে, তৎসহ এসব পণ্যের উৎপাদক ও ব্যবসায়ী বা পরিষেবা প্রদানকারীরা একচেটিয়া/ অনৈতিক কারবার রীতি অনুসরণ করলেও একজন ভুক্তভোগী উপভোক্তা সুবিচার ও ক্ষতিপূরণের জন্য দ্বারস্থ হতে পারেন। এই আইনের উদ্দেশ্যই হল উপভোক্তার অভিযোগের সহজ, দ্রুত এবং যথাসম্ভব কম খরচে নিষ্পত্তি করা। ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত করা। এছাড়াও তা উপভোক্তাদের নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের সহায়তা জোগায় এবং নিয়মমাফিক ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত করে।

একটি মুক্ত বাজার অর্থনীতি কেবলমাত্র শিক্ষিত সচেতন উপভোক্তার সাহায্য পেলে তবেই সাবলীল ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে। উৎপাদক ও উপভোক্তার মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার অন্যতম হাতিয়ার হল উপভোক্তা শিক্ষা। শিক্ষা একজন উপভোক্তাকে সঠিক জিনিসটি বেছেবুছে পছন্দ করতে সাহায্য করে এবং তাকে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত অপব্যবহারের হাত থেকে সুরক্ষা জোগায়। ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পরিসর বাড়াতে ব্যাপক বিজ্ঞাপনী প্রচার ও সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে উপভোক্তাদের নিজেদের অধিকার ও দায়দায়িত্ব বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে বেশি করে জোর দিতে হবে মহিলা, শিশু, ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক এবং গ্রামীণ পরিবারগুলির তথা শ্রমিক শ্রেণির মতো অরক্ষিত গোষ্ঠীর উপর।

ভারত একশো পঁচিশ কোটি জনসংখ্যার এক বিশাল দেশ। যার অধিকাংশ মানুষেরই বাস গ্রামাঞ্চলে। সরকার তাই বিভিন্ন রকমারি বিষয়ে ক্রেতা সুরক্ষা ও ক্রেতার দায়িত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে উপভোক্তাদের শিক্ষিত করে তুলতে গোটা দেশজুড়ে মাল্টিমিডিয়া সচেতনতা প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। "জাগো গ্রাহক জাগো" আজ তাই প্রতি ঘরে সুপরিচিত। আরও সম্প্রতি, গণ হারে উপভোক্তারা শামিল এমন বিষয়ে সরকারি বিভাগ বা সংস্থাগুলি যৌথভাবে প্রচারাভিযান চালু করার পথে হাঁটছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, খাদ্যের ক্ষেত্রে Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI)-র সঙ্গে; আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে তথা ওষুধের ক্ষেত্রে National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)-র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র, হোর্ডিং, ব্যানারের মতো নানা বৈদ্যুতিন ও মুদ্রিত গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপনী প্রচার চালান হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর, DAVP বা Directorate of Advertising and Visual Publicity-র মাধ্যমে সরকার এই

সচেতনতা প্রচারাভিযান চালায়, দেশের গ্রামাঞ্চল ও পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে। মেলা ও উৎসবে গ্রামাঞ্চল ও পিছিয়ে পড়া মানুষেরা বড়ো সংখ্যায় জমায়েত হন। এই বিষয়টি মাথায় রেখে সরকার বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে অনুষ্ঠিত মেলা ও উৎসবে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমরা সকলেই উপভোক্তা। উপভোক্তারা আজকাল খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছেন। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত প্রভাব ও ফ্যাক্টরের দৌলতে উপভোক্তারা তাদের জীবনশৈলী ও ভোগের প্রকৃতির নিরিখে বড়োসড়ো বদলের মুখোমুখি হয়ে আসছেন। জনসংখ্যার সচলতা বৃদ্ধি, নিত্যনতুন রকমারি পণ্য ও পরিষেবার বাজারে প্রবেশ, কেনাকাটার নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন ও তথ্য, availability modify perceptions এবং alter loyalties এরকমই কিছু ফ্যাক্টর। কিন্তু, বাজারে এত বিপুল সংখ্যক পণ্য ও পরিষেবা উপচে পড়ছে, আর তার ধরনধারণ এত রকমারি যে অনেক সময়ই উপভোক্তারা ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী সঠিক পণ্য বা পরিষেবাটি বেছেবুছে নিতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছেন। তার উপর বাণিজ্যের বিকাশের সূত্রে নতুন নতুন কৃত্রিম চাহিদার দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। শিল্পক্ষেত্র ও বিজ্ঞাপনী ক্ষেত্র মোহজাল বিস্তার করে উপভোক্তাদের দরজায় যেসব বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে, তা থেকে প্রয়োজন অপ্রয়োজনের ছাঁকনি দিকে সঠিকটিকে ছেঁকে নিতে পারছেন না সব উপভোক্তারা। আপাত প্রয়োজন ও প্রকৃত প্রয়োজনের মধ্যে ফারাকটা বুঝতে উপভোক্তাকে নিজের মধ্যে সচেতনতার বিকাশ ঘটাতে হবে। তাদের চাহিদার সঙ্গে সঠিক তালমেল রয়েছে কোন পণ্য বা পরিষেবাটির আর কোনটিই বা ঝোঁকের মাথায় কিনতে চলেছেন, সেই চয়নের ব্যাপারটিতে দক্ষতা থাকা দরকার তাদের। পাশাপাশি, ভোগের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ও সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণে উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে আবশ্যিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই ভোগের কি মূল্য তাদের চোকাতে হতে পারে তা বিবেচনায় রাখা।

ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬

বাণিজ্যমহলকে উন্নততর উপভোক্তা শিক্ষার বিষয়টিকে বিপদ হিসাবে না দেখে, বাণিজ্যিক মুনাফার উৎস হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। উপভোক্তার পছন্দ যত সেরা মানের হবে, তাদের সেই উচ্চাশার দৌলতেই কোম্পানিগুলির মধ্যে নিজদের পণ্য ও পরিষেবার গুণগতমান বাড়ানোর জন্য প্রতিযোগিতার জমি তৈরি সূত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এদেশে ক্রেতা সুরক্ষা আইনটির রূপায়ণকে যে এক সার্থক প্রচেষ্টা হিসাবে ধরা যেতে পারে, তা নিয়ে কোনও দ্বিমতের অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও ক্রেতা কল্যাণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়ার নিরিখে ঘাটতি রয়েই গেছে। এজন্য দায়ি নানাবিধ কার্যকারণ। রয়েছে গুণমানঘটিত পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে খামতি। বহু পণ্যের তথা পরিষেবার ক্ষেত্রেই নিয়ামকের খামতিও রয়েছে, যার দরুন স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এছাড়াও বহু পণ্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মানকের অভাব রয়েছে।

বহু ব্যবসার মধ্যেই চোখে পড়ে সাধারণভাবে মানকীকরণের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় না। গুণগতমান, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতা এবং মুনাফালাভের ক্ষেত্রে মানকের প্রভাব কতটা সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাবেই তাদের মধ্যে এ বিষয়ে অনীহা থাকে। প্রাথমিকভাবে গুণমান সমৃদ্ধ পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা উপভোক্তাদের মধ্যে কম, আর তার জন্য দায়ি তাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, দেশে গুণগত মানের সংস্কৃতি অনুপস্থিত। যদি ভারতীয় উৎপাদকেরা ভারতীয় পণ্যের গুণগত মান ও ঐতিহ্যগত দিকগুলি আন্তর্জাতিক মানকের স্তরে নিয়ে যাওয়ার নৈপুণ্য দেখাতে পারেন, তাহলেই দেশের ক্রেতাদের মধ্যেও ঝোঁকটা তৈরি হবে। সেই লক্ষ্যে আমরা সম্প্রতি ভারতীয় মানক ব্যুরো আইনটিকে সংশোধন করেছি। এছাড়াও ১৯৮৬ সালের চলতি ক্রেতা সুরক্ষা আইনটির ব্যাপক আকারে সংশোধন করে নতুন একটি আইন আনার বিষয়টি বর্তমানে বিবেচনাধীন। যাতে করে, আইনটিকে আরও জোরদার, উপযোগী এবং বাস্তবসম্মত প্রয়োগযোগ্য করে তোলা যায়। বর্তমান ক্রেতা সুরক্ষা আইনটি চালু রয়েছে প্রায় ৩০ বছর ধরে। ক্রেতা সুরক্ষা বিল, ২০১৫ এবং নতুন লাগু হওয়া ভারতীয় মানক ব্যুরো আইন, ২০১৬ উল্লিখিত লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রচেষ্টার উদাহরণ। ক্রেতা সুরক্ষা বিলের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে উল্লেখ করা হল :

(ক) উপভোক্তাদের অধিকার রক্ষা, তার পরিসর বাড়ানো এবং সেই অধিকার বলবৎ করার জন্য কেন্দ্রীয় উপভোক্তা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ

(Central Consumer Protection Authority, CCPA) নামে একটি এগজিকিউটিভ এজেন্সি প্রতিষ্ঠা। এই CCPA সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। অনৈতিক বাণিজ্য কারবারের দরুন ক্রেতা যদি কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসানের মুখে পড়েন, তবে তা রোধ করতে যখন যখন প্রয়োজন, এই সংস্থা হস্তক্ষেপ করবে। পাশাপাশি, ভুক্তভোগী উপভোক্তার টাকা ফেরানোর, পণ্য বদলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা দোষী পক্ষকে তলব করার এক্তিয়ারও তাদের থাকছে।

(খ) পণ্যের দায়বদ্ধতার ("product liability") প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেওয়ার সংস্থান। কোনও পণ্য ব্যবহারের ফলস্বরূপ উপভোক্তা যদি শারীরিক আঘাত পান, তার মৃত্যু হয়, বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয় তার ভিত্তিতে পণ্য দায়বদ্ধতার আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে সেই দায় বর্তাবে পণ্যটির উৎপাদকের উপর।

(গ) বিবাদ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপোশ মীমাংসার সংস্থান। এর উদ্দেশ্য হল, আপোশ মীমাংসার মাধ্যমে উপভোক্তা বিরোধ নিরসনকে আইন-গত ভিত্তি প্রদান। ফলে এই প্রক্রিয়াটি হবে দ্রুততর, সহজ ও ব্যয়সাশ্রয়ী। উপভোক্তা ফোরামের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সম্মতি নিয়েই এই উপায় গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) উপভোক্তা ফোরামে ক্রেতা বিরোধ নিরসন প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলতে বিবিধ সংস্থান রাখা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল, ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি এজেন্সিগুলির আর্থিক (জরিমানা ধার্য, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদির) এক্তিয়ার বাড়ানো, উপভোক্তা ফোরামের ন্যূনতম সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো, যাতে করে অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয়। এছাড়াও রাজ্য ও জেলা স্তরের আয়োগগুলি যাতে তাদের নিজেদের রায় পর্যালোচনা করে দেখতে পারে তার সংস্থান, অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির সুবিধার জন্য সার্কিট বেঞ্চ গঠন, জেলা ফোরামের সভাপতি এবং সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সংস্কারসাধন। পাশাপাশি উপভোক্তাদের জন্য অনলাইন অভিযোগ দায়ের করার সংস্থান, অভিযোগকারী উপভোক্তা যে এলাকার বাসিন্দা সেই এলাকা যে উপভোক্তা ফোরামের এক্তিয়ারভুক্ত সেখানেই যাতে ভুক্তভোগী উপভোক্তা অভিযোগ জানাতে পারেন তার সংস্থান, যদি অভিযোগ দায়েরের এলাকার এক্তিয়ারের ব্যাপারে দ্বন্দ্ব থাকে, তবে সুনির্দিষ্ট করে ২১ দিনের সময়সীমার মধ্যে এ বিষয়ে যদি সিদ্ধান্ত না নেওয়া যায়, তাহলেও উপভোক্তা উল্লিখিত সুযোগ পাবেন।

আজকের দিনে, সমস্ত শিল্পোন্নত দেশে পরিমাপের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা বজায় রাখার উপর নজরদারি চালানোর জন্য একটি করে দায়বদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে। এই সংস্থা জাতির আর্থিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে সততা বজায় রাখাটা সমাজের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীনকাল থেকেই দেশের সরকারপক্ষ হাটেবাজারে সঠিক পরিমাপের সুনিশ্চয়তা বজায় রেখে এসেছে। ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে সমমানের মানক প্রচলন এবং একটি যুক্তিযুক্ত পরিকল্পের বন্দোবস্ত করতে, মেট্রিক সিস্টেম ও International Organization of Legal Metrology দ্বারা স্বীকৃত আন্তর্জাতিক একক (units) ব্যবস্থার ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে প্রথম আইন বলবৎ হয়। এর নাম, ওজন ও পরিমাপ মানক আইন, ১৯৫৬ (Standards of Weight & Measurement Act, 1956)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দ্রুততালে অগ্রগতি ঘটে চলেছে। অর্থনীতির বিশ্বায়ন হচ্ছে ব্যাপক জোর কদমে। এই বিষয়গুলির সূত্র ধরেই ওজন নির্ণয় ও পরিমাপের পদ্ধতির ক্ষেত্রে হয়েছে ব্যাপক অগ্রগতি। ফলত, ওজন ও পরিমাপের দুনিয়ায় সুযোগের পরিসর বহুগুণ বেড়েছে। ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে মানক চালু, ওজন ও পরিমাপের ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, এছাড়াও অন্যান্য যেসব পসরা বিক্রয় বা বণ্টন হয় ওজন, পরিমাপ বা সংখ্যা অনুযায়ী সেসবের বিকিকিনির সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রেগুলিতেও নিয়ন্ত্রণের রাশ ধরে রাখতে ২০১১ সালের পয়লা এপ্রিল বলবৎ হয় Legal Metrology Act, 2009। Standards of Weight and Measures Act, 1976 এবং Standards of Weight and Measures (Enforcement) Act, 1985, এই আইন দু'টিকে বাতিল করে তার জায়গায় আনা হয় উল্লিখিত নতুন আইনটি। ওজন ও পরিমাপের সঙ্গে জড়িত দায়ভার কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করা আছে। জাতীয় নীতি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড, যার মধ্যে পড়ছে, ওজন ও পরিমাপ বিষয়ক আইনকানুন, প্রকৌশলগত নিয়ামন, প্রশিক্ষণ, সূক্ষ্মতার বিচারের জন্য ল্যাবরেটরির সুযোগসুবিধা, তথা আন্তর্জাতিক সুপারিশসমূহ রূপায়ণের দায়ভার বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। এই সমস্ত আইনবিধি সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা প্রতিদিনকার দেখা-শোনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনের উপর ন্যাস্ত।

রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওজন ও পরিমাপের বৈধ মানকের মানকীকরণ (calibrated) হয় সাতটি Regional Reference Standard Laboratory (RRSL)-তে। এগুলি রয়েছে আমেদাবাদ, ভুবনেশ্বর, বেঙ্গালুরু, ফরিদাবাদ, গুয়াহাটি, নাগপুর এবং বারাণসীতে। তাদের নিজেদের অঞ্চলে অবস্থিত শিল্পগুলিকে এসব ল্যাবরেটরি মানকীকরণ সংক্রান্ত পরিষেবা জোগায়। ওজন ও পরিমাপ যন্ত্রগুলির মডেল অনুমোদন পরীক্ষানিরীক্ষা পরিচালনা করার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ল্যাবরেটরির মধ্যেও এগুলি অন্যতম।

উপভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য বিকল্প উপায়ের সন্ধান দিতে ভারত সরকার একটি জাতীয় উপভোক্তা হেল্পলাইন (National Consumer Helpline, NCH) চালু করেছে। এই নিঃশুল্ক ফোন নম্বরটি হল 1800-11-400 বা 14404, যার মাধ্যমে ভুক্তভোগী উপভোক্তাদের ক্ষমতায়নের জন্য পরামর্শদান, তথ্য সরবরাহ এবং গাইড করা হয়। পাশাপাশি এই হেল্পলাইন ব্যবসাজগতকে উপভোক্তাদের উদ্বেগ ও অভিযোগের নিরসনে বিশ্বমানের মাপক গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের নীতি এবং পরিচালন ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজাতে সহায়তা করছ। NCH ইতোমধ্যেই ৩২৫-টিরও বেশি বড়ো মাপের কোম্পানির সঙ্গে জুটি বেঁধেছে, যাদের কাছে

নিরসনের জন্য অনলাইনে অভিযোগ পাঠিয়ে তাদের থেকে ফিডব্যাক সংগ্রহ করা হয়। পোর্টালটি উপভোক্তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে, এবং তাদের কী দায়দায়িত্ব সে বিষয়েও তথ্য জোগান দেয়। এই পোর্টালের মাধ্যমে ভুক্তভোগী উপভোক্তারা অনলাইনে নিজেদের অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। বর্তমানে এই পোর্টালের মাধ্যমে NCH-এরও নাগাল পাওয়া যাচ্ছে। মূল্যযুক্ত পরিষেবা হিসাবে, একটি মোবাইল অ্যাপ এবং সহজেই মনে থাকার মতো ৫ অঙ্কের একটি সংক্ষিপ্ত কোড, 14404 চালু করা হয়েছে, যাতে দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে উপভোক্তারা জাতীয় উপভোক্তা হেল্পলাইনের নাগাল পেতে পারেন।

রাজ্য উপভোক্তা হেল্পলাইন : রাজ্য উপভোক্তা হেল্পলাইন চালু করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য (প্রাদেশিক) সরকারগুলি। উদ্দেশ্য, রাজ্য স্তরে বিকল্প উপভোক্তা বিরোধ নিরসন ব্যবস্থাপত্র ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং আপোশ মীমাংসার মাধ্যমে কেসগুলির সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।

স্মার্ট উপভোক্তা অ্যাপ : সরকার "Smart Consumer" নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে। এই অ্যাপের সাহায্যে উপভোক্তারা পণ্যের মোড়কের উপর মুদ্রিত বার কোড স্ক্যান করে সংশ্লিষ্ট পণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিশদ তথ্য পেতে পারেন। যেমন, কিনা পণ্যটির নাম, উৎপাদকের সম্পর্কে বিশদ তথ্য, কোন বছরের কোন মাসে পণ্যটি প্রস্তুত হয়েছে, মোট ওজন, কনজিউমার কেয়ার সংক্রান্ত বিশদ তথ্য এবং কোনও খুঁত বের হলে কীভাবে অভিযোগ দায়ের করা যাবে ইত্যাদি সবই।

GAMA : এটি হল মানুষকে বিপথে চালিত করা বিজ্ঞাপনের সমস্যার সমাধানকল্পে গৃহীত একটি উদ্যোগ। সরকারের তরফে এজন্য অনলাইন অভিযোগ নিবন্ধীভুক্ত করার একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এরই পুরো নাম হল, "Grievances Against Misleading Advertisements", সংক্ষেপে GAMA। কোনও উপভোক্তা এধরনের বিজ্ঞাপনের একটি কপি, ভিডিও, অডিও ক্লিপিং-সহ ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তার অভিযোগটি নিবন্ধিত করতে পারবেন।

অনলাইন বিরোধ নিষ্পত্তি : ভারত সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় বেঙ্গালুরুস্থিত National Law School of India University-তে অনলাইন উপভোক্তার অভিযোগের আপোশ মীমাংসা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, উপভোক্তা বিরোধ নিরসনের জন্য একটি state-of-the-art পরিকাঠামো গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে প্রথাগত ভৌত উপায়ে এবং একই সঙ্গে এই মঞ্চের মাধ্যমেই অনলাইন আপোশ মীমাংসার সংস্থান করা যায়। কেন্দ্রটি উপভোক্তা এবং সংস্থাগুলির জন্য বিরোধ সমাধানে উদ্ভাবনামূলক প্রযুক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করবে, তথা উপভোক্তা বিরোধের সমাধানকল্পে অনলাইন আপোশ মীমাংসাকে প্রথম পছন্দ হিসাবে বেছে নিতে উৎসাহিত করবে। এটি এমন এক উদ্ভাবনামূলক হাতিয়ার, যা কি না একদিকে উপভোক্তাদের সাধ্যের মধ্যে দ্রুত ও সহজ আপোশ মীমাংসা ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে একই সময় ব্যবসাদারদের কাছে উপভোক্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সুযোগ করে দেবে।

অনলাইন উপভোক্তা গোষ্ঠী : স্থানীয় মহল, একটি সোশ্যাল মিডিয়া মঞ্চ, এই দুয়ের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার নাগরিকদের জন্য 'Online Consumer Communities' নামে একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। উদ্দেশ্য, প্রশাসন ও দৈনন্দিন জীবনের ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা ও সরব হওয়া। এভাবে একজন নাগরিকের সাথে তার সরকার, শহর, নিজের শিকড়, স্বার্থ, চাহিদা, পাড়া-প্রতিবেশী, এবং সে নিজে যেসব অন্যান্য গোষ্ঠীর অংশ, এমন সবার সাথেই তার নিবিড় যোগসূত্র গড়ে উঠবে।

ইন্টারনেট সুরক্ষা বিষয়ে প্রচারাভিযান : বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মানুষের বাস, এমন দেশগুলির অন্যতম হল ভারত। সব ক্ষেত্রজুড়েই দ্রুত হারে ডিজিটাইজেশনের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রতিদিনের বহু কাজকর্ম সারতে উপভোক্তারা অনেকেই অনলাইনের সাহায্য নেন। এই প্রেক্ষিতে ইন্টারনেট সুরক্ষার বার্তাটা এদের মধ্যে চারিয়ে দেওয়াটা নিতান্ত জরুরি। সরকার তার একটি জুড়িদার কোম্পানির সাথে একত্রে 'Digital Literacy, Safety & Security' নামে একটি সারা বছরব্যাপী প্রচারাভিযান কর্মশালার আয়োজন করেছে। উদ্দেশ্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের এর চ্যালেঞ্জের দিকগুলো এবং ইন্টারনেট সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা।

ভারতে উপভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষায় তাদের বিভিন্ন ধরনের শোষণের হাত থেকে নিস্তার দিতে পরস্পর সম্পর্কিত বহু আইনকানুন, বিধি ইত্যাদি বলবৎ আছে। যেমন, ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (Indian Penal Code, 1860); ভারতীয় চুক্তি আইন (Indian Contract Act, 1872); ওষুধ মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন (Drugs Control Act, 1950); শিল্পক্ষেত্র (বিকাশ ও নিয়ামন) আইন Industries (Development and Regulation) Act, 1951; ভারতীয় মানক সংস্থা (শংসায়ন চিহ্ন) Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952; ওষুধ ও ইন্দ্রজাল নিরাময় (আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন) আইন বা Drug and Magic Remedies (Objectional Advertisement) Acts, 1954; খাদ্য মানক এবং নিরাপত্তা আইন বা Food Standards and Safety Act, Essential Commodities Act, 1955; বাণিজ্য ও পণ্য চিহ্ন আইন বা Trade and Merchandise Marks Act, 1958; Hire Purchase Act, 1972; সিগারেট (উৎপাদন, সরবরাহ এবং বণ্টন নিয়ন্ত্রণ) আইন বা Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975; কালোবাজারি প্রতিরোধ এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ রক্ষণ আইন বা Prevention of Black-marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commotities Act, 1980; অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (বিশেষ সংস্থান) আইন বা Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981; Legal Metrology Act, 2009, এবং Narcotic Drugs and

Psychotropic Substances Act, 1985। এছাড়াও দেশে স্বাধীনতার আগে লাগু করা হয়েছিল এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন আজও সমান প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে উপভোক্তার স্বার্থরক্ষাকে সুনিশ্চিত করছে। এর মধ্যে পড়ছে, পণ্যসামগ্রী বিক্রয় আইন বা Sale of Goods Act, 1930; কৃষিজ পণ্য (শ্রেণিবিন্যাস এবং বিপণন) আইন বা Agriculture Produce (Grading and Marketing) Act, 1837 এবং ওষুধ ও প্রসাধনী আইন বা Drugs and Cosmetics Act, 1940।

গুণমান রক্ষার জন্য অতি জরুরি দিকটি হল মানক, আর সেটাই ক্রেতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠির ভূমিকা নেয়। আর সেজন্যই সরকার এজাতীয় উচ্চমানের বিস্তৃত পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। যার মধ্যে রয়েছে মানকীকরণ, মানক বিকাশের প্রসার, মানক সংক্রান্ত তথ্য, Metrology, গুণমান নিশ্চয়তা, ঐতিহ্যগত দিক যাচাই, পণ্যসামগ্রীকে শংসাপত্র প্রদান, নিয়ামন ও বলবৎকরণ এবং অনুমোদন। সুপ্রশাসনের সংস্কৃতিকে আরও ছড়িয়ে দিতে পূর্বশর্ত হল ক্রেতা সুরক্ষা আইনের সুষ্ঠু, কার্যকর এবং সততার সাথে রূপায়ণ। আর তার দৌলতেই উপভোক্তাদের অধিকারের সুরক্ষা ও সুষ্ঠু প্রসার সুনিশ্চিত হয়। পণ্য ও পরিষেবার গুণমানের নিরিখে যদি উপভোক্তাদের অধিকার সঠিকভাবে সুনিশ্চিত করা যায়, ও সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া যায়, তবে অভিযোগের সূত্রপাতই হয় না। সেই পরিস্থিতিতে অবশ্যই এমন এক বাতাবরণ তৈরি হবে, যাতে করে ক্লায়েন্ট, উপভোক্তা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টিবোধ করবে, যে জিনিসটা এদের সব থেকে বড়ো চাহিদা।

ক্রেতা সুরক্ষার সাথে আবার প্রতিযোগিতা নীতির যোগসূত্র রয়েছে, কারণ শেষমেশ এদুয়ের কল্যাণেই উপভোক্তারই মঙ্গলসাধন হয়। উপভোক্তা এবং উৎপাদকের মধ্যে এক অসম সম্পর্কের স্বীকৃতিই ক্রেতা সুরক্ষা এবং প্রতিযোগিতা নীতি উভয়েরই গোড়ার কথা। পণ্য ও পরিষেবা উভয় বিষয়েই ন্যূনতম কিছু নির্দিষ্ট গুণগত মাপকাঠি স্থির এবং সুরক্ষার মানদণ্ড বেঁধে দিয়ে তথা ভুক্তভোগী উপভোক্তার অভিযোগের নিরসনের ব্যবস্থা করে ক্রেতা সুরক্ষার বন্দোবস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অন্যদিকে প্রতিযোগিতা নীতি এই সুনিশ্চয়তা দেয় যে, বাজারে বিপুল সংখ্যক উৎপাদকের অস্তিত্বের দরুন কোনও একজন নির্দিষ্ট উৎপাদকের পক্ষে একচেটিয়া কারবার করে যাওয়ার মতো।

পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সুপ্রশাসনের বিষয়টি সরাসরি জড়িত ক্রেতা সুরক্ষা আইন এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। সুপ্রশাসনের ক্ষেত্রে জোরটা মূলত দেওয়া হয় কর্মকুশলতা, কার্যকারিতা, নৈতিকতা, সাম্য, অর্থনীতি, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, ক্ষমতায়ন, যৌক্তিকতা, নিরপেক্ষতা এবং অংশগ্রহণের উপর নজর দিয়ে। সুপ্রশাসনের এই শর্তগুলি আবার ক্রেতা সুরক্ষা আইন ও নীতিসমূহের বিভিন্ন দিকের সঙ্গেও জড়িত। কাজে কাজেই, উপভোক্তাদের অধিকারের সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত আইনসমূহের যথাযথ ও কার্যকর রূপায়ণ সুপ্রশাসনের পালেই হাওয়া জোগায়।

ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনকে কার্যকর ও অর্থবহ করে তুলতে সরকার, বাণিজ্য জগৎ, নাগরিক সমাজ সংস্থা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান-সহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সক্রিয় সহযোগিতা জরুরি। সর্বোপরি ক্রেতা আন্দোলন উদ্দেশ্যসাধক হয়ে ওঠার পূর্বশর্ত হল প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের সমর্থন জোগাড় করা। ভারত সরকারের ক্রেতা বিষয়ক দপ্তরের মাধ্যমে যেসব নীতি, প্রকল্প এবং কর্মসূচিগুলি পরিচালিত হয়, সেগুলি যে যথেষ্ট সুফলদায়ী, তা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু, শেষমেশ এগুলির কার্যকারিতা নির্ভর করছে প্রতিষ্ঠানগুলি ও আমজনতার উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এসবে যুক্ত হওয়ার উপর। সুতরাং সময়ের দাবি হল, উপভোক্তার স্বার্থে চূড়ান্ত দায়বদ্ধতা সহকারে কাজ করা এবং উপভোক্তার চাহিদার প্রতি সামাজিক সাড়া। এবং সে কাজও এমন তালমেল রক্ষা করে করতে হবে যেন আমাদের এই সমাজ সকলের বাসযোগ্য এক সেরা ঠাঁই হয়ে ওঠে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সংস্কার

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা : সূচনা ও হালফিলের অবস্থা

ডি. পি. এস. বর্মা

অসাধু ব্যবসা দমনের জন্য ১৯৮৬-তে ক্রেতা সুরক্ষা আইন তৈরির পর থেকে, ক্রেতা সুরক্ষার জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যাপারস্যাপার ঘটেছে। আইনটি সুবিশাল এই দেশজুড়ে কার্যকর এক সাংগঠনিক কাঠামোর বন্দোবস্ত করেছে। দফায় দফায় সংস্কার এবং ক্রেতা আদালত ও সুপ্রিম কোর্টের বহু সংখ্যক সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ, ক্রেতা সুরক্ষা আইনের বিকাশ হয়েছে যথেষ্ট। আত্মপ্রকাশ করেছে অনেক অনেক স্বেচ্ছাসেবী ক্রেতা সংগঠন। ব্যবসায়ী ও পরিষেবা প্রদানকারীরা ক্রেতা অধিকারের বিষয়টিতে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। তবে ক্রেতাদের জন্য ন্যায়বিচার পুরোদস্তুর সুনিশ্চিত করতে এখনও বিস্তর পথ পাড়ি দেওয়া বাকি।

ক্রেতা সুরক্ষার ধারণার উৎপত্তি আমেরিকায়। গত ষাটের দশকের গোড়ার দিককার কথা। ব্যবসা সংস্থাগুলির অসাধু ফন্দিফিকিরের জ্বালায় ক্রেতামহল তিতোবিরক্ত। এগিয়ে এলেন রাল্ফ নাদার। শিল্পপতি ও বণিকদের বিরুদ্ধে শুরু করলেন ক্রেতাদের লড়াই। প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬২-র ১৫ মার্চ এক বার্তায় কংগ্রেসকে (মার্কিন আইনসভা) জানালেন ক্রেতাদের চারটি মৌলিক অধিকার আছে : (১) নিরাপত্তার অধিকার, (২) জানাবোঝা বা ওয়াকিবহাল হওয়ার অধিকার, (৩) বেছে নেওয়া বা পছন্দের অধিকার, ও (৪) তাদের বক্তব্য শোনানোর অধিকার। ক্রেতা অধিকার নিয়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডির এই ঘোষণার স্মরণে ফি বছর ১৫ মার্চ তারিখটি উদ্‌যাপিত হয় বিশ্ব ক্রেতা দিবস রূপে। ১৯৮৫-র ৯ এপ্রিল, ক্রেতা সুরক্ষার জন্য এক প্রস্ত গাইডলাইনস বা নীতিনির্দেশিকা গ্রহণ করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ সভা। নীতি পরিবর্তন বা আইন মারফৎ ক্রেতা সুরক্ষা প্রসারের জন্য সদস্য দেশগুলিকে উৎসাহিত করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবকে অনুরোধ জানায়। তারপর ক্রেতা সুরক্ষা আইন তৈরি হয়েছে প্রায় সব দেশে। বহু দেশ, বিশেষত আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন ও নরওয়েতে ক্রেতা আন্দোলন তো বেশ জোরদার। সেই সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আইনি ব্যবস্থাদি।

ভারতে অসাধু ব্যবসায়িক ফন্দিবাজি দমন ও ক্রেতা সুরক্ষার জন্য আইন বলবৎ আছে বহুদিন ধরেই। এহেন ডজন খানেকের বেশি আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও (সারণি-১ দ্রষ্টব্য), ক্রেতাদের স্বার্থ যথেষ্ট সুরক্ষিত ছিল না। সার্বিকভাবে নয়, এসব আইন খণ্ড খণ্ডভাবে ক্রেতা সুরক্ষা করতে চেয়েছে। আইনগুলির শিরোনাম সংক্ষেপে তার প্রকৃতি ও পরিসরের ইঙ্গিতবাহী। যেমন, ওষুধ ও প্রসাধনী আইনের উদ্দেশ্য হল ভারতে তৈরি, আমদানি করা, বণ্টিত বা বিক্রিত ওষুধপত্র ও প্রসাধন সামগ্রীর গুণমান সুনিশ্চিত করা। বিপজ্জনক পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ, চড়া দাম আদায়, অসাধু ব্যবসা, খুঁতো জিনিস বিক্রি নিয়ে ক্রেতাদের হরেক কিসিমের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কোনও একক বা সংযুক্ত সংস্থা ছিল না। এছাড়া আইন বলবৎ হ'ত না ঠিকঠাক। আর ক্রেতারাও তাদের ক্ষোভ মেটানোর অধিকার কাজে লাগাতে অনেক ক্ষেত্রেই গা লাগাতো না তেমন একটা।

ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬

১৯৮৬-র ২৪ ডিসেম্বর ক্রেতা সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ভারতে ক্রেতা আন্দোলনের ইতিকথায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ আইন আজ পর্যন্ত সংশোধিত হয়েছে তিনবার। ১৯৯১, ১৯৯৩ আর ২০০২-এ। কম খরচে চটজলদি অভিযোগ সুরাহার মাধ্যমে ক্রেতাদের স্বার্থ আরও ভালোভাবে রক্ষা করা এ আইনের লক্ষ্য। এজন্য জেলা, রাজ্য ও জাতীয় এই তিন স্তরে আছে বিচারের বন্দোবস্ত।

[লেখক দিল্লি স্কুল অব ইকনমিকসে বাণিজ্য বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। বর্তমানে শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা, বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। ই-মেল : dpsverma@hotmail.com]

ক্রেতা সুরক্ষা আইনে ক্রেতাদের ৬-টি অধিকার রক্ষার কথা আছে :

(ক) বিপজ্জনক জিনিসপত্র ও পরিষেবা বিকোনোর বিরুদ্ধে অধিকার।

(খ) অন্যায্য ব্যবসা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পণ্য ও পরিষেবার দাম, স্ট্যান্ডার্ড, খাঁটিত্ব, কার্যকারিতা, পরিমাণ, গুণমান সম্পর্কে জানাবোঝার অধিকার।

(গ) প্রতিযোগিতামূলক দামে পণ্য ও পরিষেবা মেলার অধিকার।

(ঘ) অভিযোগ ফয়সালার জন্য উপযুক্ত বিচারমঞ্চে বক্তব্য পেশের অধিকার।

(ঙ) অসাধু ব্যবসায় বা প্রতিযোগিতা ও উৎপাদন সীমিতকারী রীতি বা অন্য কোনও ধরনে শোষণের হাত থেকে রেহাই মেলার অধিকার।

(চ) ক্রেতা শিক্ষার অধিকার।

নালিশ পেশ

ক্রেতার কোনও অভিযোগ থাকলে নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত বিচারমঞ্চে তা জানাতে হয়। উভয়পক্ষের শুনানির পর বিচারক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত খেসারত দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। কোনও পক্ষ সে নির্দেশে খুশি না হলে আপিল পেশ করতে পারেন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে। এই আপিল নিয়ে রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

● **কে নালিশ জানাতে পারে :**

১। ক্রেতা।

২। রেজিস্টার্ড ক্রেতা সমিতি।

৩। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার।

৪। একই স্বার্থযুক্ত বহু সংখ্যক ক্রেতার পক্ষ থেকে এক বা একাধিক ক্রেতা।

৫। প্রয়াত ক্রেতার (চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু হলে) প্রতিনিধি বা আইনসিদ্ধ উত্তরাধিকারী। আইনে 'ক্রেতা'-র বিশদ সংজ্ঞা দেওয়া আছে। ব্যক্তিগত বা বাড়ির (ফের বেচা বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয়) প্রয়োজনে কেউ কোনও কিছু কিনলে বা কিনতে রাজি হলে সে ক্রেতা। অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তি পরিষেবা ভাড়া নিলে বা ব্যবহার করলে সেও ক্রেতা।

● **নালিশ জানানোর ভিত্তি :**

নিচের যে কোনও একটির ক্ষেত্রেই নালিশ করা যায় :

১। কোনও বণিক বা পরিষেবা প্রদানকারী অসাধু ব্যবসা বা প্রতিযোগিতা ও উৎপাদন সীমিতকারী রীতির পথ ধরলে।

সারণি-১

ভারতে ক্রেতা সুরক্ষার জন্য প্রধান প্রধান আইন*

১। ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬
২। খাদ্য নিরাপত্তা ও মানক আইন, ২০০৬
৩। ভারতীয় মানক কার্যালয় আইন, ১৯৮৬
৪। ওষুধ ও প্রসাধনী আইন, ১৯৪০
৫। ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০
৬। ওষুধ ও ম্যাজিক নিরাময় (আপত্তিকর বিজ্ঞাপন) আইন, ১৯৫৪
৭। অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, ১৯৫৫
৮। কালোবাজারি দমন ও অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ বজায় আইন, ১৯৮০
৯। কৃষি ফসল (মান নির্ধারক) আইন, ১৯৩৭
১০। ওজন ও মাপ-এর মানক আইন, ১৯৭৬
১১। ওজন ও মাপ-এর মানক (মোড়কবন্দি পণ্য) বিধি, ১৯৭৭
১২। প্রতিযোগিতা আইন, ২০০২
১৩। ট্রেডমার্ক আইন, ১৯৯১ (২০০৩-এর সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর)
১৪। সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত পণ্য (বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৩

*কালানুক্রমিক নয়

২। বিক্রিত পণ্যে খুঁত।

৩। পরিষেবা ঘাটতি বা ত্রুটিবিচ্যুতি।

৪। মোড়ক বা মূল্য তালিকায় লেখা আইনসঙ্গত দামের চেয়ে বেশি টাকা নেওয়া অথবা ক্রেতা-বিক্রেতার দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি টাকা হাঁকা।

৫। বিপজ্জনক পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ।

'পণ্য', 'পরিষেবা', 'জিনিসে খুঁত', 'পরিষেবায় ঘাটতি বা ত্রুটিবিচ্যুতি', অসাধু ব্যবসা এবং 'প্রতিযোগিতা ও উৎপাদন সীমিতকরণ রীতি' এসবের খুব ব্যাপক অর্থ আইনে বলা আছে। ক্রেতা সুরক্ষা আইনে তাই ক্রেতাদের প্রায় সব ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্ভব।

● **নালিশ জানানোর জায়গা :**

(ক) ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাবির ক্ষেত্রে (জিনিস বা পরিষেবার দাম ও ক্ষতিপূরণ) সংশ্লিষ্ট জেলা ফোরামে।

(খ) দাবি ২০ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু ১ কোটির চেয়ে কম হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কমিশনে।

(গ) দাবির অঙ্ক ১ কোটি ছাড়ালে জাতীয় কমিশনে।

এসব ফোরাম বা মঞ্চ আধা-বিচারবিভাগীয় সংস্থা। এখানে বিচারবিভাগের বাইরের লোকও থাকেন। সংস্থার প্রধান হন আইনজ্ঞ ব্যক্তি। এসব ফোরামকে সাধারণত বলা হয় ক্রেতা আদালত। এরা কাজ করে ট্রাইব্যুনালের মতো। মামলার শুনানি ও আদেশ বলবৎ করার জন্য এদেরকে দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দু' পক্ষের বক্তব্য শুনানিকালে আদালত 'স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি' মেনে চলে। এক পক্ষের বক্তব্য শুনে আদেশ জারির ক্ষমতা এদের আছে এবং প্রয়োজন মনে করলে স্থগিতাদেশ দেয়।

● **অভিযোগ পেশের পদ্ধতি :**

নালিশ জানানোর উপায় বেশ সহজ। অভিযোগকারী নিজে বা তার অনুমোদিত কোনও ব্যক্তি নথিপত্র (কেস মেমো, ওয়ারান্টি কার্ড ইত্যাদি) কিছু থাকলে তা-সহ লিখিত অভিযোগ জমা দিতে পারে। উকিল না ধরলেও চলে। ফালতু বা কাউকে অহেতুক নাকাল করার মতলব আঁটা অভিযোগ আটকাতে, ক্ষতিপূরণ বাবদ দাবির অঙ্কের আনুপাতিক হিসেবে সামান্য ফি নেওয়া হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর দাবি অভিযোগপত্রে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার।

● **ভুক্তভোগী ক্রেতা কি পেতে পারেন :**

শুনানি শেষে ক্রেতা আদালত নিচের এক বা একাধিক নির্দেশ জারি করতে পারে :

১। বিক্রিত জিনিসের খুঁত সারিয়ে দেওয়া এবং পরিষেবার ঘাটতি বা ত্রুটিবিচ্যুতি মেটানো।

২। খুঁতওয়ালা জিনিস পালটে দেওয়া।

৩। দাম ফেরৎ।

৪। ক্ষতি হলে বা আঘাত পেলে ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ।

৫। উপযুক্ত ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ।

৬। অসাধু ব্যবসা এবং প্রতিযোগিতা সীমিতকরণের দায়ে দোষী বণিকের বিরুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়ার নির্দেশ।

৭। বিপজ্জনক জিনিস বাজার থেকে তুলে নেওয়া।

৮। বিপজ্জনক জিনিস/পরিষেবা উৎপাদন/বিক্রি বন্ধের নির্দেশ।

৯। বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের পরিণাম সামলাতে সংশোধনমূলক বিজ্ঞাপন দেওয়ার নির্দেশ।

১০। কোনও পক্ষের ব্যয় মিটিয়ে দেওয়ার আদেশ।

জেলা ফোরামের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় রাজ্য কমিশনে। আদেশ জারির ৩০ দিনের মধ্যে এই সুযোগ থাকে। রাজ্য কমিশনের নির্দেশে কোনও পক্ষ সন্তুষ্ট না হলে জাতীয় কমিশনের দ্বারস্থ হতে পারে। সরাসরি জাতীয় কমিশনে কোনও অভিযোগ পেশ করা হলে, কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যাওয়া যায় সুপ্রিম কোর্টে।

সম্প্রতি কয়েক বছরে ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনার তালিকা দেওয়া হয়েছে সারণি-২-এ।

সারণি-২
ভারতে ক্রেতা সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির সারাৎসার

১। ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা (ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ পাশ)।
২। পণ্যের মানক এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা জোরদার করা (১৯৫১-র ভারতীয় মানক প্রতিষ্ঠান আইনের বদলে ভারতীয় মানক কার্যালয় আইন, ১৯৮৬ প্রণয়ন)।
৩। কিছু সহযোগী আইনে ক্রেতাকে তার বক্তব্য শোনানোর বিধিবদ্ধ অধিকার অর্পণ (ডিসেম্বর, ১৯৮৬)।
৪। কেন্দ্রে ক্রেতা বিষয় দপ্তর গঠন (জুন, ১৯৯১)।
৫। বিভিন্ন ক্রেতা কল্যাণ প্রকল্পে সহায়তা জোগানোর জন্য ক্রেতা কল্যাণ তহবিল, ১৯৯২ গড়া।
৬। ক্রেতা সুরক্ষা আইনের পরিসর ও ক্রেতা আদালতের ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে এই আইনকে জোরদার করা।
৭। চিকিৎসা পরিষেবায় গড়িমসি বা খামতির জন্য ক্রেতা আদালতের শরণ নিতে ক্রেতার অধিকারকে বৈধতা দিয়ে জাতীয় কমিশনের রায় (এপ্রিল, ১৯৯২), পরে এতে সুপ্রিম কোর্টের সিলমোহর (১৩ নভেম্বর, ১৯৯৫), ফলে চিকিৎসা পরিষেবা পড়ে ক্রেতা সুরক্ষা আইনের আওতায়।
৮। ব্যাপক সংশোধনের মাধ্যমে ক্রেতা সুরক্ষা আইন আরও জোরদার (ডিসেম্বর, ২০০২, কার্যকর ১৫ মার্চ, ২০০৩ থেকে।
৯। প্রতিযোগিতা বাড়াতে ও ক্রেতা স্বার্থ বজায় রাখতে, ব্যবসাতে প্রতিযোগিতা সীমিতকরণ রুখতে ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন (প্রতিযোগিতা আইন, ২০০২ পাশ, তা কার্যকর ৩১ মার্চ, ২০০৩ থেকে।
১০। সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ ও নাবালকদের কাছে তামাকের জিনিস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা (বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ এবং উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৩।
১১। খাদ্যদ্রব্যের বিজ্ঞানসম্মত মানক নির্দেশনায় ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও মানক কর্তৃপক্ষ গঠন (খাদ্য নিরাপত্তা ও মানক আইন, ২০০৬ পাশ, কার্যকর ৫ এপ্রিল, ২০১১ থেকে।
১২। ক্রেতা অধিকার বিকাশ, রক্ষা ও বলবৎ করতে এবং পণ্যের খুঁত ও ঝুঁকি সংক্রান্ত দায় ব্যবসায়ীদের উপর চাপাতে এবং সালিশির জন্য কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ স্থাপনের তোড়জোড় (লোকসভায় ২০১৫-র ১০ আগস্ট ক্রেতা সুরক্ষা বিল, ২০১৫ উত্থাপন)। সংসদের উভয়কক্ষে অনুমোদনের পর (আশা করা যায় আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে পাশ হয়ে যাবে) রাষ্ট্রপতির সইসাবুদ সারা হয়ে গেলে নতুন ক্রেতা সুরক্ষা আইন হবে।
১৩। আরও কয়েকটি ঘটনা :
(ক) আমেদাবাদে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ামক কমিশনের প্রডাক্ট টেস্টিং অ্যান্ড রেটিং ল্যাবরেটরি স্থাপন।
(খ) অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী ক্রেতা সংগঠনের আত্মপ্রকাশ।
(গ) শিল্প-বাণিজ্যে ক্রেতা অভিযোগ সেল তৈরি।
(ঘ) ক্রেতা বিষয়ে প্রচার মাধ্যমের আগ্রহ বৃদ্ধি।
(ঙ) ক্রেতাদের চেতনা জাগাতে সরকারের আরও তৎপরতা।
(চ) বিষয়টি নিয়ে মামলার রায়ের বিপুল সংগ্রহ।
(সবই গত তিন দশকে)

আসন্ন নতুন আইন

এখনকার ক্রেতা সুরক্ষা আইন (১৯৮৬)-এর বদলে প্রস্তাবিত নতুন আইনের বিশেষ উল্লেখ করা দরকার।

১৯৮৬-র আইনের খামতি, ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করা এবং তার এক্তিয়ার ও লক্ষ্য বাড়ানোর জন্য, ২০১৫-র ১০ আগস্ট লোকসভায় ক্রেতা সুরক্ষা বিল, ২০১৫ পেশ করা হয়। সভা বিলটি পাঠায় খাদ্য, ক্রেতা বিষয়ক ও গণবণ্টন মন্ত্রকের সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে। কমিটি বিলে কিছু সংশোধনের সুপারিশ করে। সংশোধিত বিলটি লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশনে তোলা হবে। লোকসভায় পাসের পর তা যাবে রাজ্যসভায়। এর পর পাঠানো হবে রাষ্ট্রপতির সইয়ের জন্য।

● **বিলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক :**

১। একটি কার্যনির্বাহী সংস্থা গঠন, এর নাম হবে কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা সংস্থা। এর কাজ হবে অসাধু ব্যবসা থেকে ক্রেতার ক্ষতি এড়াতে হস্তক্ষেপ করা, ক্রেতা অধিকার বলবৎ, রক্ষা ও বিকাশ। এখন এসব কাজের দায়িত্ব কোনও সংস্থার উপর ন্যস্ত নয়।

২। মিথ্যে ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনে নামডাকওয়ালা ব্যক্তিদের সায় থাকলে সাজা।

৩। চুক্তির অন্যায্য শর্তাদিকে অবৈধ ঘোষণা।

৪। বিবাদ মীমাংসার্থে বিকল্প এক ব্যবস্থা হিসেবে সালিশি কেন্দ্র গড়া।

৫। নির্মাতাদের বিরুদ্ধে উৎপাদিত পণ্যের জন্য দায় বলবৎ।

পরিশেষ

অসাধু ব্যবসা দমনের জন্য ১৯৮৬-তে ক্রেতা সুরক্ষা আইন তৈরির পর থেকে, ক্রেতা সুরক্ষার জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যাপারস্যাপার ঘটেছে। আইনটি সুবিশাল এই দেশজুড়ে কার্যকর এক সাংগঠনিক কাঠামোর বন্দোবস্ত করেছে। দফায় দফায় সংস্কার এবং ক্রেতা আদালত ও সুপ্রিম কোর্টের বহু সংখ্যক সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ, ক্রেতা সুরক্ষা আইনের বিকাশ হয়েছে যথেষ্ট। আত্মপ্রকাশ করেছে অনেক অনেক স্বেচ্ছাসেবী ক্রেতা সংগঠন। ব্যবসায়ী ও পরিষেবা প্রদানকারীরা ক্রেতা অধিকারের বিষয়টিতে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। তবে ক্রেতাদের জন্য ন্যায়বিচার পুরোদস্তুর সুনিশ্চিত করতে এখনও বিস্তর পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। আশা করা যায় ক্রেতা সুরক্ষা বিল, ২০১৫; যা কিনা শীঘ্রই সংসদের অনুমোদন পেতে চলেছে, তা বর্তমান আইনের খুঁতগুলি ঢেকে দেবে। এবং ক্রেতা আদালতগুলি বহু দিন ধরে ঝুলে থাকা মামলার পাহাড় তড়িৎগতিতে মিটিয়ে ফেলতে সক্রিয় হবে। এই যুগলবন্দি ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনকে করবে আরও জোরদার।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ডিজিটাল ভারতের সাফল্যের অন্যতম শর্ত ক্রেতাসাধারণের সুরক্ষা

সীতারাম দীক্ষিত

পণ্য কেনা-বেচার পন্থাপদ্ধতির ক্ষেত্রে ইন্টারনেট বা আন্তর্জাল বিপ্লব নিয়ে এসেছে। অনেকেই অনলাইনে পণ্য ও পরিষেবা কেনার সুবিধা উপভোগ করছেন। কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা থাকবেই। নিকৃষ্ট অথবা জাল পণ্য ও পরিষেবার বিপদআপদ সকলেরই চেনা। বহু ক্ষেত্রেই, বিজ্ঞাপনে কোনও পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে যা বলা থাকে, বাস্তব তার থেকে বহু দূর। বৈদ্যুতিন বাণিজ্য বা ই-কমার্সের জমানায় অনেক সংস্থাই ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতি এমন জটিল করে তোলে, যাতে এসব বিচ্যুতির জন্য দায়ি কে, তা বুঝে ওঠাই দুষ্কর হয়ে পড়ে। ডিজিটাল ব্যবস্থাপত্র এত দ্রুতবেগে বিবর্তিত হচ্ছে যে নীতিবহির্ভূত কাজকর্মের প্রতিরোধে চালু আইনগুলি অনেক সময়েই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে পড়ে।

পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল বলে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর এক বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। প্রধানমন্ত্রী সীমিত নগদনির্ভর অর্থনীতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। সরকারের বিমুদ্রায়ণের সিদ্ধান্তে দেশের মানুষ অনলাইন আর্থিক লেনদেনে অভ্যস্ত হওয়ার তাগিদও অনুভব করেছিল। কিন্তু বাজারে ফের নগদ টাকা আসতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল লেনদেনে সামিল হওয়ার প্রবণতাও যেন আবার কমে গিয়ে আগের মতো অবস্থাতেই ফিরে এসেছে।

তবে এটা মানতেই হবে যে, সাধারণ মানুষ আবার বেশি করে নগদে লেনদেন শুরু করলেও, ডিজিটাল বা সাংখ্যিক লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্র, যেমন, BHIM (Bharat Interface for Money), UPI (Unified Payment Interface), IMPS (Immediate Payments Transfer) এবং সমধর্মী অন্য সব উপায় সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। দরকার পড়লেই তৎক্ষণাৎ যাতে এই সব পথে হাঁটা যায়, তার জন্য তৈরি থাকতে চাইছেন সকলেই।

কর সংক্রান্ত ঝামেলা এড়াতে এবং অন-লাইন ব্যবস্থাপত্রের ক্ষেত্রে কিছুটা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগার কারণে (সংবাদপত্রে প্রায়ই অনলাইন লেনদেনে কারচুপির অভিযোগের খবর পাওয়া যায়), বাজারে উপযুক্ত পরিমাণে নগদ ফের এসে যাওয়ার পরে সাধারণ ক্রেতা এবং ছোটোখাটো ব্যবসায়ীরা অনেকেই ডিজিটাল লেনদেনের পথ থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন। তিন মাস ধরে অনলাইন লেনদেনে যে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর এক্ষেত্রে উৎসাহও অনেকটা কমেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, জালিয়াতি রোখা এবং কর সংক্রান্ত ঝুটঝামেলা দূর করার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি। একটা বিষয় ভালোভাবে বোঝা দরকার। অনলাইন কেনা-বেচা বাড়ার অর্থ এই নয় যে, মানুষ এধরনের লেনদেনে পরিপূর্ণ আস্থা রাখছেন। এধরনের প্রক্রিয়া নির্ভরযোগ্য হবে এই প্রত্যাশাটুকু মানুষের রয়েছে—এটাই শুধু বলা যায়।

ক্রেতা এবং উপভোক্তার সুরক্ষা

পণ্য বা পরিষেবা সঠিক গুণমানের হবে এবং কোনও অসুবিধা হলে ন্যায়বিচার মিলবে, এই আশাটুকু পোষণ করার অধিকার সবারই রয়েছে। তা সম্ভব তখনই, যখন বিক্রেতা সংস্থাগুলির পণ্য বা পরিষেবার উৎকর্ষমান সুনিশ্চিত এবং জাতীয় স্তরে উপভোক্তার স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নীতি বিদ্যমান থাকবে। সব দেশেরই নিজেদের ক্রেতা সুরক্ষার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্র থাকা উচিত। ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিয়ম নীতি মেনে চলায় বিক্রেতাদের বাধ্য করা এবং অনৈতিক কাজকর্ম প্রতিহত করায় তা প্রাথমিক শর্ত।

মানুষ আশা করেন, দেশের নিয়ম নীতিতে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং

[লেখক চেয়ারম্যান, কনজ্যুমার গাইডেন্স সোসাইটি অব ইন্ডিয়া (CGSI)। ই-মেল : sitaram.dixit@gmail.com]

পরিবেশগত পরিস্থিতির প্রতিফলন থাকুক। এই প্রেক্ষিতেই ক্রেতা সুরক্ষার বিষয়টি দেখতে হবে। জনসাধারণের প্রতিটি অংশ, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার এবং প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষজনের স্বার্থের দিকে গুরুত্ব দিয়ে, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করে ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্র রূপায়ণে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। তার সঙ্গে, কম দামে আরও রকমারি পণ্য যাতে আরও বেশি পরিমাণে বাজারে আসে তাও সুনিশ্চিত করা দরকার।

ডিজিটাল দুনিয়া

এটা বিশ্বায়নের যুগ। তথ্যের আদানপ্রদান, সামাজিকীকরণ, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, ব্যবসাবাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ক্রেতাদের সামনে সুলভে পণ্য বেছে নেওয়ার সুযোগ এবং আরও রকমারি সুবিধা এনে দিচ্ছে এই বিবর্তন। অনলাইন ব্যবস্থাপনা এবং মোবাইলের মাধ্যমে লেনদেন সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছবিটা পালটে দিয়েছে অনেকখানি। কিন্তু এই আধুনিক ব্যবস্থাপত্রের আরও প্রসারের জন্য, তা ক্রেতাদের সামনে বিকল্পমাত্র হিসেবে না থেকে প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মে আরও বেশি করে মিশে যাওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে, এবং সামগ্রিক উন্নয়নে আবশ্যিক শর্ত হল উন্নতমানের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা। প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে আন্তর্জাল (Internet) ব্যবস্থার প্রসার সরকার, প্রশাসন এবং বাণিজ্য জগতের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই সম্ভব।

পৃথিবীর চল্লিশ শতাংশেরও বেশি মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এই অনুপাত আগামীতে আরও বাড়বে তা বলাই বাহুল্য। ডিজিটাল ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। দুর্ভাগ্যবশত, এক্ষেত্রে অনেকটাই খামতি রয়েছে। বিষয়টিকে এড়িয়ে গেলে চলবে না।

ডিজিটাল মঞ্চের মাধ্যমে কেনা-বেচায় ক্রেতাদের উৎসাহিত করা দরকার। কিন্তু এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে। অনলাইন প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল। কাজেই সাধারণ মানুষকে সময়ে সময়ে নতুন নতুন প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হতে হচ্ছে। এতে বিভ্রান্তির

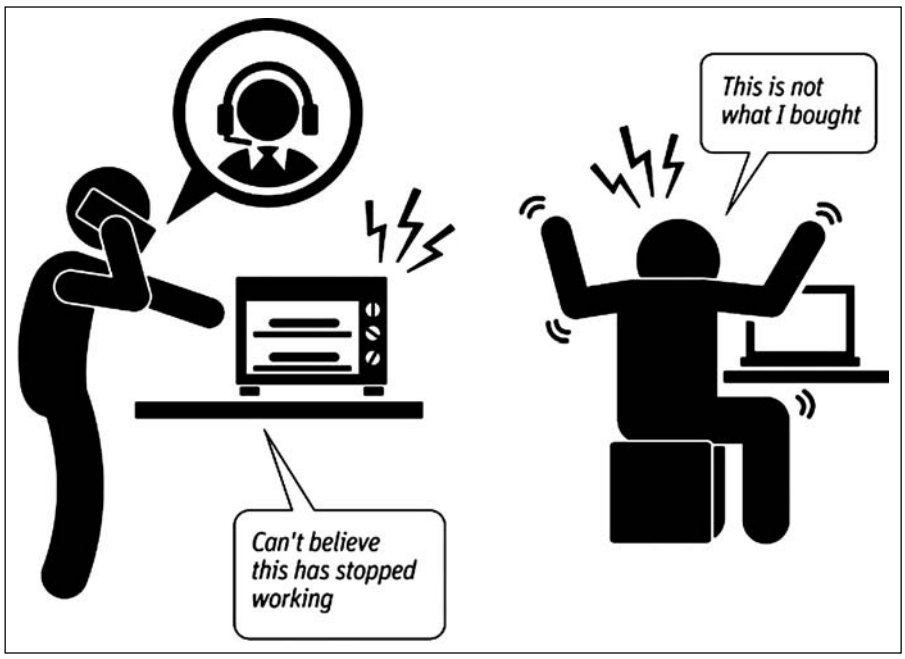

অবকাশ রয়েছে তা মানতেই হবে। এই সব ধরনের সমস্যা কাটিয়ে উঠে সকলে যাতে ডিজিটাল প্রক্রিয়ার প্রতি আরও আস্থাবান হতে পারেন সেটা দেখতে হবে। অনলাইনে কেনা-বেচায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আগামী দিনে এসংক্রান্ত প্রযুক্তির আরও প্রসারের পথ সুগম করবে।

> *"উপভোক্তা : নিজের, অথবা বাড়ির প্রয়োজনে যিনি পণ্য বা পরিষেবা কিনে থাকেন।*
>
> *ক্রেতা সুরক্ষা নীতি : জাতীয় স্তরে প্রণীত আইন, নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা, ব্যবস্থাপত্র, কর্মসূচি। শিল্পপণ্যের গুণমান এবং ব্যবসার রীতিনীতির দিকটিও এখানে বিবেচ্য।"*

ক্রেতার প্রত্যাশা এবং বাস্তব

গত দু' বছরে ভারতের বাজারে ক্রেতাদের প্রত্যাশায় অনেকটাই নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বাণিজ্যজগৎ, সংবাদমাধ্যম, সরকার, এমনকি বেশ কয়েকটি অ-সরকারি সংগঠনের প্রতিও আস্থা গেছে কমে। জনমানসে ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে এই সব সংস্থা সাহায্য করতে অপারগ। তথ্য সংক্রান্ত গোপনীয়তা রক্ষায় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার খামতি রয়েছে বলেই সাধারণ মানুষের ধারণা তৈরি হয়েছে। গোটা বিষয়টিই তাদের কাছে অস্বচ্ছ। ব্যক্তিগত তথ্য অনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে বলে আশঙ্কায় ভুগছেন অনেকে। বহু মানুষ পরিষ্কারভাবে জানেনই না, ডিজিটাল লেনদেনে তাদের কোন কোন তথ্য বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির হাতে যাচ্ছে। এই ভ্রান্তি দূর করতে নিয়মিত পর্যালোচনা এবং সচেতনতার প্রসার জরুরি। কোন কোন তথ্য কতটা কী জন্য বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির হাতে যাচ্ছে এবং কোন উদ্দেশ্যে তার ব্যবহার হচ্ছে মানুষকে তা বোঝানো দরকার। প্রয়োজনে গোটা প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করা এবং ঝুঁকি কমানোর পন্থাপদ্ধতি সম্পর্কেও সাধারণ ক্রেতাদের আরও ভালোভাবে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধার দিকটিও ভালোভাবে তুলে ধরা জরুরি।

ডিজিটাল অর্থনীতির যুগে তথ্যের আদানপ্রদান রোখা অসম্ভব। কিন্তু গোপনীয়তার স্বার্থেই ব্যক্তিগত তথ্যের হাতবদলে, প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণের রাশ ব্যক্তি-মানুষের হাতে থাকা দরকার।

একজন নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্যাদি বিভিন্ন সংস্থার হাতে যাওয়ার ফলাফল কী হতে পারে, এবং তাতে নাগরিকদের আইনি

অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না, সেদিকে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র গড়ে তুলতে হবে, যাতে আইনবহির্ভূত কিছু না ঘটে এবং জাতি, লিঙ্গ এবং ধর্মের ভিত্তিতে কেউ বঞ্চনার শিকার না হন। স্পর্শকাতর তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষায় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি যাতে যত্নবান থাকে, সেজন্য চাই তীক্ষ্ণ নজরদারি। তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে সময়মতো তা জানানো এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়েও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির কাছে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা জরুরি।

প্রয়োজনে উপভোক্তাদের ক্ষতিপূরণ

ডিজিটাল লেনদেনে, ক্রেতাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হলে অবিলম্বে তার প্রতিকার হওয়া দরকার এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অন্য ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষতিপূরণের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হওয়াও দরকার। যেসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল লেনদেন করে থাকে তাদের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মধ্যেই, ক্রেতাদের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্রে নিষ্পত্তির যথোপযুক্ত প্রক্রিয়ার সংস্থান রাখা জরুরি। এক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা কাম্য নয় এবং গোটা বিষয়টি যাতে উপভোক্তার কাছে ব্যয়বহুল না হয়ে পড়ে তাও দেখতে হবে। ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার বিরোধের নিষ্পত্তি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় না হলে তা হতে হবে নিরপেক্ষ সংস্থার মধ্যস্থতায়। ডিজিটাল যুগে দূর-দূরান্তের, এমনকি দেশ-বিদেশের ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে লেনদেন হয়ে থাকে। বহুক্ষেত্রেই সরবরাহকারী সংস্থার সংখ্যা একাধিক। নিরপেক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষকে তাই দেশ-বিদেশের সীমা পেরিয়ে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে ব্যক্তিগত তথ্যের আদানপ্রদানে প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করতে হবে প্রতিটি দেশের নিজস্ব আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে।

উপভোক্তাদের ক্ষমতায়ন এবং আস্থাবর্ধন

ভারত সরকার এবং দেশের বণিকমহল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পালে হাওয়া লাগাতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বাণিজ্য বা ই-কমার্সে বিশেষ জোর দিচ্ছে। ক্রেতাদের আস্থা অর্জনে সক্ষম অনলাইন আদানপ্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা তাই অত্যন্ত জরুরি। সংবাদপত্রে প্রায়ই ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস, নথি খোয়া যাওয়া, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত স্পর্শকাতর নানা বিষয় অবাঞ্ছিত লোকজনের হাতে চলে যাওয়ার খবর চোখে পড়ে। নাম ভাঁড়ানো, বা ই-মেল অ্যাকাউন্ট কিংবা চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি ফাঁসের খবরও দুর্লভ নয়। এর ফলে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি মানুষের পরিচয় সংক্রান্ত যেসব তথ্যাদি একান্তই ব্যক্তিগত, তা সকলের গোচরে এসে পড়ে। তথ্য-প্রযুক্তি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সামনে উপভোক্তাদের ব্যক্তিগত অনেক তথ্য সংগ্রহ করা এবং অন্য সংস্থার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়ার রাস্তা খুলে দিয়েছে। এতে তাদের কাজকর্মে সুবিধা হয়। কিন্তু এসব তথ্যের অনেকটাই সংগ্রহ না করলেও চলে। আর ডিজিটাল দুনিয়ায় কমবয়সী উপভোক্তাদের নিরাপত্তার দিকে আরও বেশি জোর দেওয়া দরকার। সাদা চোখে আজকের সময়ের জটিল ডিজিটাল ব্যবস্থার ফাঁকফোকর কিংবা গোপনীয়তা সংক্রান্ত বিপদগুলি বোঝা কঠিন। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হলে, ডিজিটাল মাধ্যমে পণ্য বা পরিষেবা কেনার আগে উপভোক্তাদের গোটা বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা দরকার। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এখানে অনেকখানি। উপভোক্তা বা ক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে। এমন একটা প্রক্রিয়ার উদ্ভব হওয়া দরকার যা ক্রেতা বা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝে নিতে পারেন। ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যবহারের বিষয়ে স্বচ্ছতা থাকলে এবং সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারলে গোটা ব্যবস্থাপনার ওপর আস্থা স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি সতত পরিবর্তনশীল। চিরাচরিত সীমারেখা মুছে যাচ্ছে। দেশ-বিদেশ জুড়ে লেনদেনের যুগ এখন। এক এক জায়গায় আইন আবার এক এক রকম। কেনাবেচার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে কোথায় গেলে সঠিক প্রতিকার বা উত্তর পাওয়া যাবে, তা বোঝা বেশ কঠিন। এই পরিস্থিতিতে ক্রেতা বা উপভোক্তাদের আস্থা বাড়াতে হলে দরকার তাদের অভাব-অভিযোগের কথা মন দিয়ে শোনা এবং বোঝার চেষ্টা করা। তাদের আশা-প্রত্যাশার খবরাখবর রাখা। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির দায়িত্ব এবং ভূমিকা এখানে অপরিসীম। প্রশাসন এবং সরকারের উচিত এমন একটা ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলা, যাতে ক্রেতাদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এটা ঠিকই, আইনকানুন দিয়ে সবটা হয় না। কিন্তু তার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। ক্রেতারা সরকারের তরফে নিরাপত্তার আশ্বাস পেলে ডিজিটাল লেনদেনে সামিল হতে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

সংবেদী (Sensar) চিহ্ন লাগানো পণ্যের চল বাজারে বাড়ছে। এখন 'স্মার্ট' হওয়ার যুগ। 'স্মার্ট' পণ্য সংক্রান্ত তথ্যাদির বিনিময় কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডারের সঙ্গে অনায়াসেই স্মার্ট ফোন বা ওই জাতীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে হতে পারে। চটপট ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য লেনদেনের সময় ক্রেতাকে পণ্যের দাম ও গুণমান ছাড়াও নিজের ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যবহার কীভাবে হচ্ছে তার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। ইন্টারনেটের ব্যবহার আরও বাড়লে এবং এ সম্পর্কে ক্রেতার সামনে পরিষ্কার ছবি থাকলে ডিজিটাল

"পরিবর্তনের প্রথম ধাপ সচেতনা। দ্বিতীয়টি হল গ্রহণযোগ্যতা।
—ন্যাথানিয়েল ব্র্যান্ডেন
যদি কোনও ক্রেতাকে সারা জীবনের জন্য ধরে রাখতে হয়, তাহলে নিয়মিত দক্ষ পরিষেবা দিয়ে তাকে ভরিয়ে দাও।
—মেলনি ডোরাডো
যত বৈচিত্র্য, তত উন্নত সমাজ"

লেনদেন অনেক সহজ-সরল হয়ে উঠবে। ডিজিটাল মঞ্চে প্রাত্যহিক জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবা কেনার ঝোঁকও বেড়ে যাবে অনেকখানি।

নতুন নতুন উদ্ভাবন মানুষের সামনে নতুন সুযোগ যেমন আনে, তেমনই ঝুঁকিও বাড়ে। ডিজিটাল লেনদেনে বিক্রেতা সংস্থাগুলির ওপর নানা ক্ষেত্রেই বেশি নির্ভরশীল হতে হয় ক্রেতাদের। ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে এই বিষয়টাও মাথায় রাখা দরকার।

আসলে বর্তমান পরিস্থিতিতে উপভোক্তা অধিকার রক্ষার কাজটি একটু জটিল। বহু সময়েই পণ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে হয় দূরবর্তী কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে স্বয়ংক্রিয় প্রশ্নোত্তরভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে অনেক সময়েই ধোঁয়াশা তৈরি হয়। পণ্য ও পরিষেবার গুণগত উৎকর্ষ রক্ষার দায়বদ্ধতা কার ওপর বর্তায়, তা খুঁজে বের করাই অনেক সময় দুরুহ হয়ে পড়ে।

পণ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের বিষয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে কেনাবেচা অথবা চিরাচরিত পথে কেনা-বেচা উভয় ক্ষেত্রেই একই সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। পণ্যের মালিকানায়, তার ব্যবহার এবং বিরোধের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ক্রেতাদের নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত করে তোলা জরুরি।

ডিজিটাল মাধ্যম সংক্রান্ত শিক্ষা এবং সচেতনতা

পণ্য কেনা-বেচার পন্থাপদ্ধতির ক্ষেত্রে ইন্টারনেট বা আন্তর্জাল বিপ্লব নিয়ে এসেছে। অনেকেই অনলাইনে পণ্য ও পরিষেবা কেনার সুবিধা উপভোগ করছেন। কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা থাকবেই। নিকৃষ্ট অথবা জাল পণ্য ও পরিষেবার বিপদআপদ সকলেরই চেনা।

বহু ক্ষেত্রেই, বিজ্ঞাপনে কোনও পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে যা বলা থাকে, বাস্তব তার থেকে বহু দূর। বৈদ্যুতিন বাণিজ্য বা ই-কমার্সের জমানায় অনেক সংস্থাই ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতি এমন জটিল করে তোলে, যাতে এসব বিচ্যুতির জন্য দায়ি কে, তা বুঝে ওঠাই দুষ্কর হয়ে পড়ে। ডিজিটাল ব্যবস্থাপত্র এত দ্রুতবেগে বিবর্তিত হচ্ছে যে নীতিবহির্ভূত কাজকর্মের প্রতিরোধে চালু আইনগুলি অনেক সময়েই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে পড়ে। ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মনীতির অস্পষ্টতা, ভৌগলিক সীমানার এপারে-ওপারে লেনদেনের ক্ষেত্রে দক্ষ নজরদারির অভাব—এসব কারণেই ডিজিটাল লেনদেন এখনও প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠতে পারছে না।

পণ্য এবং তার কার্যকারিতা, সরবরাহকারী, ক্রেতার অধিকার সম্পর্কে বাস্তবসম্মত এবং সুনির্দিষ্ট তথ্য মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে হবে। এটা হলে তবেই ক্রেতারা নিঃসংশয় হয়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিজিটাল লেনদেনে সামিল হতে পারবেন। ডিজিটাল লেনদেন সংক্রান্ত নীতিকেই সাধারণের বোধগম্য হতে হবে। ক্রেতাদের শুধুমাত্র নিজের অধিকারটুকু জানলেই চলবে না। ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছন্দে অংশগ্রহণে দড় হয়ে ওঠাও সমান জরুরি। জানতে হবে কম্পিউটার, স্মার্টফোনকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়।

তাছাড়া এই ধরনের লেনদেনের সুবিধা এবং ঝুঁকির তুল্যমূল্য বিচার করে এগোতে হবে তাদের। কোনও সহায়তা প্রয়োজন হলে কার কাছে যেতে হবে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। নিজের পরিচয়সংক্রান্ত গোপনীয়তা রক্ষার পাঠও নিতে হবে ক্রেতাদের। তবে এখানে মনে রাখা জরুরি যে ক্রেতাদের সচেতনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে আইনগত ব্যবস্থাপত্র থাকাও সমান দরকার। এই দু'টি বিষয় পরস্পরের বিকল্প নয়, পরিপূরক।

পছন্দের অধিকার

চাহিদা অনুযায়ী ন্যায্যমূল্যে পণ্যের জোগানের ক্ষেত্রে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং ক্রেতাদের পছন্দের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ক্রেতাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। ক্রেতারা সুবিধামতো যাতে এক বিক্রেতার থেকে অন্য বিক্রেতার কাছে যেতে পারেন এবং বিক্রেতারা যাতে ক্রেতাদের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষায় নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করেন, তা দেখতে হবে প্রশাসনকে। সামগ্রিক উন্নয়নের এটি একটি প্রধান শর্ত।

একটি বাণিজ্যিক সংস্থা তখনই ক্রেতাদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে, যখন সে ভুল স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে, দায়িত্ব নিতে রাজি থাকে, তার কাজকর্মে স্বচ্ছতা থাকে এবং নিজের কর্মচারীদের সঙ্গে সে ভালো ব্যবহার করে থাকে। ডিজিটাল যুগে তার দায়িত্ব আরও বেশি। নিজের উদ্ভাবনপ্রসূত ব্যবস্থার সুবিধা এবং অসুবিধা সম্পর্কে তাকে সচেতন থাকতে হবে।

শেষ কথা

প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন দ্রুত গতিশীল। উপভোক্তাদের সামনে নতুন সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমস্যাও এনে ফেলছে। সবদিক বিবেচনা করে এগোনো দরকার। না হলে উন্নত প্রযুক্তির সুফল কোনও কাজেই লাগবে না। ডিজিটাল যুগে গোটা প্রক্রিয়াটির প্রতি ক্রেতাসাধারণ আস্থাশীল হলে তবেই নাগরিকদের কাছে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুযোগসুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এমনভাবে এগোনো দরকার যাতে ডিজিটাল লেনদেন প্রতিটি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য জরুরি ক্রেতা সুরক্ষার নিশ্চয়তা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আপোশ না করা। তার সঙ্গে থাকতে হবে বিভিন্ন দেশের সরকার, বাণিজ্যমহল এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপত্রের সমন্বয়সাধন।

প্রযুক্তির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত আইনও পরিবর্তিত হওয়া জরুরি। আজকের দিনে প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই কোনও-না-কোনওভাবে ডিজিটাল দুনিয়ার যোগ রয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর এই দুনিয়াকে সকলের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। সমস্যা দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ তার সমাধানে উদ্যোগ প্রয়োজন। তা না হলে ভ্রান্ত এবং অস্বচ্ছ একটি ব্যবস্থা শিকড় গেড়ে বসবে। পরে তা পালটানো বেশ কঠিন। স্বচ্ছ এবং গ্রহণযোগ্য ডিজিটাল দুনিয়া গড়তে এগিয়ে আসতে হবে সকলকেই। সরকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা, আন্তর্জাতিক নানা সংস্থা, নাগরিক সমাজ—সব মহলকেই একযোগে কাজ করতে হবে এজন্য। একমাত্র এভাবেই গড়ে উঠতে পারে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য, স্বচ্ছ ব্যবস্থাপত্রসমৃদ্ধ ডিজিটাল জগৎ।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ক্রেতা সুরক্ষায় নতুন আইন

পুষ্পা গিরিমাজি

ন্যায়বিচার প্রদানে ক্রেতা আদালতের অক্ষমতাই ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা আইনকে ঢেলে সাজানোর একমাত্র কারণ নয়। ১৯৮৬ সালের আইনে এমন কয়েকটি অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যার সংশোধন হওয়াটা খুবই জরুরি (বিশদ জানতে হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকার ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩-তে প্রকাশিত পুষ্প গিরিমাজির নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। ১৯৮৬ সালের আইনের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হল, একটি যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, যা আইনি অধিকারগুলি বলবৎ এবং সেগুলির লঙ্ঘন রোধ করার ক্ষমতা রাখে। অন্য কথায় বলতে গেলে, ক্রেতা সুরক্ষা আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত উদ্ভূত বিবাদের মীমাংসা করা এবং ক্রেতাদের সুরক্ষিত রাখা।

এটা অবশ্যই কূটাভাস যে, এই ডিসেম্বরে আমরা যখন জাতীয় ক্রেতা সুরক্ষা দিবস উদ্‌যাপন করছি, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমরা আবার চলতি ক্রেতা সুরক্ষা আইনটির জায়গায় নতুন এক আইন আসার প্রতীক্ষায় রয়েছি।

আইন সর্বদাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে; তবে এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, চলতি ক্রেতা সুরক্ষা আইনটিও দিকচিহ্ন বহন করছে; কারণ এই আইনবলেই দেশে প্রথমবার ক্রেতাদের বিভিন্ন অধিকার মান্যতা পেয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে দেশব্যাপী এক স্বতন্ত্র ক্রেতানুসারী বিচারব্যবস্থা। তা সত্ত্বেও এখন একটি নতুন ও আরও উন্নততর বদলি আইনের কথা ভাবা হচ্ছে এই কারণে যে, ইতোমধ্যে বাজার অর্থনীতির প্রভাবে অনেক কিছু পালটে গেছে। দ্রুত অগ্রগমণ ঘটেছে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে। সর্বোপরি চলতি আইনের কয়েকটি ত্রুটিবিচ্যুতিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষিতেই ২০১৫-এর ১০ আগস্ট লোকসভায় ক্রেতা সুরক্ষা বিল (২০১৫) পেশ করা হয়; যেটিকে সভার অধ্যক্ষ পরে কেন্দ্রীয় খাদ্য গণবণ্টন ও ক্রেতা বিষয়ক মন্ত্রকের স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন। গত বছর ২৬ এপ্রিল স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন দাখিল করা হয়, যাতে রয়েছে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সেইমতো সরকারের তরফেও বিলটি সংশোধিত হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে যে, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেই সেটিকে পুনর্বার পেশ করা হবে।

প্রস্তাবিত নতুন আইনের তাৎপর্য সম্যক-ভাবে জানার আগে ১৯৮৬ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইনের কার্যকারিতা, সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি সম্পর্কেও আমাদের অবগত হওয়া দরকার।

ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬

সব দিক খতিয়ে দেখলে ক্রেতা সুরক্ষা আইনকে (১৯৮৬) এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলা যেতেই পারে, যা ক্রেতাদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে সর্বজনসমক্ষে নিয়ে এসেছে। দেশে এই প্রথমবার এই আইনে ক্রেতাদের ছয়টি অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়। এগুলি হল : নিরাপদ পণ্য ও পরিষেবা প্রাপ্তির অধিকার, চয়নের অধিকার, বক্তব্য পেশের অধিকার, ক্রেতা শিক্ষা ও সচেতনতার অধিকার এবং প্রতিকার লাভের অধিকার, বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে অসাধু ও সংকোচক ব্যবসা প্রণালী অনুসৃত হয়েছে এবং বিবেকবর্জিত শোষণের উদাহরণ রয়েছে। প্রতিকারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরে 'ক্রেতা সুরক্ষা পর্ষদ'-এর সংস্থান রাখা হয়।

আইনটির প্রকৃত গুরুত্ব নিহিত রয়েছে তার ত্রি-স্তরীয় ন্যায়বিচার ব্যবস্থায়, যার সাহায্যে ত্রুটিপূর্ণ পণ্য, নিম্নমানের পরিষেবা, অসাধু ও সংকোচক ব্যবসার অপপ্রয়াস এবং কিছুটা সীমিত পর্যায়ে পণ্য ও পরিষেবার মাত্রাতিরিক্ত দাম সম্পর্কে ক্রেতাদের যাবতীয় অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। উকিলের সাহায্য না নিয়েও সংশ্লিষ্ট আদালতে অভিযোগ মীমাংসার সংস্থান রয়েছে। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের

[লেখক কলাম রচয়িতা এবং ক্রেতা নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ। ক্রেতা সুরক্ষা বিল ২০১৫-এর খসড়া প্রণয়ন কমিটির তিনি একজন সদস্যা। ই-মেল : pgirimaji@gmail.com]

নীতিনির্দেশিকা অনুসরণ করে সরাসরি পদ্ধতির মধ্যবর্তিতায় বিবাদ মীমাংসার জন্য আইনে বিচারবিভাগীয় ও বিচারবিভাগ-বহির্ভূত সদস্যদের নিয়ে প্যানেল গঠন করার আইনি সংস্থানও রাখা হয়েছে।

বিচারপ্রার্থীদের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে রেহাই প্রদানের ক্ষমতা প্রতিবিধান এজেন্সিগুলির রয়েছে। এগুলি হল : পণ্য ও পরিষেবায় ত্রুটিবিচ্যুতি বা ঘাটতি দূরীকরণ, ত্রুটিপূর্ণ ও অনিরাপদ সামগ্রী বদল করা অথবা মূল্য ফেরৎ দেওয়া। ক্ষতিকারক সামগ্রীর বিক্রয় বন্ধ করা, অসাধু ও সংকোচক ব্যবসা রোধ করা এবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সংশোধিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দেবার ক্ষমতাও এজেন্সিগুলির রয়েছে। ক্রেতা আদালতগুলির হস্তক্ষেপে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ ও খরচ আদায় এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া যেতে পারে।

এধরনের ক্রেতা আদালত গঠনের সূচনাপর্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে মামলার স্রোত বইতে লাগল। এমন কোনও ক্ষেত্র নেই বিগত তিন দশকে যাকে কেন্দ্র করে তরফে ক্রেতাদের মামলা দায়ের হয়নি। ত্রুটিপূর্ণ সামগ্রী, বিক্রয়-পরবর্তী পরিষেবায় বিচ্যুতি, অতিরিক্ত দাম আদায় এবং বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন-সহ অসাধু বাণিজ্যের অভিযোগে খুচরো বিক্রেতা ও উৎপাদকদের আদালতে ধরে আনা হয়েছে। ক্রেতাদের কোপানলের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এমনকি পরিষেবা ক্ষেত্রটিকেও। ডাক ও টেলি-যোগাযোগ দপ্তর থেকে শুরু করে রেল, বিমান সংস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, জমি-জমার এজেন্সি, ব্যাঙ্ক ও বিমা সংস্থা, হাসপাতাল ও নাগরিক পরিষেবা সংস্থা, স্কুল-কলেজ, আইনজীবী, স্থপতি, পর্যটন এজেন্ট, স্টক ব্রোকার, লন্ড্রি মালিক, দরজি, বিবাহ ব্যুরো ও বিবাহ ব্যবস্থাপক—কাকে না অবহেলাদুষ্ট পরিষেবা ও অসাধু বাণিজ্য পরিচালনার দায়ে ক্রেতা আদালতে টেনে আনা হয়েছে। সেই সঙ্গে সর্বোচ্চ ক্রেতা আদালতের একাধিক 'ল্যান্ডমার্ক' রায় প্রকৃতপক্ষে আইনি পন্থায় ক্রেতা অধিকারগুলিকে সুদৃঢ় ভিতের ওপর স্থাপন করেছে এবং শক্তিশালী করে তুলেছে সদ্য বিকশিত দেশের ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনকে।

প্রদত্ত ক্ষমতায় সদ্ব্যবহারে ক্রেতা আদালতের ব্যর্থতা

একদিকে যেমন ক্রেতাদের মধ্যে বিজয়োল্লাস দেখা গিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই এজেন্সিগুলির কর্মপ্রণালী, বিশেষ করে বিচার প্রক্রিয়ার মন্থরতা গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। বিচারক-প্যানেলের সদস্য নিযুক্তির ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলির দীর্ঘসূত্রিতা বহুক্ষেত্রে আদালতের কাজে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছে। এছাড়া প্রতিশ্রুত 'সহজ, দ্রুত ও সুলভ' প্রতিবিধান অধরা থেকে গিয়েছে বিচারকদের মধ্যে মামলা প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা থাকার দরুন এবং আইনজীবীদের অনুরোধে ক্রমান্বয়ে শুনানি মুলতুবি রাখার কারণে। আদালতের রায়ে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ পাওয়াতে ক্রেতারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, যার ফলে অনেকেই ওই সব ফোরামের দ্বারস্থ হতে চাননি (এ বিষয়ে বিশদ জানতে ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসের যোজনায় পুষ্প গিরিমাজির 'দেশের ক্রেতা আন্দোলন' শীর্ষক নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য)।

দেশে ক্রেতা সুরক্ষা আইনের প্রভাব ও কার্যকারিতা বিষয়ক ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (IIPA) একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০১৩-এর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। IIPA-এর ১৯৯৪ সালের প্রতিবেদন এবং ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের ২০০৪-এর প্রতিবেদনের (পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট নং ১৪, ২০০৪-'০৫) মতোই এই সর্বশেষ প্রতিবেদনটিতেও ক্রেতা বিচার ব্যবস্থার এক বিষণ্ণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বলা হয়েছে যে, ওই বিচ্যর ব্যবস্থার কার্যকরিতা খুবই গৌণ, যার অন্যতম কারণ হল দ্রুত এবং খরচ সাশ্রয়কারী ন্যায়বিচার দিতে আদালতগুলির অক্ষমতা। আদালতগুলির রায়ে যৎসামান্য ক্ষতিপূরণের কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে যে, ক্রেতারা বিচার নিষ্পত্তির প্রশ্নে ক্রমেই আস্থাহীন হয়ে উঠছেন।

পাঁচটি রাজ্যের ১০-টি জেলায় (কর্ণাটক, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা ও ত্রিপুরা) ক্রেতা সুরক্ষা আইনের প্রভাব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আদালতগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে উল্লেখিত প্রতিবেদনটি তৈরি হয়। এতে অভিযোগকারীরা-সহ অন্যান্য পক্ষেরও মতামত অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অভিযোগ দাখিলের জটিল প্রক্রিয়ার দরুন ক্রেতারা আইনজীবীদের সাহায্য নিতে বাধ্য হন, যার ফলে বিবাদ মীমাংসার সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি তাদের পক্ষে যথেষ্ট ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ায়।

এধরনের বিপত্তি ও অসুবিধা দূর করতে এবং ক্রেতাদের স্বার্থে ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে ১৯৮৬ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইনকে ১৯৯১, ১৯৯৩ ও ২০০২ সালে কেন্দ্রীয় ক্রেতা বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে সংশোধন করা ছাড়াও একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তাতেও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি।

দ্রুত বিচার সম্পন্ন করাই যদি এই আদালতগুলির প্রকৃত লক্ষ্য হয়ে থাকে, তহলে একেবারে গোড়াতেই ১৯৮৬ সালের আইনে অভিযোগ মীমাংসার সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করা উচিত ছিল। পরবর্তী ধাপে, ২০০২ সালে আইন সংশোধন করে অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা বাঁধা হয় তিন মাসে (যখন অভিযোগের ভিত্তিতে পণ্যসামগ্রীর মান পরীক্ষাগারে যাচাই করার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে পাঁচ মাস)। যদিও ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। দেশের ক্রেতা আদালতগুলিতে ইতোমধ্যে দেওয়ানি মামলার নেতিবাচক দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। IIPA-এর রেকর্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তিন মাস সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে অভিযোগের মাত্র ১০.২ শতাংশ এবং পাঁচ মাসে ১৭.৮ শতাংশ। এমনকি, আলোচ্য সময়ে ফোরামগুলিতে ক্রেতাদের অভিযোগ বিপুল সংখ্যায় বেড়েছে এমনটাও নয়। সমীক্ষায় জানা যায়, ওই সময়ে জেলা ক্রেতা ফোরামগুলির ৪০ শতাংশে মামলা দাখিলের সংখ্যা মাসে ১৫-টিরও কম।

আইনের ফাঁকফোকর

ন্যায়বিচার প্রদানে ক্রেতা আদালতের অক্ষমতাই ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা আইনকে ঢেলে সাজানোর একমাত্র কারণ নয়। ১৯৮৬ সালের আইনে এমন কয়েকটি অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যার সংশোধন হওয়াটা খুবই জরুরি (বিশদ জানতে হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকার ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩-তে প্রকাশিত পুষ্প গিরিমাজির নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য)।

১৯৮৬ সালের আইনের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হল, একটি যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, যা আইনি অধিকারগুলি বলবৎ এবং সেগুলির লঙ্ঘন রোধ করার ক্ষমতা রাখে। অন্য কথায় বলতে গেলে,

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত উদ্ভূত বিবাদের মীমাংসা করা এবং ক্রেতাদের সুরক্ষিত রাখা।

ক্রেতা সুরক্ষার চলতি আইনের যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, এটির প্রধান উদ্দেশ্য হবে 'ক্রেতাদের উন্নততর সুরক্ষা'-র আওতায় আনা। অন্যদিকে দেখা যায়, ক্রেতাদের 'বিকাশ ও সুরক্ষা'-র অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে সুপারিশমূলক এবং ক্ষমতাহীন কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং জেলা স্তরের (যার অধিকাংশই অস্তিত্বহীন) সংশ্লিষ্ট ক্রেতা সুরক্ষা পর্ষদগুলির ওপর। এমনকি এসব পর্ষদের দ্বারা পাস হওয়া প্রস্তাবগুলিও আদতে সুপারিশমূলক (রুল নং ৭, ক্রেতা সুরক্ষা নিয়মাবলি)।

উদাহরণস্বরূপ বলতে হয় যে, ক্রেতাদের ৬-টি অধিকারকে আইনি তালিকাভুক্ত করা হলেও মাত্র একটির ক্ষেত্রেই অভিযোগ প্রতিকারের অধিকার আইন বলবৎ করার মেকানিজম বা ব্যবস্থা রয়েছে। ক্রেতাদের অন্য সব অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য যথোপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কোনও সংস্থান নেই। এর দরুন ক্রেতারাও নানা ধরনের শঠতা ও অন্যায়ের ভুক্তভোগী হচ্ছেন।

রাজ্যসভায় ১৯৮৬-এর ১০ ডিসেম্বর ক্রেতা সুরক্ষা বিল নিয়ে বিতর্কের জবাবে তদানীন্তন খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী এইচ. কে. এল. ভগৎ জানান, সংশ্লিষ্ট বিলের উদ্দেশ্য সাজা প্রদান সংক্রান্ত নয়, এটি ক্ষতিপূরণমূলক। বিলটির এই বৈশিষ্ট্যই সীমিত সময়ে ক্রেতা বিরোধ মীমাংসায় সহায়ক হবে এবং পাশাপাশি ক্রেতাদের অধিকার বিষয়ে উৎপাদকদের মধ্যে সুস্থ চেতনার বিকাশ ঘটাবে।

অর্থাৎ, সেই সময় আশা করা হয়েছিল যে, বিরোধ নিষ্পত্তিকারী ব্যবস্থার দ্বারাই বিরোধের উৎপত্তি প্রতিহত করা সম্ভব হবে। সেই প্রত্যাশা পূরণে ক্রেতা আদালতগুলি অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে। আসল কথা হল, ক্রেতাদের বিভিন্ন অধিকার যারা লঙ্ঘন করে থাকে, তাদের মনে ওইসব আদালতের বেদনাদায়ক মন্থর প্রক্রিয়া এবং যৎসামান্য

সারণি

সংস্থার নাম	দাখিল হওয়া কেসের সংখ্যা (এ পর্যন্ত)	নিষ্পত্তি হওয়া কেসের সংখ্যা (এ পর্যন্ত)	বিচারাধীন কেসের সংখ্যা	নিষ্পত্তির অংশভাক (শতাংশে)
জাতীয় কমিশন	১,১৩,১১৭	৯৭,৫৭১	১৫,৫৪৬	৮৬.২৬
রাজ্য কমিশন	৭,৬০,৭৮৬	৬,৫১,৭৯৭	১,০৮,৯৮৯	৮৫.৬৭
জেলা ফোরাম	৩৯,৯৫,০৮৮	৩৬,৯২,৭৯৮	৩,০২,২৯০	৯২.৪৩
মোট	**৪৮,৬৮,৯৯১**	**৪৪,৪২,১৬৬**	**৪,২৬,৮২৫**	**৯১.২৩**

সূত্র : ভারত সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইট

ক্ষতিপূরণদানের ধারাবাহিক রায়ের দরুন কোনও রকম ভয়ভীতি সৃষ্টি হয়নি। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে, আদালতগুলি প্রত্যাশামতোই পরিচালিত হয়েছে, সেক্ষেত্রেও তাদের নিয়ন্ত্রণকারীর বিকল্প বলে চিহ্নিত করাটা ঠিক হবে না।

একটা কথা এখানে বলা দরকার যে, ১৯৯১ সালে সরকারের উদার অর্থনীতির পথে হাঁটা শুরু করার পাঁচ বছর আগেই সংসদে ক্রেতা সুরক্ষা আইন উত্থাপিত ও পাস হয়। সাধারণত মুক্ত অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার আবহে পণ্য ও পরিষেবার গুণমানের উন্নতি ঘটে এমন কি শুল্কের হারও নিম্নমুখী হয়। টেলি-যোগাযোগ ও অসামরিক বিমান পরিবহণ-সহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে, আগ্রাসী প্রতিযোগিতার নেতিবাচক দিক হল, এর ফলে অসাধু ও প্রতারণামূলক বিপণন কৌশলের অনেক নজির সামনে আসছে। গোড়াতেই এই প্রবণতা বিনাশ করা না হলে ক্রেতারা ঘোরতর বিপত্তির সম্মুখীন হতে থাকবেন।

একইভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য অগ্রগতি জ্ঞানের এক আদিগন্ত ভাণ্ডারকে উন্মোচিত করেছে এবং তথাকথিত বিশ্বায়িত গ্রাম ক্রেতাদের সামনে বিপুল সুযোগসুবিধা এনে দিয়েছে। পরিবর্তনের এই সর্বব্যাপিতার পাশাপাশি উদ্ভূত হয়েছে অনলাইন প্রতারণা, পরিচয়পত্র জালিয়াতি, এটিএম কার্ডের শঠতা, নকল ক্রেডিট কার্ডের অপব্যবহারের মতো অভূতপূর্ব সমস্যাবলি। এই অবস্থায় ডিজিটাল যুগে ক্রেতা সুরক্ষার বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখে ক্রেতাদের স্বার্থেই সমস্যাগুলির যুগোপযোগী সমাধানে আরও পদক্ষেপ নেওয়াটা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পুরোনো আইন পালটে নতুন আইন চালু করার তাৎপর্যকে এই প্রেক্ষিতেও বিচার করতে হবে।

নতুন উন্মেষ

প্রস্তাবিত নতুন আইনের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল, এতে কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ নামক এক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা গঠন করার সংস্থান রয়েছে। ক্রেতাদের অধিকারসমূহের বিকাশ, সুরক্ষা ও বলবৎকরণে এই কর্তৃপক্ষের হাতে থাকবে বহুধাবিস্তৃত ক্ষমতা।

কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ পদে আসীন হবেন একজন কমিশনার, যার আওতায় থাকবেন পাঁচটি পৃথক ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত পাঁচজন উপ-কমিশনার। পাঁচটি ব্যুরোর কাজ হবে : (ক) পণ্য ও পরিষেবার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা; (খ) গুণমান আশ্বস্ত করা; (গ) ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন আইনকে বলবৎ করা; (ঘ) বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন-সহ অসাধু ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবণতা রোধ করা এবং (ঙ) ক্রেতাদের ক্ষতি ও ক্রেতা চুক্তির অন্যায্য দিকগুলি প্রতিহত করা।

ক্রেতা আদালতের কাজকর্মকে উন্নততর পথে চালিত করাই প্রস্তাবিত আইনের মূল লক্ষ্য। এছাড়া আরও দ্রুততার সঙ্গে বিবাদ মীমাংসার জন্য এতে জেলা ও রাজ্য স্তরীয় আদালতগুলির সঙ্গে ক্রেতা মধ্যস্থতা সেল যুক্ত করার সংস্থান রয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের কারণে কারও আঘাত লাগা, মৃত্যু বা সম্পত্তিনাশের ক্ষেত্রে আইনে উৎপাদকের দায়িত্বের বিষয়টি বিধিবদ্ধ করা হবে। যদি ঠিকমতো বলবৎ করা হয় তাহলে প্রস্তাবিত নতুন আইনের দ্বারা নিশ্চিতভাবে ক্রেতা সুরক্ষার বিষয়টিতে ভারতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটবে।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ক্রেতা সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা : ভারতের প্রেক্ষাপট

চন্দ্রকান্ত লহরিয়া

উপভোক্তা সুরক্ষার লক্ষ্যে আইনি সংস্থান প্রণয়নে অন্যতম পুরোধা দেশ হল ভারত। UNGCP প্রণয়নের পরের বছরই, ১৯৮৬ সালে এদেশে চালু হয় উপভোক্তা সুরক্ষা আইন। পরে পরে কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যের সরকার উপভোক্তা সুরক্ষা এবং সচেতনতার লক্ষ্যে আরও কিছু আইন প্রণয়ন করেছে এবং ব্যবস্থাপত্র গড়ে তুলেছে। ১৯৮৬-র আইনকে সামনে রেখে চালু হয়েছে আরও প্রায় ১৫-টি আইন। এই আইনগুলিকে মূল আইনটির অনুসারী এবং সহায়ক হিসেবে ভাবা যেতে পারে।

নিজস্ব ব্যবহারের জন্য কোনও পণ্য (যেমন, রেফ্রিজারেটর, খাবারদাবার ইত্যাদি) বা পরিষেবা (যেমন হাসপাতালে চিকিৎসা, চিকিৎসকের পরামর্শ) ক্রয়ে সামিল ব্যক্তি বা সংস্থাকে উপভোক্তা বলে চিহ্নিত করা হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্য বা পরিষেবার হাত বদলের ক্ষেত্রে একপক্ষ হল বিক্রেতা। অন্যপক্ষে, যিনি পণ্য কিনছেন, তিনি যদি তা ব্যবসার কাজে লাগান, তাহলে তাকে ক্রেতা বলা হয়। যিনি ক্রীত পণ্য বা পরিষেবাকে নিজের ভোগে লাগাচ্ছেন তিনি হলেন উপভোক্তা। কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি বাদ দিলে, এইসব লেনদেনে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকার নিরিখে কিছুটা বৈষম্য থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতা বা উপভোক্তা সংশ্লিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে বিক্রেতার তুলনায় কম ওয়াকিবহাল। আবার, তার উলটোটাও হতে পারে। এই তথ্য অবগত থাকার বিষয়ে অসাম্য বিক্রেতা বা ক্রেতার ওপর বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে। অসাম্য মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠলে বাজার ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ার ঝুঁকি থেকে যায়। আধুনিক পৃথিবীতে অর্থনীতি বা বাজার ব্যবস্থা ভেঙে পড়া মানে বিপর্যয়। তাই, সব দেশে, সরকারের তরফে বাণিজ্যমহল এবং উপভোক্তা—উভয়পক্ষেরই স্বার্থরক্ষায় নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্র চালু রয়েছে।[১] এই নিবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ক্রেতা সুরক্ষা এবং সচেতনতা নিয়ে।

ক্রেতা সুরক্ষার ধারণার বিবর্তন

ক্রেতা সুরক্ষার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে United Nations Guidelines for Consumer Protection —UNGCP। তা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় প্রথমবার গৃহীত হয় ১৯৮৫ সালের ১৬ এপ্রিল। UNGCP আদতে হল ক্রেতার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়ন এবং একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলার দিশানির্দেশ (UNCTAD, 2015)। পরে ১৯৯৯ এবং ২০১৫ সালে UNGCP-র কিছু পরিমার্জন করা হয়।

UNGCP-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশ ক্রেতার সুরক্ষা, অধিকার এবং কর্তব্যের বিষয়ে সচেতনতার প্রসারে এবং লেনদেন সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিজের নিজের আইনি ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলার কাজ হাতে নিয়েছে। পণ্য ও পরিষেবার বিষয়ে ক্রেতাদের সম্যকভাবে অবহিত করা এবং তার প্রপ্তিস্থল, দাম-সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনার প্রসারে চলছে অভিযান।

ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা

উপভোক্তা সুরক্ষার লক্ষ্যে আইনি সংস্থান প্রণয়নে অন্যতম পুরোধা দেশ হল ভারত। UNGCP প্রণয়নের পরের বছরই, ১৯৮৬ সালে এদেশে চালু হয় উপভোক্তা সুরক্ষা আইন। পরে পরে কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যের সরকার উপভোক্তা সুরক্ষা এবং সচেতনতার লক্ষ্যে আরও কিছু আইন প্রণয়ন করেছে

[লেখক দিল্লিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার National Professional Officer হিসেবে নিযুক্ত। ই-মেল : c.lahariya@gmail.com; lahariyac@who.int]

এবং ব্যবস্থাপত্র গড়ে তুলেছে। ১৯৮৬-র আইনকে সামনে রেখে চালু হয়েছে আরও প্রায় ১৫-টি আইন। এই আইনগুলিকে মূল আইনটির অনুসারী এবং সহায়ক হিসেবে ভাবা যেতে পারে (বক্স-১ দ্রষ্টব্য)।

১৯৮৬-র ক্রেতা সুরক্ষা আইন (CPA Act, 1986)-এর লক্ষ্য উপভোক্তার অধিকার ও স্বার্থরক্ষা।[২] ক্রেতা-বিক্রেতা বিরোধ মেটানোর প্রক্রিয়া সহজতর এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এজন্য জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে উদ্যোগের সংস্থান রয়েছে ওই আইনে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরে তৈরি হয়েছে উপভোক্তা বিষয়ক পৃথক দপ্তর। উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষায় রয়েছে আরও কিছু আইনি সংস্থান (বক্স-১ দ্রষ্টব্য)।

বক্স-১
ভারতে ক্রেতা সুরক্ষার লক্ষ্যে আইনি সংস্থান

I. স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উপভোক্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত :
- মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৭
- ২০১৭-র HIV/AIDS আইন
- খাদ্য নিরাপত্তা ও মানক (Standards) আইন, ২০০৬
- অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন, ১৯৯৪
- The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food (Regulation of Production, supply and Distribution) আইন, ১৯৯২
- ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬
- খাদ্য অপমিশ্রণ প্রতিরোধ (The Prevention of Food Adulteration) আইন, ১৯৫৪
- ওষুধ ও প্রসাধনী আইন, ১৯৪০

II. আরও ব্যাপক অর্থে :
- প্রতিযোগিতা আইন, ২০০২
- পরিবেশ রক্ষা আইন, ১৯৮৬
- কালো টাকা প্রতিরোধ আইন, ১৯৮০
- অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫
- নাগরিক অধিকার রক্ষা আইন, ১৯৫৫
- ফলজাত পণ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ১৯৫৫ (The Fruits Product Order)
- কৃষিজ পণ্য আইন, ১৯৩৭
- পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০
- ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২

স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ক্রেতা সুরক্ষা

বিগত বছরগুলিতে চিকিৎসাক্ষেত্রে পেশাদার, হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র, নার্সিংহোম এবং এ সম্পর্কিত পরিষেবা-গুলিকে ১৯৮৬-র ক্রেতা সুরক্ষা আইনের অনুচ্ছেদ ২(১) ধারার আনার লক্ষ্যে দেশের নানা আদালত একাধিক রায় দিয়েছে। এই রায়গুলিতে 'পরিষেবার চুক্তি' এবং 'পরিষেবার জন্য চুক্তি'—এই দু'টি ধারণার মধ্যে একটা পার্থক্য তৈরি হয়েছে।[৩] চিকিৎসাক্ষেত্রে পেশাদারদের রাখা হয়েছে 'পরিষেবার জন্য চুক্তি' ধারণার আওতায়।

এই আলোচনায় অন্য ক্ষেত্রের সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবার ফারাকটা মাথায় রাখতে হবে। চিকিৎসাক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানকারী এবং উপভোক্তার মধ্যে সবসময় সুনির্দিষ্ট ভেদরেখা টানা সম্ভব নয়। একটু বড়ো প্রেক্ষাপটে বিষয়টা ভাবতে গেলে দেখা যাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে মানুষ শুধু বহিরাগত সুবিধাপ্রাপক বা উপভোক্তা নন, তারা সহ-উৎপাদনকারী। ব্যক্তিগত স্তরে কোনও মানুষ/রোগী যেভাবে আচরণ করছেন তার প্রভাব প্রদেয় স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর পড়তে বাধ্য। ব্যক্তি মানুষের জীবনযাপনের ধরনধারণ বা আচরণ (শারীরিক কাজকর্ম, মদ খাওয়া কমানো, সিগারেট বা তামাক ছেড়ে দেওয়া) অনুযায়ী তার শরীর স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে। যখন কোনও ব্যক্তি (বা রোগী) চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলেন, তখন তিনি স্বাস্থ্যের হালহকিকতের দিক থেকে ভালো জায়গায় থাকেন। এক্ষেত্রে তার নিজের আচরণ অনেকটাই স্থির করে দেয় তিনি যে পরিষেবা পেলেন তার কার্যকারিতার কতটা কী দাঁড়াবে?

স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও কয়েকটি দিক এবং ব্যবস্থাপনা রয়েছে, যেগুলির প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে ক্রেতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে। তেমনই একটি হল সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা। অন্যটি স্বাস্থ্য পরিষেবার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে কম ব্যয়বহুল করার চেষ্টা সবসময়েই থাকে। এজন্য দরকার চিকিৎসা পণ্য এবং চিকিৎসা পরিষেবার দামের নিয়ন্ত্রণ। আবার পরিষেবার মান বজায় রাখাও সমান জরুরি। এই লক্ষ্যে চালু রয়েছে ভারতীয় জনস্বাস্থ্য মানক (Indian Public Health Standards—IPHS) এবং ২০১০ সালের Clinical Establishment (Registration and Regulation) আইন।

একটি বিতর্কের প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে দেখলেই তা স্পষ্ট করে বোঝা যাবে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, যেসব রোগীরা বেসরকারি জনকল্যাণমূলক সংস্থা বা সরকারি হাসপাতাল থেকে নিখরচায় স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে থাকেন, তারা ১৯৮৬-র উপভোক্তা সুরক্ষা আইন মোতাবেক

'উপভোক্তা' হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য কি না? ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে রোগীদের সহায়তা এবং সুরক্ষায় যেসব ব্যবস্থাপত্র চালু আছে তার কয়েকটি খতিয়ে দেখা যাক।

(ক) **চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১০ (The Clinical Establishment and Regulation Act, 2010) :** এই আইনে সব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের একটি ন্যূনতম মান থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের আওতায় নথিভুক্ত হতে হবে। চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মানতে হবে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা। অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত পরিষেবা প্রদানকারীর হাত থেকে উপভোক্তাকে রক্ষা করার সংস্থানও এখানে রয়েছে। এটি কেন্দ্রীয় আইন। এখনও পর্যন্ত সীমিত সংখ্যক রাজ্য এটি গ্রহণ এবং কার্যকর করেছে।

(খ) **চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে রাজ্যভিত্তিক উদ্যোগ :** বিগত দশকে বেশ কয়েকটি রাজ্য চিকিৎসা পরিষেবার প্রদানকারী সংস্থার ওপর নজরদারি, খরচাপাতি এবং নীতি বহির্ভূত কাজের জন্য শাস্তির সংস্থান রেখে নানা আইন চালু করেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগত মান বজায় রাখা এবং উপভোক্তার স্বার্থরক্ষা এই সব আইনের লক্ষ্য।

(গ) **২০১৩-র ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা—The Drug (Price Control) Order (DPCO) 2013 :** ১৯৯৫-এর অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের আওতায় ভারত সরকার এই নির্দেশ জারি করে। ২০১৩-র এই নির্দেশিকা ১৯৯৫-এর সমধর্মী নির্দেশিকার স্থলাভিষিক্ত। জরুরি ওষুধপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারি হস্তক্ষেপের সংস্থান রাখা আছে এখানে। ভারতে এটা খুবই প্রয়োজন। কারণ, চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও মানুষকে মোট যে অর্থ ব্যয় করতে হয় তার দুই-তৃতীয়াংশই যায় ওষুধের খরচ মেটাতে। একই ধরনের ওষুধ বিভিন্ন সংস্থা নিজের নিজের নামে বিভিন্ন দামে বিক্রি করে। যাতে অন্তত, অত্যাবশ্যকীয় বলে চিহ্নিত ওষুধগুলির দাম সাংঘাতিকভাবে বেড়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে না চলে যায় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই DPCO জারি করা হয়েছে। এই উপায়েই সরকার স্টেন্ট-এর দাম নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

(ঘ) **আরও কয়েকটি উদ্যোগ :** গত কয়েক বছরে ওষুধের জেনেরিক নাম ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের ওষুধ ব্র্যান্ড নাম লাগানো সমধর্মী ওষুধের তুলনায় দামে অনেক কম।

বক্স-২

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ক্রেতাদের সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

উপভোক্তাদের সুরক্ষা, অধিকার এবং কর্তব্যের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। তারা স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্য কয়েকটি দিককেও প্রভাবিত করতে পারেন। যেমন :

(ক) নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আলোচনা (সংবাদ মাধ্যম, নাগরিক সমাজ),

(খ) সরকারের কাছে দাবি এবং সরকারের প্রত্যাশা,

→ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জনমুখী করে তোলা।

→ জন স্বাস্থ্য পরিষেবা।

→ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় আরও বিনিয়োগ।

→ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের তরফে আরও বিনিয়োগ (এক্ষেত্রে দেশগুলির তালিকায় ভারতের জায়গা একেবারে নিচের দিকে)।

→ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে গিয়ে মানুষ যাতে সর্বস্বান্ত না হয়ে যান। এক্ষেত্রে সামাজিক স্বাস্থ্য বিমার ধারণাটি উঠে আসে।

(গ) লক্ষ্যপূরণে দায়বদ্ধতা এবং প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা।

(ঘ) সাধারণ মানুষ এবং জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার ভিত মজবুত করা।

সামনের পথ

সার্বিকভাবে ক্রেতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত অনেকটাই এগিয়েছে। তবে এখনও সামনে বহু পথ বাকি। বিশেষত, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কয়েকটি দিকে বিশেষ জোর দিতে হবে :

(ক) **ব্যাপকতর এবং সার্বিক উদ্যোগ :** স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের জটিল চরিত্রের বিষয়টি মাথায় রেখে ক্রেতাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনার আরও প্রসার জরুরি। এর সঙ্গে ক্রেতা বা উপভোক্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতনতা বাড়াতে হবে। এগোতে

হবে 'স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ে শিক্ষা'-র দিকটিতেও। ক্রেতার নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা[৪], স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান[৫] এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কিত ন্যূনতম জ্ঞান[৬]-এর সমন্বয় ঘটলে তবেই কাঙ্ক্ষিত ফল মিলবে (বক্স-২ দ্রষ্টব্য)। স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলির নানা দিক রয়েছে।[৭]

(খ) **চালু ব্যবস্থাগুলি আরও দক্ষ করে তোলা এবং নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ :** স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ক্রেতার অধিকার বিষয়ে কর্মরত সরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে অসরকারি উদ্যোগও জরুরি। বিভিন্ন নাগরিক সমাজ সংগঠন এবং গোষ্ঠীগত প্রয়াস এখানে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে জাতীয় নগরাঞ্চল স্বাস্থ্য মিশন (National Urban Health Mission)-এর আওতায় গড়ে ওঠা মহিলা আরোগ্য সমিতি এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (National Health Mission)-এর আওতাধীন 'আশা' কর্মীদের প্রসঙ্গ।

(গ) **ICI, mHealth, চিরাচরিত গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যম মঞ্চগুলিকে কাজে লাগানো :** সচেতনতা প্রসারে মুদ্রিত এবং বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে। তার সঙ্গে নতুন যেসব মাধ্যম প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে, যেমন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT), মোবাইল নির্ভর পরিষেবা (mHealth), এবং সর্বোপরি সামাজিক মাধ্যম (Social Media)—সেগুলি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা

নিতে পারে। তবে প্রচারের ক্ষেত্রে তথ্য সংক্রান্ত বিভ্রান্তির বিষয়ে সাবধান থাকা দরকার।

(ঘ) **পাঠক্রমে ক্রেতা সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা :** বিদ্যালয় এবং কলেজ স্তরে পাঠক্রমে বিষয়গুলি থাকলে নতুন প্রজন্ম প্রথম থেকেই সম্যকভাবে অবহিত হয়ে উঠবে।

শেষ কথা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সাধারণ মানুষ। তারা বহিরাগত সুবিধাপ্রাপক নন। উপভোক্তা বা ক্রেতাকে সবার ওপরে বসিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত নীতি ও ব্যবস্থাপত্র গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে গ্রাহক এবং পরিষেবা প্রদানকারীর ভেদরেখা সেভাবে না থাকায় বিষয়টি একটু জটিল। তাই প্রয়োজন ক্রেতার অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনার প্রসারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির প্রচার। সব পক্ষকেই নিজের দায়িত্ব পালনে যত্নবান হতে হবে। আইনি সংস্থান এবং আইনি নয় এমন ব্যবস্থাপত্রগুলির ভূমিকাও অপরিসীম। আমরা এখন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ভারত সরকার ২০১৭-র নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রকাশ করেছে। সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা বা Universal Health Coverage—UHC নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বিস্তর। UHC সম্ভব। ব্যক্তি ও দলবদ্ধ স্তরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং ক্রেতা সচেতনতার যথোপযুক্ত প্রসার ঘটলে তখনই তা বাস্তব হয়ে উঠতে পারে।❑

টীকা :

(১) উপভোক্তা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত আলোচনায় স্বাস্থ্য বিমার প্রসঙ্গ প্রায়ই উঠে আসে। স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রে তথ্যলব্ধতার অসাম্য, পছন্দে ভুল, এক নীতিগত বিচ্যুতির সমস্যাগুলি প্রায়ই সামনে এসে পড়ে। সরকারকে দেখতে হবে যাতে স্বাস্থ্য বিমার প্রয়োজন যাদের সবচেয়ে বেশি তারা যেন বঞ্চিত না হন। আগে থেকেই কোনও রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলে অনেক সময় বিমা করাতে অসুবিধা হয়। ২০১০ সালে ওবামাকেয়ার চালু হওয়ার আগে মার্কিন মুলুকে এই সমস্যা খুবই প্রকট ছিল। আবার, বিমার সুবিধা ভোগ করার ক্ষেত্রে উপভোক্তাকেও নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি দরকার সচেতনতার।

(২) উপভোক্তার অধিকারের মধ্যে পড়ে নিরাপত্তার অধিকার, তথ্য জানার অধিকার, পছন্দের অধিকার, নিজে কথা শোনানোর অধিকার, প্রতিকার চাইবার অধিকার প্রভৃতি।

(৩) 'পরিষেবার চুক্তি' অনুযায়ী পরিষেবা প্রদানকারী নিজের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করেন। তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় না। এখানে চাহিদা অনুযায়ী কাজ করার দায়বদ্ধতা থাকে সেটা অবশ্য পালনীয়।

(৪) ক্রেতা সচেতনতা বলতে এখানে পণ্য বা পরিষেবার ভোগ করার বিভিন্ন দিক বোঝাচ্ছে। সাধারণ অর্থে ক্রেতা সচেতনতার ধারণা আরও ব্যাপক। সেখানে সর্বাধিক খুচরো দাম, ন্যায্যমূল্যের দোকান, নির্দিষ্ট পণ্যের দাম, পণ্যের গুণগত মান, নিজের অধিকার ও কর্তব্য—এসব কিছুই চলে আসে।

(৫) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষকে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা বা স্বাস্থ্য পরিচর্যা করার পন্থাপদ্ধতি সম্পর্কে জানানো।

(৬) যোগাযোগের ক্ষমতা এবং তার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত সুযোগগুলি কাজে লাগানো। তথ্য জানলেই চলবে না। তার ব্যবহার জানাও জরুরি। ক্রেতার ক্ষমতায়নের সঙ্গে বিষয়টির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে।

(৭) ভারতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষার পরিসরের মধ্যে চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ওষুধের সঠিক ব্যবহারের বিষয়টিও এসে পড়ে। প্রেসক্রিপশন ছাড়া মুড়ি-মুড়কির মতো যা খুশি ওষুধ খাওয়া, অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স শেষ না করার ফল মারাত্মক হতে পারে। আচরণগত দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যই এদেশে হাইপারটেনশন বা ডায়াবেটিসের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ সব সমস্যার মোকাবিলাতেই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

তথ্যের আরও উৎস :

- ☐ UNCTAD. United Nations Guidelines on Consumer Protection. [http://unctad.org/en/Pages/DITC/Competitional Law/UN-Guidelines-on-Consumer-Protection.aspx].
- ☐ Agarwal AD, Banerjee A. Free medical O care and consumer protection. Indian J Med Ethics 2011.
- ☐ ভারত সরকার। ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬। [http://ncdrc.nic.in/ bare acts/Consumer%20Protection%20Act-1986.html].
- ☐ ভারত সরকার। The Cinical Establishments (registration an regulation) Act, 2010. [http://clinicalestablishments.nic.in/ems/Home.aspx].

NEW HORIZON STUDY CIRCLE
WBCS (Gr-A), 2016
Suman Rajbangshi
Roll No. - 1500149, ADSR
"I am an IAS aspirant. However, in the mid way of my preparation I have achieved a partial success having been selected as an WBCS officer. For my success I wish to record my gratitude to T. Hossain sir and his NHSC. Truly, he is my friend, philoshopher and guide."
WBCS (Exe.) Full Course
Class Coaching | Mock Tests | Interview Preparation
General Combined Course
IBPS, Central/State level SSC, Railway etc.
Only Mock Tests Program.
Provision of Notes and Essential Books
Contact
Immediately for Compulsory Economics Classes of Tojammel Hossain
Ph - 9836484969
WBCS (Exe.) 2015
Erfan Habib
Deputy Collector & Deputy Magistrate.
"New Horizon Study Circle" WBCS (Exe.)
First of all, I want to give thanks to my 'Guru' in Economics Tojammel Sir and his esteemed team of my alma mater 'New Horizon Study Circle'. They helped me to stay on the right path and provided me right guidance throughout the journey of my civil service exam preparation. Subject wise strategy with heuristic helped me to achieve this feat.
Dr. Dipanjan Jana [WBCS (Gr. A), 2016], R.No. - 0105201
W.B. Food & Supplies Officer Departmental Rank - 3
APO WBCS (2015) Inspector of Co-operative Society
Ramanth Das (WBCS, 2015)
Ajijul Shaikh (WBCS) Group-A
Shayan Ahmed (WBCS) DSP
Surajit Mondal (DSP)
Durbar Banerjee (DSP)
Md. Saifur Rahaman (WBCS) C.T.O
Piyali Mondal WBCS (Exe.) BDO
Sam Mohammed SK. (WBCS) Group-C
Chitra Majumdar (WBCS) JSWS
Souvik Chatterjee (WBCS) R.O.
Dip Sankar Das (WBCS) R.O.
Kalyan Laha (WBCS) Jt. BDO
Tarikul Islam (WBCS) R.O.
Rathin Sarkar (WBCS) Group-C
Nilanjan Sinha (WBCS) Group-C
Eleyas WBP (S.I.)
Mofijur Rahaman (WBCS) ACTO
Anjan Chatterjee (A.P.C)
Monirul Islam (WBCS) R.O.
Sounak Banerjee (WBCS) Group-A
Chandrani Bandhyopadhyay (WBCS) Group-C
তুজাম্মেল হোসেন-এর নিউ হরাইজন পাবলিকেশনের বইগুলি WBCS (Preli. & Mains) ও অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের শেষ কথা
Target WBCS Preliminary
Available Now
Target WBCS Preliminary
Will be published very soon
INDIAN ECONOMY
TET
Available Now
Available Now
Available Now
Available Now
Available Now
... etc.
Available Now
Available Now
NEW HORIZON STUDY CIRCLE &
NEW HORIZON PUBLICATION OF
T. Hossain
C(P) 2/2, 66 Barnaparichay Market (Block A, 1st floor), College st. Kolkata - 700 007
Phone : 033-22416899 / 9836484969
E-mail : collegestreet.newhorizon@gmail.com | Website : www.newhorizonstudy.com

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

উপভোক্তা সচেতনতা ও সুরক্ষায় দেশে অগ্রণী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ

অরুণ কর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুরু থেকেই উপলব্ধি করে যে, শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন কিংবা বিচার পরিকাঠামো গঠন করে উপভোক্তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এজন্যে চাই উপভোক্তা শিক্ষা তথা সচেতনতার প্রসার। আর এই ভাবনা থেকেই শুরু হয় উপভোক্তা সশক্তীকরণের কাজ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুরু থেকেই এই দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে একের পর এক উপভোক্তা কল্যাণমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সরকারের সেই নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে ভারতে উপভোক্তা সুরক্ষার মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ আজ উজ্জ্বলতম রাজ্য।

ভারতের উপভোক্তা সুরক্ষার বিষয়টি যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হ'ত, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ঐতিহাসিক রচনাবলিতে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। সিন্ধু নদের অববাহিকায় খননকালে ওজন যন্ত্রের আবিষ্কার এদেশে ক্রেতা সুরক্ষা-ধারণার প্রাচীনত্বের প্রমাণ। প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতেও উপভোক্তা সুরক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, নারদস্মৃতি প্রভৃতিতে পণ্য ও পরিষেবার মানের মানকীকরণের সঙ্গে কেনাবেচা সংক্রান্ত অনুশাসনের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, মনুস্মৃতিতে 'এথিক্যাল ট্রেড প্র্যাক্টিসেস' বা নীতিসঙ্গত ব্যবসা অনুশীলনের নির্দেশ রয়েছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উপভোক্তা কল্যাণার্থে প্রণীত রাষ্ট্রীয় বিধি এবং তার প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কিত বিষয়াবলির উপর একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় রয়েছে। মৌর্য যুগে পরিষেবা ও পণ্যের গুণমান কেমন হবে, কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধু ব্যবসায়ীরা কীভাবে ক্রেতাদের প্রতারণা করতে পারেন এবং প্রতারিত ক্রেতারাই বা কীভাবে কার কাছ থেকে কী সুরাহা পাবেন, সব কিছুই রাষ্ট্রীয় বিধি অনুযায়ী সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। সার্থবাহ থেকে খুচরো বিক্রেতা, সকলকেই বাণিজ্য অধিকর্তা বা ডিরেক্টর অফ ট্রেড-এর কাছে বাধ্যতামূলকভাবে নাম নথিভুক্ত করতে হ'ত। যার ফলে ওজন বা গুণমানে কিংবা দামের ক্ষেত্রে কোনও তঞ্চকতা ঘটলে অপরাধীকে দ্রুত চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া সহজসাধ্য ছিল।

পরবর্তীকালে তুর্কি শাসকদের আমলেও ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কিত আইনকানুন যথেষ্ট কঠোর ছিল। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির আমলে রাষ্ট্র গুণমান অনুযায়ী সব ধরনের ভোগ্যপণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিত। কোনও বিক্রেতা ওজনে কম দিলে অঙ্গচ্ছেদের মতো কঠোর শাস্তির বিধান ছিল।

এরপর প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনকালে ভারতবর্ষে ক্রেতা সুরক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, পরিমার্জন বা পরিবর্ধনের প্রচেষ্টা সেভাবে চোখে পড়েনি। তবে ব্রিটিশ আমলে 'ফর্মেশন অব আ ইউনিফায়েড নেশনওয়াইড মডার্ন লিগ্যাল সিস্টেম' প্রবর্তিত হয়েছিল, যার ফলে ক্রেতা সুরক্ষার বিষয়ে দেশজুড়ে অভিন্ন নীতি ও পদ্ধতি অনুসৃত হতে শুরু করে। স্বাধীনোত্তর ভারতে ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে মেট্রিক সিস্টেমের প্রবর্তন কিন্তু এই 'ইউনিফায়েড নেশনওয়াইড মডার্ন লিগ্যাল সিস্টেম'-এরই এক সদর্থক পদক্ষেপ।

স্বাধীনোত্তর ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা

স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ উপভোক্তাদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে একগুচ্ছ আইন প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে 'ওয়েটস অ্যান্ড মেজারস অ্যাক্ট, ১৯৭৭' (সংশোধিত ও পরিমার্জিত আইনের নতুন নাম 'লিগ্যাল মেট্রোলজি অ্যাক্ট, ২০০৯'), 'ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট, ১৯৪০' (সংশোধিত ও

[লেখক পশ্চিমবঙ্গ উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকারের সহ-অধিকর্তা। ই-মেল : arunkar77@yahoo.com]

পরিমার্জিত আইনের নতুন নাম 'ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট, ২০১৬'), 'প্রিভেনশন অব ফুড অ্যাডাল্টারেশন অ্যাক্ট, ১৯৫৪' (সংশোধিত ও পরিমার্জিত আইনের নতুন নাম 'ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট, ২০০৬'), 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ (অবজেকশনেবল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৪' ইত্যাদি উল্লেখ্য। কিন্তু এসব আইনই ছিল প্রকৃতিগতভাবে 'প্রিভেন্টিভ' বা নিবৃত্তিমূলক। অন্যায্য বাণিজ্য রোধ বা নিবৃত্তি নিঃসন্দেহে উপভোক্তা স্বার্থরক্ষার একটা বড়ো উপায়, কিন্তু যেসব উপভোক্তা এই অন্যায্য ব্যবসার শিকার হয়ে আর্থিক ও অন্যান্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের জন্যে আইনগুলিতে কোনও ধারা যুক্ত করা হয়নি। ফলে স্বাধীনোত্তর ভারতে এমন একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, যার ফলে একাধারে অন্যায্য বাণিজ্য রোধ এবং এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উপভোক্তার ক্ষতিপূরণ-সহ যথাযথ প্রতিবিধানের সংস্থান থাকবে। অবশেষে উপভোক্তাদের স্বার্থ সার্বিকভাবে সুরক্ষিত করার কথা মাথায় রেখে ১৯৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর এক যুগান্তকারী আইন প্রণীত হয়, যার নাম 'কনজ্যুমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ১৯৮৬'। এই আইনে উপভোক্তাদের জন্যে স্বীকৃত ছ'টি অধিকারের মধ্যে অন্যতম হল প্রতিকার দাবি করার অধিকার।

এই আইনবলে উপভোক্তাদের জন্যে প্রদত্ত অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার জন্যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো এরাজ্যেও ত্রিস্তরীয় কাউন্সিল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিস্তরীয় বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুরু থেকেই উপলব্ধি করে যে, শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন কিংবা বিচার পরিকাঠামো গঠন করে উপভোক্তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এজন্যে চাই উপভোক্তা শিক্ষা তথা সচেতনতার প্রসার। আর এই ভাবনা থেকেই শুরু হয় উপভোক্তা সশক্তীকরণের কাজ। অধিকার প্রয়োগ এবং প্রতিকার আদায়ের জন্যে উপভোক্তাকেই এগিয়ে আসতে হবে, একথাও যেমন সত্যি, তেমনি এটাও সত্যি যে, উপভোক্তাকে এগিয়ে আসবার জন্যে সক্ষম করে তোলার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুরু থেকেই এই দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে একের পর এক উপভোক্তা কল্যাণমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সরকারের সেই নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে ভারতে উপভোক্তা সুরক্ষার মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ আজ উজ্জ্বলতম রাজ্য।

চিত্র-১

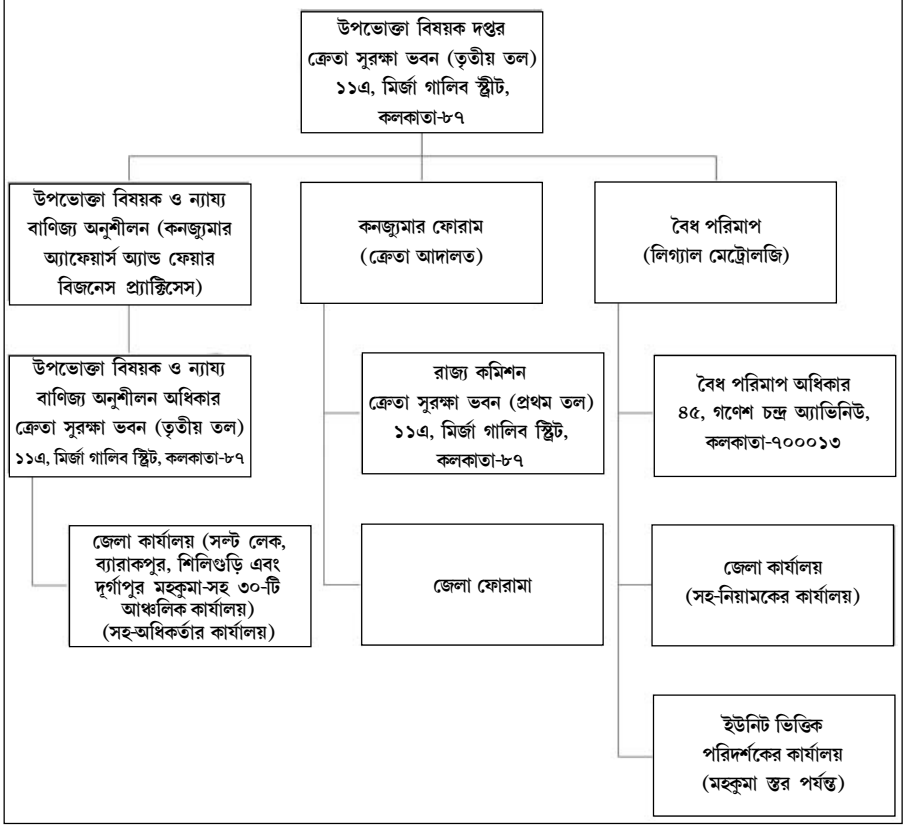

পশ্চিমবঙ্গ ক্রেতা সুরক্ষার ক্রমবিকাশ

ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যের মতো উপভোক্তা সুরক্ষার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের অধীনে থাকলেও ১৯৯৯ সালে এরাজ্যে 'উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর' নামে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য, যেখানে উপভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষায় একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ দপ্তরের কথা ভাবা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় গঠিত 'ডিস্ট্রিক্ট ফোরাম' এবং রাজ্য স্তরে 'স্টেট কমিশন'-এর কাজের তদারকির মধ্য দিয়ে এই দপ্তরের সূচনা হয়েছিল বটে; কিন্তু ২০০১ সালে কন্ট্রোলারেট (২০০৩ সালে 'ডাইরেক্টরেট'-এ উন্নীত) অব লিগ্যাল মেট্রোলজিকে এই দপ্তরের অধীনে আনা হয়। ওই একই বছরের পয়লা অক্টোবর উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অধীনে আরেকটি ডাইরেক্টরেট গঠিত হয়। ওই ডাইরেক্টরেটটির নামকরণ করা হয় 'কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাক্টিসেস' বা 'উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার'। এই নামকরণের মধ্য দিয়েই ডাইরেক্টরেট তথা দপ্তরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে পরিষ্কার ধারণাটি তৈরি হয়, সেটি হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধুমাত্র উপভোক্তাদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার মধ্যে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। বরং কয়েক ধাপ এগিয়ে রাজ্যে সুস্থ ও নীতিসঙ্গত বাণিজ্য পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করাও এই দপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য।

● **উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর :**

তিনটি স্বতন্ত্র শাখা সংগঠন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর। এই শাখা সংগঠনগুলি হল : (ক) উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার, (খ) কনজ্যুমার ফোরাম, এবং (গ) বৈধ পরিমাপ অধিকার। ১ নং চিত্রটির মাধ্যমে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের পরিকাঠামো দেখানো হল।

এখন আমরা দেখে নেব, উপভোক্তা দপ্তরের এই তিনটি শাখা সংগঠন কীভাবে এ রাজ্যের উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা করে চলেছে।

(ক) উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার : উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের একটা খুব চালু স্লোগান হল, 'সচেতন উপভোক্তাই সুরক্ষিত উপভোক্তা'। এই আপ্তবাক্যটিকে পাখির চোখ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই দপ্তরের সূচনা পর্ব থেকে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল রাজ্যের সাধারণ মানুষকে উপভোক্তা হিসেবে রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি অধিকার প্রয়োগ করে প্রতিকার লাভ করতে সক্ষম করে তোলা। সেই উদ্দেশ্যে এই ডাইরেক্টরেট আয়োজিত সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে কয়েকটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়।

- সাধারণ মানুষের কাছে ক্রেতা সুরক্ষা আইন-সহ অন্যান্য উপভোক্তা-বান্ধব আইনের ভাষ্য অত্যন্ত সহজভাবে তুলে ধরা।
- কেনাকাটা করার আগে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করলে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা সব থেকে কম থাকবে?
- কোনও জিনিস কেনা বা পরিষেবা গ্রহণ করবার সময় উপভোক্তার পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ।
- কেনাকাটা করে ঠকে গেলে উপভোক্তা সুরক্ষা আইনে কী কী প্রতিবিধান পাওয়া যেতে পারে?
- ক্ষতিগ্রস্ত উপভোক্তা এই আইনবলে কীভাবে প্রতিকার দাবি করবেন?
- উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে গঠিত সরকারি পরিকাঠামোসমূহের হদিশ।
- সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিধিবদ্ধ কনজ্যুমার ফোরামে অভিযোগ জানানোর জন্যে কীভাবে ও কী কী আইনি সুবিধা পাওয়া যাবে?
- আদালতের বাইরে আপোশ মীমাংসার মাধ্যমে উপভোক্তা-বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা।

উপভোক্তা সচেতনতার মাধ্যম ও পদ্ধতি হিসাবে হাতিয়ার করা হয়।

- রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য গণমাধ্যম।
- আলোচনাসভা, সচেতনতা শিবির, মেলা, কর্মশালা।

লেখচিত্র-১

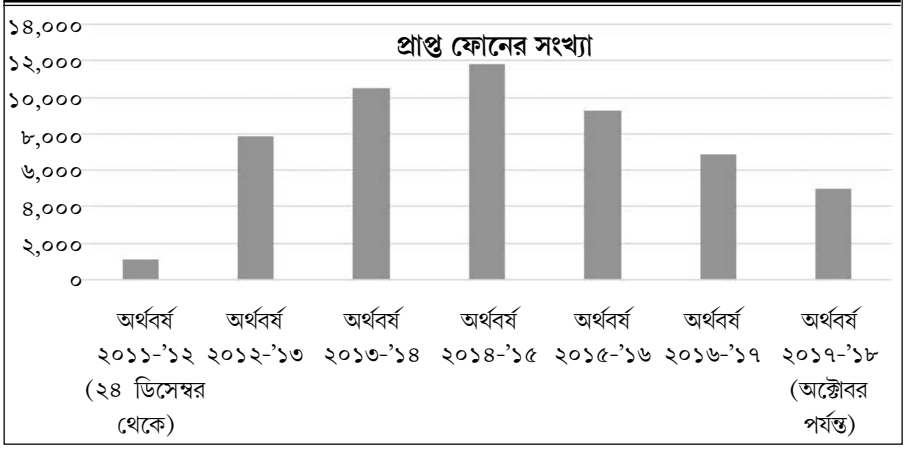

লেখচিত্র-২

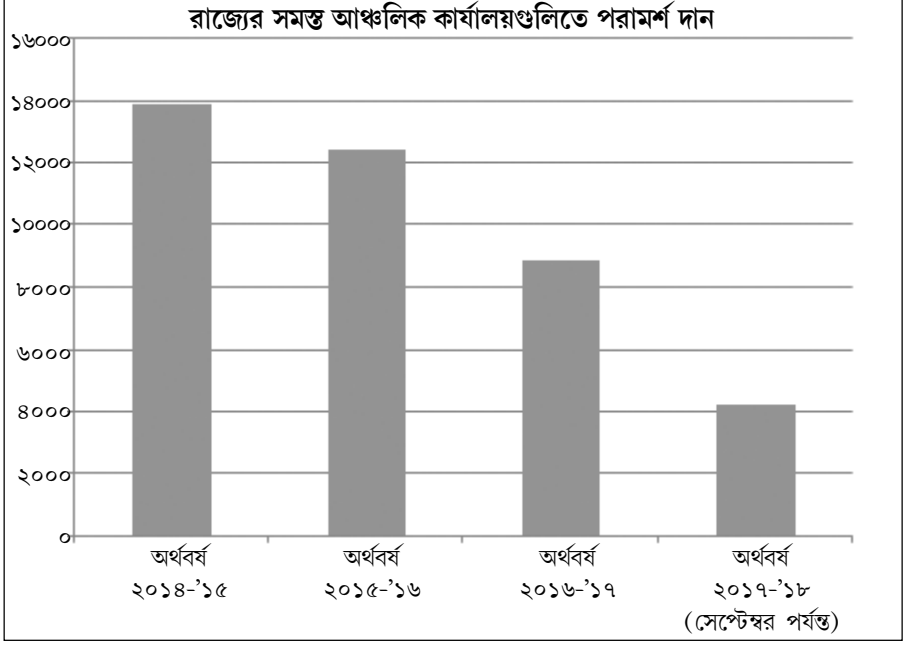

- জাদু প্রদর্শনী, কথা-বলা পুতুল, লোকসঙ্গীত, পথনাটিকা।
- ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্লোগান লেখা প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতা, এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।
- জনবহুল এলাকাতে বিভিন্ন প্রকারের হোর্ডিং, দেওয়াল লিখন এবং ব্যানারের মাধ্যমে প্রচার।
- বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং সংবাদপত্রের উপভোক্তাদের অধিকার ও প্রতারিত হলে প্রতিকার লাভের উপায় সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত আকর্ষণীয় রঙিন বিজ্ঞাপন।
- আকাশবাণী কলকাতা 'ক', কলকাতা বিবিধ ভারতী, কলকাতা এফ এম রেনবো, আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি ও শান্তিনিকেতনের মাধ্যমে প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সোমবার সন্ধ্যায় রাত ৮টা থেকে এক ঘণ্টার সরাসরি সম্প্রচারিত উপভোক্তা সচেতনতা বিষয়ক প্রশ্নোত্তরমূলক লাইভ ফোন-ইন অনুষ্ঠান।
- কলকাতা মেট্রো রেলের ২৩-টি স্টেশনে টিভির মাধ্যমে উপভোক্তা সুরক্ষার প্রচার।
- পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের বিভিন্ন রুটের বাসের গায়ে উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ক তথ্য সংবলিত রঙিন বিজ্ঞাপন।
- পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের বিভিন্ন রুটের সাধারণ বাসের গায়ে অনুরূপ তথ্য সংবলিত বিজ্ঞাপন।

- বছরের বিভিন্ন ঋতুতে রাজ্যের নানা প্রান্তে নানা লোক উৎসবে অংশগ্রহণ এবং প্রচার শিবির স্থাপন।
- প্রতি বছর নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ক্রেতা সুরক্ষা মেলার আয়োজন।
- রাজ্যজুড়ে প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর 'জাতীয় উপভোক্তা দিবস' এবং ১৫ মার্চ 'বিশ্ব উপভোক্তা অধিকার দিবস' উদ্‌যাপন।

বিগত বছরগুলিতে (সেপ্টেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত) উপভোক্তা সুরক্ষামূলক প্রচারের কার্যক্রম ও অর্থ ব্যয় দুই-ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ক এবং প্রতারিত হলে সমাধানের উপায় সংক্রান্ত তথ্য সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর ২০১১ সালের ২৪ ডিসেম্বর জাতীয় উপভোক্তা দিবসে ১৮০০-৩৪৫-২৮০৮ এই নম্বরের একটি নিঃশুল্ক উপভোক্তা হেলপ-লাইনের সূচনা করে। সরকারি কাজের দিনে কাজের সময়ে চারটি টার্মিনালযুক্ত এই হেলপ-লাইনে উৎসুক উপভোক্তারা ফোন করতে পারেন। সাধারণ উপভোক্তাদের কাছে এই টোল-ফ্রি হেলপ লাইনটি যে কত জনপ্রিয়, তা ১ নং লেখাচিত্র দেখলেই বোঝা যাবে।

এছাড়াও প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয় থেকেও আগত উপভোক্তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়। বিগত বছরগুলিতে উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকারের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে পরামর্শ ও তথ্য লাভের মাধ্যমে উপকৃত উপভোক্তাদের পরিসংখ্যান ২ নং লেখচিত্রে দেওয়া হল।

এছাড়া উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের ওয়েবসাইট www.wbconsumers.gov.in -এ নানাবিধ তথ্য ও পরিষেবার সুলুকসন্ধান দেওয়া হয়। ওয়েবসাইটটিকে সময়োপযোগী ও ব্যবহার-বান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে নতুন একাধিক সুবিধা যোগ করা হয়েছে। বিশেষ উপভোক্তা সচেতনতা কার্যক্রম, বিভিন্ন উপভোক্তা-বান্ধব আইন, দপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয়ের ঠিকানা ও অন্যান্য যোগাযোগর তথ্য, নিয়োগ বা দরপত্র সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তি এখন www.wbconsumers.gov.in ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে উপভোক্তা বিষয়ক

লেখচিত্র-৩

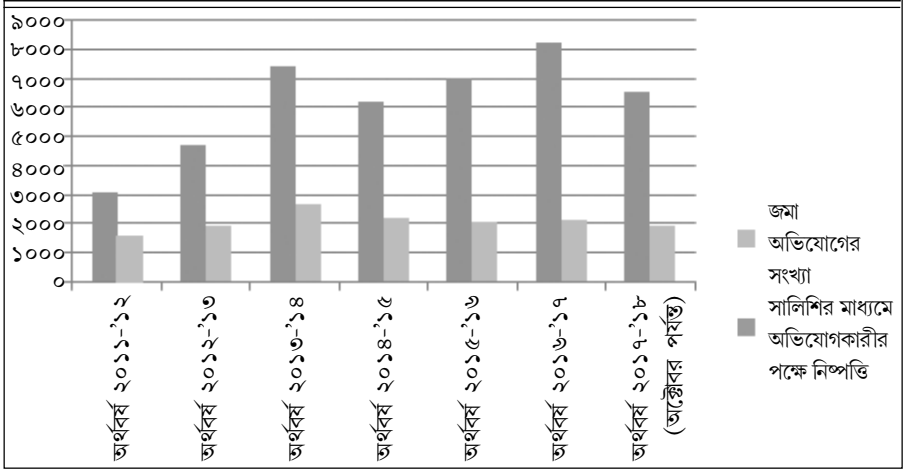

সারণি-১

অর্থবর্ষ	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০১০-'১১ (মে মাস থেকে)	৩১৭	১৪৫
২০১১-'১২	৫৬৪	১৫৯
২০১২-'১৩	৯২১	২৭৬
২৯১৩-'১৪	৩,৪৪৮	১,৬৫৮
২০১৪-'১৫	৪,৪৮০	৩,০১৭
২০১৫-'১৬	৫,৮৯৫	৩,৫৫৩
২০১৬-'১৭	৬,৮৬১	৩,৪২২

বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এখন ক্ষতিগ্রস্ত উপভোক্তারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন দরখাস্ত দাখিল করতে পারেন।

বিধিবদ্ধ কনজিউমার ফোরামে মামলায় আইনি সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে দপ্তর প্রাথমিকভাবে ১০-টি উপভোক্তা সহায়তা কেন্দ্র (কনজ্যুমার অ্যাসিস্ট্যান্স ব্যুরো)-র সূচনা করে। বর্তমানে ফোরাম ভিত্তিক ৭-টি সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি মামলা করার ক্ষেত্রে উপভোক্তাকে নিখরচায় পরামর্শ, কাগজপত্র প্রস্তুত ও প্রয়োজনে উকিল দিয়ে সহায়তা করছে। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী উপভোক্তা সংগঠন এই কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করে।

খুব শীঘ্রই উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর প্রতিটি কনজিউমার ফোরাম-পিছু একটি করে উপভোক্তা সহায়তা কেন্দ্র গঠন করতে চলেছে। উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে সারা রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত উপভোক্তারা আরও উপকৃত হবেন।

আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাক্টিসেস এবং রেস্ট্রিকটিভ ট্রেড প্রাক্টিসেস-এর কবল থেকে উপভোক্তাদের রক্ষা করতে দপ্তরের পক্ষ থেকে কনজিউমার ফোরামে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করার সংস্থান রয়েছে. উল্লেখ্য, আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাকটিস এবং রেস্ট্রিক্টিভ ট্রেড প্র্যাকটিস-এর বিরুদ্ধে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর এ পর্যন্ত কনজিউমার ফোরামে ৬-টি মামলা দায়ের করেছে। মূলত আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাকটিস এবং রেস্ট্রিক্টিভ ট্রেড প্র্যাকটিস-এর ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এমন বিষয়েই উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-র ১২(১)ডি) ধারায় মামলাগুলি দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি মামলাতে ইতোমধ্যেই সরকার জয়লাভ করেছে। বাকিগুলির মধ্যে দু'টি বর্তমানে জাতীয় উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনে এবং দু'টি রাজ্য উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনে বিচারাধীন। ইতোমধ্যে যে দু'টি মামলায় উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর জয়লাভ করেছে তার একটিতে বিরোধীপক্ষ ছিল 'দ্য রেমন্ড শপ' এবং রেমন্ডস' লিমিটেড। এক্ষেত্রে অভিযোগের বিষয় ছিল বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন। এবং দ্বিতীয় মামলায় প্রতিপক্ষ ছিল ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এক্ষেত্রে

অভিযোগের প্রতিপাদ্যে ছিল বিক্রি বাড়ানোর লক্ষ্যে 'জোড়ি বানাও অফার' নামে একটি লটারি নির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে অসাধু ব্যবসা। উপভোক্তাদের স্বার্থ লঙ্ঘনের একাধিক ঘটনার প্রেক্ষিতে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর ভবিষ্যতে অনুরূপ আরও মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এবার আসা যাক আপোশ মীমাংসার (মিডিয়েশন) মাধ্যমে বিকল্প উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রসঙ্গে।

দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম ২০০২ সালের ৩১ জুলাই থেকে মধ্যস্থতার মাধ্যমে উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। ক্রেতা-বিক্রেতা, উভয় পক্ষের কাছেই নির্ঝঞ্ঝাট এই সালিশি ব্যবস্থাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ইতোমধ্যেই তা ভারতে উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি রোল মডেল।

বর্তমানে এই দপ্তরের সবক'টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেলের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সরাসরি কনজিউমার ফোরামে মামলা করার আগে ক্ষতিগ্রস্ত উপভোক্তা সম্পূর্ণ নিখরচায় সাদা কাগজে দরখাস্ত করে আপোশ মীমাংসার মাধ্যমে প্রতিকার দাবি করতে পারেন। এছাড়া, বিভাগরে ওয়েবসাইট, www.wbconsumers.gov. in-এ লগ ইন করে অনলাইনেও মিডিয়েশনের জন্যে আবেদন করা যায়।

আবেদন যেভাবেই করা হোক না কেন, শর্ত একটাই, অভিযোগটি ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ অনুযায়ী উপভোক্তা বিরোধ সম্পর্কিত হতে হবে।

বিগত সাড়ে ছ' বছরে মধ্যস্থতায় উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ও সফল নিষ্পত্তির সংখ্যা—দুই-ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকারের সমস্ত আঞ্চলিক কার্যালয়ে গৃহীত অভিযোগ ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান পেশ করা হল ৩ নং লেখচিত্রের মাধ্যমে।

এছাড়াও উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অধীনে ২০১০ সালের মে মাসে ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ আপোশ মীমাংসার জন্যে সেন্ট্রাল গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেল গঠন করা হয়। এই সেলটি বর্তমানে ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিটে খাদ্য ভবন কমপ্লেক্সের ১৪ নম্বর শেডে অবস্থিত। এই সেলের সঙ্গে যোগাযোগের ফোন নম্বর (০৩৩) ২২৫২-৩০৮৭। ২০১০ সালের মে মাস থেকে ২০১৬-'১৭ সাল পর্যন্ত এই সেলে প্রাপ্ত উপভোক্তা অভিযোগ ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান সারণি-১-তে তুলে ধরা হল।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচেতন উপভোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্যজুড়ে ৮৪০ বিদ্যালয়ে গড়ে তোলা উপভোক্তা সঙ্ঘের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উপভোক্তা সচেতনতার প্রচার চালানো হচ্ছে বর্তমানে। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও যাতে এলাকার সাধারণ মানুষকে উপভোক্তা সুরক্ষার খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবহিত করতে পারে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে অসাধু ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে সে বিষয়ে তাদের সক্ষম করে তোলার কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে।

পোস্টার অঙ্কন, স্লোগান রচনা, প্রবন্ধ রচনা-সহ আরও নানা প্রতিযোগিতায় তাদের যুক্ত করে এবং পুরস্কার প্রদান করে উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৫-'১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে উপভোক্তা সচেতনতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলস্বরূপ, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে। দপ্তরের সূচনালগ্ন থেকেই বৃহত্তর মঞ্চে ক্রেতা সুরক্ষা মেলা আয়োজিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সরকারি ও অ-সরকারি সংস্থা মেলায় অংশগ্রহণ করে। উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ে সেমিনারের পাশাপাশি উপভোক্তাদের পরামর্শ প্রদানের ও অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা করা হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই মেলায় বিপুল জনসমাগম এবং গণমাধ্যমে এর সদর্থক মূল্যায়ন এই মেলার উপযোগিতা প্রমাণ করে। ২০১৭ সালে ২-৪ ডিসেম্বর নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই মেলা আয়োজিত হয়েছে।

পাশাপাশি, ব্যবসায়ীরা যাতে অন্যায্য ব্যবসা থেকে বিরত থাকেন এবং রাজ্যে যাতে নীতিসঙ্গত বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, তার জন্যে এই দপ্তর বিভিন্ন পণ্য বিপণনকারী এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে।

(খ) **কনজ্যুমার ফোরাম :** কনজ্যুমার ফোরাম হল উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-র ৯ নং ধারায় গঠিত কোয়াসি-

কনজ্যুমার প্রোটেকশান কাউন্সিল

কনজ্যুমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ১৯৮৬-র ৭ ও ৮এ(১) ধারা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে যথাক্রমে রাজ্য স্তরে স্টেট কনজ্যুমার প্রোটেকশন কাউন্সিল এবং প্রতিটি জেলায় একটি করে ডিস্ট্রিক্ট কনজ্যুমার প্রোটেকশন কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। এই কাউন্সিলগুলির কাজ হল ক্রেতা সুরক্ষা আইনে স্বীকৃত উপভোক্তাদের অধিকারগুলি স্থানীয় স্তরে রক্ষা করা এবং রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা।

এরাজ্যে স্টেট কনজ্যুমার প্রোটেকশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হলেন উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী সাধন পাণ্ডে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকরা ডিস্ট্রিক্ট কনজ্যুমার প্রোটেকশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অধিকারের সহ-অধিকর্তা হলেন এই কাউন্সিলের সদস্য-সচিব। কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে বছরে অন্তত দু'বার এই কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী দপ্তর থেকে শুরু করে অ-সরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি পর্যন্ত এই কাউন্সিলের সদস্য, তাই পারস্পরিক মত বিনিময় এবং সহযোগিতা আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই কাউন্সিল দু'টি রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে ক্রেতাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারণি-২

দাবির পরিমাণ (ক্ষতিপূরণ-সহ পণ্য বা পরিষেবার মোট মূল্য)	ক্রেতা আদালত
● কুড়ি লক্ষ টাকা পর্যন্ত	জেলা ফোরাম বা সি ডি আর এফ
● কুড়ি লক্ষ টাকার উপরে, কিন্তু এক কোটি টাকা পর্যন্ত	স্টেট কমিশন
● এক কোটি টাকার উপরে	ন্যাশনাল কমিশন

জুডিসিয়াল ত্রিস্তরীয় বিচার ব্যবস্থা। সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে জেলা ফোরাম (কনজ্যুমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল ফোরাম)। রাজ্য স্তরে শীর্ষ আদালতের নাম স্টেট কমিশন (স্টেট কনজ্যুমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন) এবং দেশের মধ্যে শীর্ষ আদালতটিকে ন্যাশনাল কমিশন (ন্যাশনাল কনজ্যুমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন) বলা হয়।

এরাজ্যে দু'টি অতিরিক্ত বেঞ্চ-সহ স্টেট কমিশনটি ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিটে ক্রেতা সুরক্ষা ভবনে অবস্থিত। খুব শীঘ্রই আসানসোল এবং শিলিগুড়িতে স্টেট কমিশনের দু'টি সার্কিট বেঞ্চ চালু হতে যাচ্ছে। এছাড়া তিনটি অতিরিক্ত জেলা ফোরাম-সহ প্রতিটি জেলায় একটি করে মোট তেইশটি জেলা ফোরাম রয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ফোরামের মধ্যে দু'টি রয়েছে কলকাতায় এবং একটি শিলিগুড়িতে। আলিপুরদুয়ার এবং কলকাতা (দক্ষিণ)-এ সদ্য গঠিত জেলা ফোরাম দু'টিতেও কাজ শুরু হয়েছে।

এরাজ্যে কনফোনেট (কম্পিউটারাইজেশন নেটওয়ার্কিং অব কনজ্যুমার ফোরাম ইন দ্য কান্ট্রি) প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলে শুধু এরাজ্যের নয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যের কনজ্যুমার ফোরাম, স্টেট কমিশন এবং ন্যাশনাল কমিশনের সঙ্গে কম্পিউটার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে যেকোনও ফোরামের দৈনিক কজ লিস্ট এবং মামলার রায় দেখা যাবে। রাজ্যে ই-গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে এটি একটি মাইল ফলক।

উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর সমাজের দুর্বল এবং বিপন্ন শ্রেণির উপভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে উপভোক্তা সুরক্ষা আইনের আওতায় প্রতিটি জেলা ফোরাম এবং স্টেট কমিশন থেকে আইনি সহযোগিতা বা লিগ্যাল এইড দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। উপযুক্ত আবেদনকারীর আবেদনের ভিত্তিতে সরকারের প্যানেলভুক্ত অ্যাডভোকেটকে ওই আবেদনকারীর হয়ে মামলা লড়বার জন্যে নিয়োগ করা হয়।

- ভালো মানের কাগজে (সম্ভব হলে ডেমি পেপারে) অভিযোগকারী এবং বিরুদ্ধপক্ষের নাম, ঠিকানা (থানা ও পিনকোড-সহ), উভয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সংশ্লিষ্ট কনজ্যুমার ফোরামের এক্তিয়ারের যৌক্তিকতা, বিবাদাধীন পণ্য বা পরিষেবার পূর্ণ বিবরণ, পণ্যের ত্রুটি বা পরিষেবার ঘাটতির যুক্তিযুক্ত বিবরণ এবং অভিযোগকারীর প্রার্থিত প্রতিকারের বিবরণ লিখতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রার্থিত প্রতিকারের দাবি উপভোক্তা সুরক্ষা আইনের ১৪ নম্বর ধারা মোতাবেক হতে হবে।
- যতজন বিরোধী পক্ষ, তার সমসংখ্যক কপির সঙ্গে অতিরিক্ত তিন কপি অভিযোগপত্র জমা দিতে হবে।
- অভিযোগপত্রটি জমা দেওয়ার আগে ম্যাজিস্ট্রেট বা নোটারির কাছে এফিডেভিট করিয়ে নিতে হবে।
- অভিযোগপত্রের সঙ্গে কনজ্যুমার প্রোটেকশান রুলস, ১৯৮৭-এর ৯নং ধারা মোতাবেক দাবির পরিমাণ অনুযায়ী ফি জমা দিতে হবে। জেলা ফোরামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফোরামের প্রেসিডেন্টের নামে এবং স্টেট কমিশন বা ন্যাশনাল কমিশনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের নামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ডিম্যান্ড ড্রাফট বা ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারে জমা দেওয়া যাবে।

লেখচিত্র-৪

রাজ্যের জেলা ফোরামগুলিতে দায়ের ও নিষ্পত্তি হওয়া মোট মামলার পরিসংখ্যান

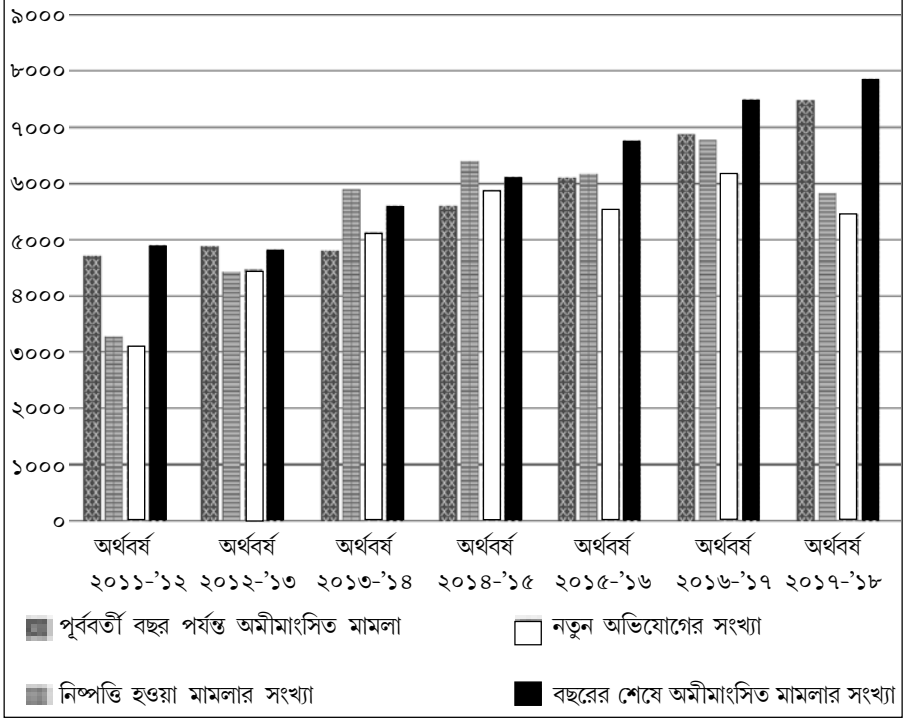

এবার আসা যাক কোন ফোরামে অভিযোগ করা যাবে সে প্রসঙ্গে।

- সকল বিরোধীপক্ষীয়দের ঠিকানা যে ফোরামের এক্তিয়ারে অবস্থিত।
- বিভিন্ন এক্তিয়ারের একাধিক বিরোধী পক্ষ থাকলে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে বিরোধীপক্ষীয়দের যেকোনও একজনের ঠিকানা যে ফোরামের এক্তিয়ারে অবস্থিত।
- যে ফোরামের এক্তিয়ারে উপভোক্তার অসন্তুষ্টির কারণ ঘটেছে।

এছাড়া দাবির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ত্রিস্তরীয় ক্রেতা আদালতের কোন স্তরে অভিযোগ দায়ের করা যাবে, সারণি-২-এ তা পেশ করা হল।

একনজরে বিগত বছরগুলিতে জেলা ফোরাম এবং স্টেট কমিশনে দায়ের এবং নিষ্পত্তি হওয়া মামলার পরিসংখ্যান দেখে নেওয়া যেতে পারে যথাক্রমে ৪ নং ও ৫ নং লেখচিত্রে।

(গ) লিগ্যাল মেট্রোলজি : উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের অধীনে এই ডাইরেক্টরেটটি ক্রেতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডাইরেক্টরেটটির পূর্বতন নাম ছিল কন্ট্রোলারেট অব ওয়েটস অ্যান্ড

মেজারস। নাম থেকেই পরিষ্কার যে দপ্তরের এই শাখা সংগঠনটি মূলত রাজ্যের বিক্রেতাদের ওজন ও পরিমাণ যন্ত্রগুলির মানকীকরণ করে, যাতে উপভোক্তারা কেনাকাটায় ওজন ও পরিমাপে ঠকে না যান। এর পাশাপাশি লিগ্যাল মেট্রোলজি ডাইরেক্টরেট মোড়কবদ্ধ পণ্যসামগ্রীতে (প্যাকেজড কমোডিটিজ) মোড়কের উপর যে বাধ্যতামূলক ঘোষণাগুলি (স্ট্যাচুটরি ডিক্লেরাশানস) থাকে, সেগুলি নিয়মানুগ কি না, তারও নজরদারি করে।

ডাইরেক্টরেট এই কাজগুলি মূলত লিগ্যাল মেট্রোলজি অ্যাক্ট, ২০০৯ এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি (প্যাকেজড কমোডিটিজ) রুলস, ২০১১ অনুযায়ী করে থাকে। ৪৫, গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩-তে এই ডাইরেক্টরেটের মুখ্য কার্যালয়। দূরভাষ নম্বর : (০৩৩) ২২২৫-৬৪৪৭/ ২২৩৭-৮১৫৭/ ২২৩৬-০১৮৬। ডাইরেক্টরেটের প্রধান হলেন অধিকর্তা, তার অধীনে একজন যুগ্ম অধিকর্তা এবং একাধিক উপ-নিয়ামক রয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় একজন করে সহ-নিয়ামক এবং তার অধীনে মহকুমা স্তর পর্যন্ত যেসব ইন্সপেক্টরিয়াল ইউনিট রয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে একজন করে পরিদর্শক রয়েছেন। এছাড়া, জেলাতে সহ-নিয়ামকের অধীনে এক বা একাধিক পরিদর্শক রয়েছেন, যারা মূলত এনফোর্সমেন্ট বা আচমকা পরিদর্শনের কাজ করেন।

কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে একজন উপ-নিয়ামকের তত্ত্বাবধানে এই ডাইরেক্টরেটের একটি অত্যন্ত আধুনিক মানের ল্যাবরেটরি রয়েছে। এই ল্যাবরেটরিতে ব্যবসায়ীদের ওজন ও পরিমাপ যন্ত্র মানকীকরণের কাজে ব্যবহৃত 'ওয়ার্কিং স্ট্যান্ডার্ড মডেল'-এর ক্যালিব্রেশান করা হয়।

আসা যাক লিগ্যাল মেট্রোলজি ডাইরেক্টরেটের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে।

- ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যিক লেনদেনের কাজে যেসব ওজন ও পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহার করেন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেগুলির নবীকরণ।
- নতুন তৈরি ওজন ও পরিমাপ যন্ত্রগুলি বাজারে আসবার আগে মানকীকরণ।
- ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত বিধিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা।

লেখচিত্র-৫

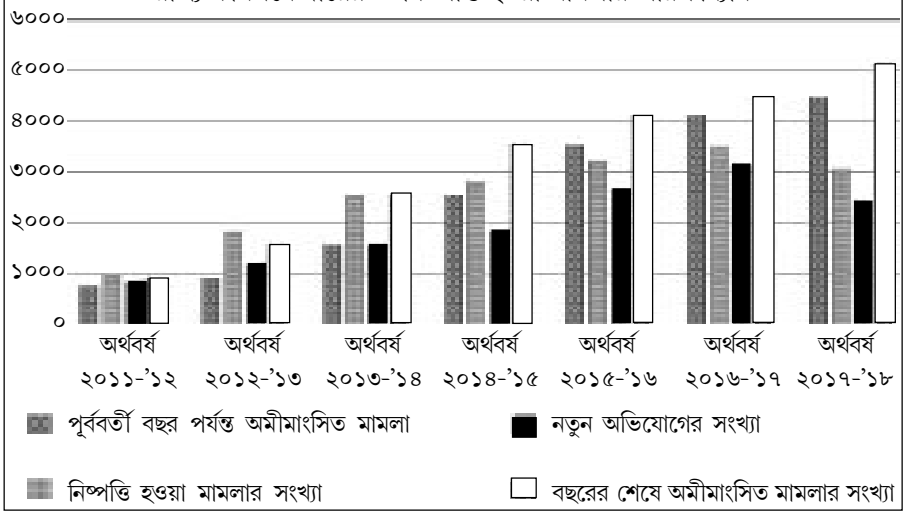

- ম্যানুফ্যাকচারার, প্যাকার, ইম্পোর্টার এবং রিপেয়ারারদের লাইসেন্স দেওয়া এবং তাদের কাজকর্মের উপর নজরদারি।
- সমস্ত মোড়কবদ্ধ জিনিস 'লিগ্যাল মেট্রোলজি (প্যাকেজড কমোডিটিজ) রুলস, ২০১১' অনুযায়ী বাজারে বিক্রি হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে নজরদারি চালানো। বিশেষত, মোড়ক করা জিনিস এমআরপি বা সর্বাধিক খুচরো দামের চাইতে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে কি না, তা দেখা। এক্ষেত্রে আইনভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কড়া সাজার সংস্থান রয়েছে।

এই ডাইরেক্টরেটটিকে আধুনিকীকরণের জন্যে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

- সুসজ্জিত আধুনিক গাড়িতে ভ্রাম্যমান 'ওয়ার্কিং স্ট্যান্ডার্ড মডেল'।
- ফ্লো মিটারের মাধ্যমে এলপিজি বা লিকুইডিফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস ডিস্পেন্সারের ক্যালিব্রেশানের ব্যবস্থা। যানবাহনে এলপিজি বা লিকুইডিফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে বলেই দপ্তরের এই পদক্ষেপ। ভারতের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে।
- ই-পরিমাপ (E-parimap) সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে এখন লিগ্যাল মেট্রোলজির বিভিন্ন লাইসেন্সের জন্যে অনলাইনে আবেদন করা যায়। আবেদন করা থেকে ফি জমা দেওয়া, এমনকী লাইসেন্স-প্রাপ্তি, সব কিছুই এখন অনলাইনে করা যাচ্ছে। ভারতবর্ষে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষেবা প্রদান। 'পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা আইন, ২০১৩' অনুযায়ী কয়েকটি পরিষেবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদানের জন্যে নোটিফিকেশন জারি করেছে এই ডাইরেক্টরেট।

উপসংহার

এই আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গে উপভোক্তা সুরক্ষার একটা চালচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা হল মাত্র। এই রাজ্য উপভোক্তা সুরক্ষার স্বার্থে মধ্যস্থতায় উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি, অ-সরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পরিচালিত উপভোক্তা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যালয় পাঠক্রমে উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ক পাঠ্যের অন্তর্ভুক্তি এবং টোল-ফ্রি হেল্প-লাইন পরিষেবার মতো অনেকগুলি অভিনব কর্মসূচি এবং প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা আজ সমগ্র ভারতবর্ষে রোল-মডেল হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

পরিশেষে যে কথাটি না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, সেটা হল, উপভোক্তার সুরক্ষা কিন্তু উপভোক্তার ব্যক্তিগত সচেতনতা এবং অধিকার প্রয়োগের জন্য মানসিক দৃঢ়তার উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন এবং পরিকাঠামো রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও অধিকার প্রয়োগ এবং ঠকে গেলে প্রতিকার দাবি করবার জন্যে উপভোক্তাকেই এগিয়ে আসতে হবে।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় গ্রাহকের অধিকার

দিবাকর লেঙ্কা

ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের মৌলিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। গ্রাহকের অধিকার এবং ব্যাঙ্কের দায়িত্বের বিষয়েও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জারি করে বিস্তারিত বিধিনিয়ম। যে কোনও পরিষেবা শিল্পে গ্রাহকই রাজা,তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ফলপ্রসূ গ্রাহক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র। গ্রাহক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগ তাই ব্যাঙ্ক ও তার কর্মী এবং পণ্য ও পরিষেবায় ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করে। গ্রাহকদের আস্থা অর্জন হচ্ছে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনার মন্ত্র।

ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের মৌলিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। গ্রাহকের অধিকার এবং ব্যাঙ্কের দায়িত্বের বিষয়েও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জারি করে বিস্তারিত বিধিনিয়ম। ব্যাঙ্কের যাবতীয় পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে এসব নিয়ম প্রযোজ্য। গ্রাহকের যদি মনে হয়, ব্যাঙ্ক কোনও একটি অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে লগ্নি করে তার প্রতি অন্যায় করছে, তবে তার প্রতিকার পাওয়ার অধিকার আছে। ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের জন্য ৫-টি মৌলিক অধিকার নির্দিষ্ট করে শীর্ষ ব্যাঙ্ক বানিয়েছে গ্রাহক অধিকারের এক সনদ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সনদের নীতির ভিত্তিতে 'মডেল গ্রাহক অধিকার নীতি' তৈরির জন্য পরামর্শও দিয়েছে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন (IBA) এবং ব্যাঙ্কিং কোডস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড অব ইন্ডিয়াকে (BCSBI)। এসব পদক্ষেপের সুবাদে গ্রাহক পরিষেবা কাঠামো হয়ে উঠবে মজবুত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশিত কোনও অধিকার ব্যাঙ্ক লঙ্ঘন করলে, গ্রাহক অভিযোগ জানাতে পারে শীর্ষ ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা বিভাগে। অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য গ্রাহকের সামনে খোলা আছে বিভিন্ন মঞ্চ বা উপায়। সে যেতে পারে ব্যাঙ্কের নিজস্ব নিয়ামক কার্যালয় থেকে শুরু করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে লোকপাল অবধি।

গ্রাহকের অধিকার

■ **ন্যায্য ব্যবহার মেলার অধিকার :** গ্রাহক ও আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী দু'য়েরই অধিকার আছে শিষ্ট আচরণ পাওয়ার। লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, জাতপাত ও শারীরিক সক্ষমতা বিচার করে কোনও গ্রাহকের বিরুদ্ধে বৈষম্য করার অধিকার ব্যাঙ্কের নেই। ব্যাঙ্ক অবশ্য গ্রাহককে দেওয়া ঋণে সুদের হারে ফারাক রাখতে পারে। বিপণনের ক্ষেত্রে উদ্দীষ্ট গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীর থাকতে পারে বিশেষ কিছু পণ্যও। এছাড়া, গ্রাহকদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য বাণিজ্যিক দিক থেকে স্বীকৃত অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার আশ্রয় নেওয়ার অধিকারও আছে তাদের। সেই সঙ্গে, থাকতে পারে মহিলা বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উপকারের জন্য প্রকল্প বা পণ্য। অন্যায় বৈষম্যের সঙ্গে এগুলি গুলিয়ে ফেলা চলবে না। দরকার হলে, এহেন সব বিশেষ প্রকল্প বা শর্তাদির পিছনে থাকা যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা দেবে ব্যাঙ্ক।

উপরের ওই অধিকার অনুসারে, ব্যাঙ্ক :

- গ্রাহকের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ও সমতাভিত্তিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটাবে।
- গ্রাহক সেবায় কর্মীদের তৎপরতা ও শিষ্টাচার সুনিশ্চিত করবে।
- কোনও ভেদাভেদ না করে সব গ্রাহককে দেখবে সমান চোখে।
- গ্রাহককে দেয় পণ্য ও পরিষেবা আইনকানুন সম্মত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

■ **স্বচ্ছতা, ন্যায়সঙ্গত ও সৎ ব্যবহারের অধিকার :** ব্যাঙ্কের কাগজপত্তরের লেখাজোখা

[লেখক ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ভুবনেশ্বর স্থিত 'স্টাফ টেনিং সেন্টার'-এর প্রধান।। ই-মেল : dibakarlenka1960@gmail.com]

সহজসরল ও ধোঁয়াশামুক্ত হওয়া দরকার। আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীর যথাসম্ভব চেষ্টা চালানো উচিত, যাতে করে তৈরি চুক্তি বা সম্মতিপত্র সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে। পণ্যের দাম, তার ঝুঁকি, পণ্যের ব্যবহার সম্পর্কিত শর্তাবলি এবং গ্রাহক ও আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীর দায়দায়িত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা উচিত। গ্রাহককে কোনও অন্যায্য ব্যবসা বা বিপণন প্রথা, জবরদস্তিমূলক চুক্তির শর্ত বা বিভ্রান্তিকর বর্ণনার মুখে ফেলা চলবে না। আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী তার গ্রাহককে শারীরিক ক্ষতি করা, অন্যায় চাপ দেওয়া বা হয়রানিতে ফেলার হুমকি দিতে পারে না। এই অধিকার অনুযায়ী, ব্যাঙ্ক :

● ন্যায়, সততা ও স্বচ্ছতার নীতির ভিত্তিতে গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্কে স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

● সহজসরল ভাষায় গ্রাহককে তার পণ্য ও পরিষেবা, শর্তাবলি, সুদের হার, খরচপাতির বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য দেবে।

● পণ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি এবং সেই সঙ্গে গ্রাহকের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে, এমন বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে।

● সংশোধিত শর্তাবলি কার্যকর হওয়ার নিদেন পক্ষে এক মাস আগে চিঠি, এসএমএস বা ই-মেল মারফৎ শর্ত পরিবর্তনের কথা গ্রাহকের গোচরে আনবে।

● তার ওয়েবসাইটে মাশুল তালিকা তুলে ধরবে এবং প্রতিটি শাখায় গ্রাহকদের অবগতির জন্য রাখবে তার কপি।

● পণ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত কোনও শর্ত ভাঙ্গলে তার দরুন অর্থদণ্ডের তথ্যও জানাবে।

● আমানত, চেক সংগ্রহ, ক্ষোভ-অভিযোগ ফয়সালা, ক্ষতিপূরণ, বকেয়া আদায় এবং জামিন পুনর্দখল সম্পর্কিত ব্যাঙ্কের নীতি সাধারণের সামনে তুলে ধরবে।

● কোনও পণ্য তুলে নেওয়া, কার্যালয়ের ঠিকানা পালটানো, টেলিফোন নম্বর পরিবর্তন এবং অফিস বা শাখা গোটানোর কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবে।

● যুক্তিসঙ্গত বা চুক্তিমাফিক আগাম নোটিশ ছাড়া গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে না।

● গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট ঠিকমতো চালাতে সম্ভাব্য সবভাবে গ্রাহককে সহায়তা করবে।

● গ্রাহককে শারীরিক ক্ষতি বা কোনও ধরনের অবাঞ্ছনীয় হয়রানির হুমকি দেবে না।

■ **যথোপযুক্ততার অধিকার** : বেশি কমিশনের লোভে, কিছু ক্ষেত্রে বিক্রয় আধিকারিকরা গ্রাহকের পক্ষে তা কাজের হবে কিনা ঠিক না করেই পণ্য গছানোর ধান্দায় থাকে। উদাহরণ, নির্দিষ্ট রিটার্ন প্রত্যাশী প্রবীণ নাগরিকের কাছে বাজারে ওঠাপড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত (মার্কেট-লিঙ্কড) বিমা। এই সনদ বলবৎ হওয়ায়, এ ধরনের আধিকারিকদের ফন্দিফিকির চালানো কঠিন হবে। এই সনদ মোতাবেক, গ্রাহকের প্রয়োজনের সঙ্গে তালমিল রেখে এবং তার আর্থিক ক্ষমতার মূল্যায়ন ও সবকিছু তার গোচরে আনার উপর ভিত্তি করে তাকে কোনও পণ্য বিক্রি করার প্রস্তাব দেওয়া উচিত। এই অধিকার অনুযায়ী, ব্যাঙ্ক :

● বিক্রির আগে নিশ্চিত করবে যে গ্রাহকের জন্য পণ্যটির যথোপযুক্ততা নির্ণয়ে এটা বোর্ড অনুমোদিত পলিসি।

● নিশ্চিত হতে চেষ্টা করবে যে পণ্য ও পরিষেবাটি গ্রাহকের প্রয়োজন আছে ও তার আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে মানানসই।

● অনুমতি পেয়ে থাকলে তবেই তৃতীয় পক্ষের পণ্য বিক্রি করবে।

● তৃতীয় পক্ষের পণ্য কিনতে গ্রাহককে বাধ্য করবে না।

● গ্রাহকের জন্য পণ্যটির উপযুক্ততা নির্ণয়ে ব্যাঙ্ককে সক্ষম করার জন্য ব্যাঙ্কের চাওয়া প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি দ্রুত ও অকপটভাবে জোগাতে গ্রাহকের দায়িত্ব জানিয়ে দেবে।

■ **গোপনীয়তার অধিকার** : গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা উচিত। তবে এর ব্যতিক্রম হয়, যদি গ্রাহক আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীকে নির্দিষ্টভাবে তার সম্মতি জানায় বা আইন অনুসারে যেধরনের তথ্য দেওয়া দরকার বা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের জন্য যদি তা দেওয়া হয় (যেমন ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানিকে)। এই বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রাহককে আগেভাগে খবর দেওয়া উচিত। তার গোপনীয়তা লঙ্ঘনকারী বৈদ্যুতিন বা অন্য ধরনের যে কোনও তথ্য আদানপ্রদান থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে গ্রাহকের।

● ব্যাঙ্ক গ্রাহকের নিজস্ব তথ্যকে ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বলে বিবেচনা করবে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে গ্রাহক আর কাজকর্ম না চালালেও, এসব তথ্য প্রকাশ করা ব্যাঙ্কের উচিত নয়। তবে গ্রাহক লিখিতভাবে ব্যাঙ্ককে অনুমতি দিলে, বিধিনিয়ম অনুসারে তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক হলে, জনস্বার্থে, ব্যাঙ্কের নিজ স্বার্থ রক্ষা করতে অবশ্য ব্যাঙ্ক তা প্রকাশ করতে পারে।

■ **অভিযোগ ফয়সালা ও ক্ষতিপূরণের অধিকার** : পণ্যে ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীকে দায়বদ্ধ করা এবং

তার বিরুদ্ধে নালিশের মীমাংসা পাওয়ার সহজ উপায়ের নাগাল পাওয়ার অধিকার আছে গ্রাহকের। তৃতীয় পক্ষের পণ্য বেচলেও অভিযোগ মেটানোয় প্রদানকারীর সহায়তা করা উচিত। ভুলচুক, কাজকর্মে দেরি বাবদ ক্ষতিপূরণের নীতি অবশ্যই গ্রাহককে জানাতে হবে। এই নীতি, এসব ঘটনায় গ্রাহকের অধিকার ও কর্তব্য বিস্তারিত তুলে ধরবে। পণ্য বিক্রি হলে, ব্যাঙ্ক তার দায়িত্ব আর ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। এই অধিকার হেতু, ব্যাঙ্ক অবশ্যই :

- ঠিকঠাক না হওয়া সব ব্যাপার দ্রুততা ও সহানুভূতির সঙ্গে খতিয়ে দেখবে।
- ভুল জলদি সংশোধন করবে।
- ভুলবশত নেওয়া মাশুল প্রত্যাহার করে নেবে।
- ব্যাঙ্কের নিজের দোষের জন্য গ্রাহকের প্রত্যক্ষ আর্থিক লোকসান হলে ক্ষতিপূরণ দেবে।

এছাড়া, ব্যাঙ্ক :

- ভুলত্রুটির জন্য গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধিনিয়ম এবং গ্রাহকের জন্য নালিশ মেটানোর পদ্ধতি সবার গোচরে আনার ব্যবস্থা করবে।
- অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সহজে গ্রাহকের নাগালে আনার বন্দোবস্ত করবে।
- গ্রাহককে পরামর্শ দেবে, কীভাবে অভিযোগ করবে, কার কাছে করবে এবং কবে নাগাদ মিলবে অভিযোগের উত্তর।
- অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষের নাম, ঠিকানা ও তার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করবে ও জানিয়ে দেবে কতদিনের মধ্যে অভিযোগের ফয়সালা হবে।
- পূর্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি না হলে, আরও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কিং লোকপালের কাছে অভিযোগ পেশ করার সুযোগ সম্পর্কে অভিযোগকারীকে ওয়াকিবহাল করবে ।
- বৈদ্যুতিন উপায়ে জমা পড়া-সহ তিনটি কাজের দিনের মধ্যে যাবতীয় অভিযোগ প্রাপ্তির স্বীকৃতি দেবে এবং যুক্তিসঙ্গত সময় সীমার (৩০ দিনের বেশি নয়) মধ্যে তা সমাধানের কাজ করবে। গ্রাহকের কাছ থেকে চাওয়া সব প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার পর এই ৩০ দিন ধরা হবে।

সারণি-১
ব্যাঙ্কিং লোকপাল-এর কার্যালয় গ্রাহক অভিযোগের চিত্র

বিষয়	২০১৩-'১৪	২০১৪-'১৫	২০১৫-'১৬
গত বছরের বকেয়া অভিযোগ	৫,৪৭৯	৩,৩০৭	৩,৭৭৮
অভিযোগ প্রাপ্তি	৭৬,৫৭৩	৮৫,১৩১	১,০২,৮৯৪
মোট	৮২,০২৫	৮৮,৪৩৮	১,০৬,৬৭২
অভিযোগ নিষ্পত্তি	৭৮,৭৪৫	৮৪,৬৬০	১,০১,১৪৮
বছর শেষে ঝুলে থাকা অভিযোগ	৩,৩০৭ (৪ শতাংশ)	৩,৭৭৮ (৪ শতাংশ)	৫,৫২৪ (৫ শতাংশ)

উৎস : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র সাইট

ব্যাঙ্কের অভিযোগ মীমাংসা প্রক্রিয়া

গ্রাহক অভিযোগ হচ্ছে যে কোনও কর্পোরেট সংস্থার ব্যবসায়িক জীবনের অঙ্গ। ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি খাটে, কেননা ব্যাঙ্ক হল পরিষেবা সংস্থা। পরিষেবা সংস্থার পক্ষে, গ্রাহক পরিষেবা ও গ্রাহক সন্তুষ্টি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাঙ্ক মনে করে, শুধু নতুন গ্রাহক টানা নয়, পুরোনোদের ধরে রাখতেও দ্রুত ও দক্ষ পরিষেবা দেওয়া দরকার।

■ **অভিযোগ বলেত কি বোঝায় ?**

এটা হল, গ্রাহকের প্রত্যাশা ও পণ্য এবং পরিষেবা থেকে পাওয়া প্রকৃত মূল্যের ফারাক। সাধারণভাবে, অভিযোগ হচ্ছে অসন্তোষের প্রকাশ।

■ **অভিযোগ এক সুযোগ :**

মুখ ফুটে না বলা অসন্তোষ যে কোনও ব্যবসার পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর। অভিযোগ জানালে পরিস্থিতি শুধরে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয় এবং গ্রাহকের শুভেচ্ছা ফিরে পাওয়া যায়।

■ **অভিযোগের ক্ষেত্রে করণীয় :**

- গ্রাহকের সমস্যাদি মন দিয়ে শোনা।
- গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি সনাক্ত করা।
- সহানুভূতি জাগানো।
- সমানুভূতি পোষণ।
- গ্রাহককে ধন্যবাদ দেওয়া।
- কী করা যেতে পারে তার ব্যাখ্যা।
- সে ব্যাপারে দ্রুত কাজে নেমে পড়া।

■ **অভিযোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া :**

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া থেকে সুবিধা লাভ করার জন্য, চারটি প্রধান দিক অবশ্যই খেয়াল করা দরকার।

(ক) **গ্রাহক অভিযোগের শ্রেণিভাগ করা :**

- ব্যক্তিগত অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার সময়, অভিযোগের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করা প্রয়োজন;
- নিয়ামক আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ;
- ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত অভিযোগ;
- গ্রাহক পরিষেবা সম্পর্কিত অভিযোগ।

(খ) **ঝোঁক বা প্রবণতা বিশ্লেষণ করা :** অভিযোগের শ্রেণিভাগ সারার পালা চুকলে, সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা এবং নিয়মিতভাবে তা রিপোর্ট করা উচিত। বিশ্লেষণের লক্ষ্য হল, প্রত্যক্ষ গ্রাহক পরিষেবায় যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা সনাক্ত করা। অভ্যন্তরীণ লোকপাল মারফৎ ছ' মাস অন্তর তা পরিচালক পর্ষদে জানাতে হবে। এর ফলে, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজকর্ম হর্তাকর্তাদের নজরে পৌঁছবে এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যাবে।

(গ) **ব্যবস্থা নেওয়া :** ইস্যুগুলি চিহ্নিত করা হলে, গ্রাহক পরিষেবার উন্নতি করতে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। এর মধ্যে পড়ে গ্রাহক পরিষেবা মানের হালনাগাদ, যোগাযোগের উন্নতি, পণ্য ও পরিষেবা বিষয়ে কর্মীদের জন্য আরও প্রশিক্ষণ। পরিবর্তনের কাজে হাত পড়ার পর তার কার্যকারিতার উপর নজরদারি।

(ঘ) **অভিযোগ প্রক্রিয়ার উন্নতি :** অভিযোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকলেও, তা কতটা কাজের সেটা জানা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়া ব্যবহারকারী গ্রাহকদের কাছে মূল প্রশ্নগুলি তুলে ধরতে

হবে। শুধুমাত্র ব্যবসা ধরে রাখতে সাহায্য করা নয়, এটা বর্তমান বা সম্ভাব্য গ্রাহকদের মুখ থেকে ব্যাঙ্কটি সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছড়িয়ে পড়াজনিত ক্ষতিও কমাবে।

ক্ষোভ, অভিযোগ নিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া খবর বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের উদ্বেগ ও প্রত্যাশার বিষয়ে ব্যাঙ্ক কী পদক্ষেপ করছে তার উপর নির্ভর করে গ্রাহক ধরে রাখা এবং নতুন গ্রাহক টানার বিষয়টি। গ্রাহকের কথা মন দিয়ে শুনতে হবে এবং দেখা দরকার অভিযোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কাঠামো কতটা কাজের হচ্ছে।

(ঙ) **গ্রাহক অভিযোগের সংখ্যা :** ব্যাঙ্কিং লোকপাল প্রকল্পে ১৯৯৯/২০০০-এ জমা পড়েছিল ৪,৯৯৪-টি অভিযোগ। ২০১৫-'১৬-তে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,০২,৮৯৪। ২০১৪-'১৫-এর তুলনায় অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা বেড়েছে ২১ শতাংশ। এই প্রকল্পের সূচনা ইস্তক, এটাই সবচেয়ে বেশি। ব্যাঙ্কিং লোকপালের কার্যালয় ২০১৬-র ৩০ জুন অবধি ১,০১,১৪৮-টি (৯৫ শতাংশ) অভিযোগের ফয়সালা করতে পেরেছে (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)।

বৈদ্যুতিন ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বিরুদ্ধে অভিযোগ লোকপাল প্রকল্পের আওতায়

বৈদ্যুতিন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সম্পর্কিত রীতিনীতি লঙ্ঘনের জন্য ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে গ্রাহককে লোকপাল প্রকল্পের আওতায় অভিযোগ পেশের অনুমতি দিয়েছে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এর মধ্যে পড়ে, মোবাইল ফোন মারফৎ দেওয়া পরিষেবাও। উল্লেখ্য, লোকপাল প্রকল্প হল নিখরচায় অভিযোগ মীমাংসার ব্যবস্থা। বিমা ও মিউচুয়্যাল ফান্ডের মতো তৃতীয় পক্ষের পণ্য ব্যাঙ্ক বিক্রি করলে, তার ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমার অনুমতিও দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। লোকপাল এখন ২০ লক্ষ টাকা অবধি ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিতে পারে। আগে এর পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ। এছাড়া, সময় নষ্ট, খরচখরচা এবং কেস চলাকালীন ভোগান্তি বাবদ গ্রাহকের মিলতে পারে আরও ১ লক্ষ পর্যন্ত টাকা।

ব্যাঙ্কে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

গ্রাহকের প্রতি ব্যাঙ্কের অঙ্গীকারের বিধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ব্যাঙ্ক অভিযোগ নিষ্পত্তির নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতির ভিত্তি হল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন উদ্ভাবিত মডেল নীতি ও ব্যাঙ্কিং কোডস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড অব ইন্ডিয়ার পরামর্শ।

■ **অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রধান দিকগুলি :**

১। গ্রাহক অভিযোগ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা।

(ক) বোর্ডের গ্রাহক পরিষেবা কমিটি।

(খ) গ্রাহক পরিষেবা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।

(গ) অভিযোগ খতিয়ে দেখতে নোডাল ও অন্যান্য নির্দিষ্ট আধিকারিক।

(ঘ) নিজস্ব লোকপাল।

২। অভিযোগ ফয়সালা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে কাস্টমার কেয়ার ইউনিট।

৩। জনসমক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে তুলে ধরার বিষয়াদি।

৪। ক্ষোভ-অভিযোগ আরও ঊর্ধ্বতনের কাছে জানানোর উপায়।

৫। অভিযোগ সমাধানের সময়সীমা।

৬। গ্রাহকের সঙ্গে কথাবার্তা।

৭। অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য নিযুক্ত কর্মীদের সংবেদনশীল করে তোলা।

■ **গ্রাহক অভিযোগ হেতু :**

● গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি।

● গ্রাহকদের জন্য বন্দোবস্তে ঘাটতি।

● প্রত্যাশিত পরিষেবা ও প্রকৃত পরিষেবা মেলার মধ্যে ফারাক।

ব্যাঙ্কের পরিষেবায় সন্তুষ্ট না হলে, অভিযোগ পেশের অধিকার আছে গ্রাহকের। অভিযোগ করা যায় ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে গ্রিভান্স অনলাইন লিঙ্ক, কল সেন্টার, ই-মেল, টেলিফোন এবং ব্যাঙ্কের অন্যান্য চ্যানেল মারফৎ। এছাড়া, লিখিত এবং মৌখিক অভিযোগের সুযোগ তো আছেই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগের ফয়সালা না হলে বা মীমাংসা সূত্রে সন্তুষ্ট না হলে গ্রাহক যেতে পারেন ব্যাঙ্কিং লোকপালের কাছে। নালিশ জানাতে অন্যান্য আইনি পথও তার কাছে খোলা।

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় অভিযোগ সমাধান

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতাধীন অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে অভিযোগ করা যায় :

(ক) অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যাঙ্ক অস্বীকার করলে।

(খ) রুপে কার্ড না মিললে।

(গ) এটিএম-এ রুপে কার্ড অ্যাকটিভেশন না হলে।

(ঘ) দুর্ঘটনা বিমার দাবি নিষ্পত্তির জন্য।

এই যোজনার আওতাধীন অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত অভিযোগ জলদি মীমাংসার জন্য ব্যাঙ্ককে এক স্বতন্ত্র অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অ্যাকাউন্টের অস্তিত্ব না থাকা, অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা ইত্যাদি যে কোনও কারণে টাকা উপকৃতের নামে জমা করতে না পারলে, সেদিনই যে ব্যাঙ্ক টাকা পাঠিয়েছে তার কাছে ফেরৎ দিতে হবে। পেমেন্ট মেসেজে অ্যাকাউন্ট নম্বর বসানোয় ব্যাঙ্ক কর্মীর কোনও ভুলচুক হলে, শাখার নোটিশে এনে তা ফেরৎ দিতে হবে অবিলম্বে। গ্রাহকের শাখায় এধরনের সব ক্ষেত্রে ক্ষোভ অভিযোগ সমাধানের দায়িত্ব শাখা ব্যবস্থাপকের। আরটিজিএস/এনইএফটি সেলের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে সব অভিযোগ মীমাংসার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন তিনি।

শেষপাত

যে কোনও পরিষেবা শিল্পে গ্রাহকই রাজা,তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ফলপ্রসূ গ্রাহক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র। গ্রাহক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগ তাই ব্যাঙ্ক ও তার কর্মী এবং পণ্য ও পরিষেবায় ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করে। গ্রাহকদের আস্থা অর্জন হচ্ছে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনার মন্ত্র।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

গ্রামের ক্রেতাকে সচেতন করতে

রাহুল সিং

গ্রামীণ ক্রেতাদের কেনাকাটার ধরনে বিবর্তন ঘটছে। শহরের ক্রেতাদের থেকে এসবের ফারাক আছে বেশ। তাদের বস্তুগত ও মানসিক কল্যাণ বৃদ্ধির উপযোগী পণ্য ও পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন করতে চাই গ্রামীণ ক্রেতার বিশেষ চাহিদা মেটানোর জন্য উন্নত পণ্য ও পরিষেবা এবং মবিলিটি প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনা। তারা যে পণ্য কেনে ও যে পরিষেবা তাদের মেলে, সে বিষয়ে তাদের ন্যায্য প্রত্যাশা পূরণের উপর নির্ভর করে ক্রেতার মঙ্গলামঙ্গল। ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা আইন আছে ঠিকই, কিন্তু ক্রেতারা সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়। গ্রামীণ ক্রেতাদের সুরক্ষার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফল খুব একটা ইতরবিশেষ হয়নি।

ভারতের গাঁয়েগঞ্জে ক্রেতাদের কেনাকাটায় রুচি, ধরন বদলাচ্ছে তরতরিয়ে। এই পরিবর্তনে ইন্ধন জোগাচ্ছে একযোগে অর্থনীতি, মনস্তত্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যার মতো বেশ কিছু কারণ। আয় বেড়ে চলায় জীবনের মানোন্নয়নকারী পণ্য ও পরিষেবা খরিদ করতে পারছে গ্রামের উপভোক্তারা। অর্থ বছর ১০ এবং ১২-র মধ্যে গ্রামাঞ্চলে উপভোক্তাদের মাসে মাথাপিছু খরচ বেড়েছে ১৭ শতাংশ। শহরের ক্রেতাদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ১২ শতাংশ। গ্রামে খরচাপাতি করার মতো আয় বাড়ায়, আশা-আকাঙ্ক্ষা ঊর্ধ্বগামী। আখেরে সওদা করা বেড়েছে। ২০০৫-এ খাদ্য ছাড়া অন্যান্য সামগ্রীর দরুন তারা খরচ করত মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশ। ২০১২-তে তা দাঁড়ায় ৫০ শতাংশের বেশি। বেড়েছে গ্রামের ক্রেতাদের সচেতনতা। সেখানে গণমাধ্যমের উপস্থিতিও উত্তরোত্তর বেড়ে চলায় পল্লী ভারতের মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়েছে তার ছায়া। এসব অর্থনৈতিক ধারা, আর্থ-সামাজিক রদবদল ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে হালফিলের অগ্রগতির দরুন গ্রামে ভোক্তারা কী কিনবে এবং কোথা থেকে কিনবে, সেসব ব্যাপারে এসেছে বড়ো রকম পরিবর্তন।

গ্রামে থাকে ভারতের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ। বহুকাল যাবৎ দেশে মোট ভোগের অর্ধেকের বেশি হয় সেখানে। শহরায়ন এবং পরিযানের (মাইগ্রেশন) বাড়বাড়ন্ত সত্ত্বেও, ২০২৫-এ ভারতের ৬৩ শতাংশ লোক বাস করবে গ্রামাঞ্চলে। উৎপাদনে পল্লী ভারতের অংশভাক প্রায় আধাআধি (৪৮ শতাংশ)। ২০২০ সালে গ্রামের বাজার দাঁড়াবে ৫০ হাজার কোটি ডলার। ভারতের অর্থনীতিতে গ্রামাঞ্চল তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়েই বহাল থাকবে।

বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ ভারতের অর্থনীতিকে এক প্রাণবন্ত বা চনমনে এবং দ্রুত বেড়ে চলা ক্রেতা বাজারে বদলে দিয়েছে। বাজারে হরেক কিসিমের অঢেল জিনিসপত্র, পরিষেবা। বেশ বদলে যাচ্ছে উপভোক্তাদের কেনাকাটার ধাঁচ। আগে বেশিরভাগ বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্রামের বাজারকে পাত্তা দিত না তেমন একটা। হালচাল এখন বদলে যাচ্ছে বিলকুল। এসব সংস্থার চোখে গ্রামের বাজার এখন ব্যবসার পক্ষে এক বড়ো সুযোগ। মানুষের হাতে টাকা আসায়, গ্রামের বাজার ছেয়ে যাচ্ছে বড়ো বড়ো সব সংস্থার নিত্যনতুন পণ্যে। তবে ভারতের গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক মানুষ গরিবি রেখার নিচে (বিপিএল), বেকারি সমস্যা তীব্র, বহু লোক নিরক্ষর এবং ক্রেতাদের সচেতনতা কম।

এহেন পরিস্থিতিতে শিল্পোৎপাদক বা বিক্রেতার তো পোয়াবারো। উপভোক্তাকে শোষণ করার এ এক মোক্ষম সুযোগ। ক্রেতারা যাতে ফাঁকিতে না পড়ে সেজন্য ভারতে ব্যবস্থা আছে হরেক রকম। তা সত্ত্বেও বিক্রেতা ও শিল্পোৎপাদকরা এখনও

[লেখক বাণিজ্যিক উপদেষ্টা ও বিশ্লেষক। ই-মেল : singh.rahul8@gmail.com]

অত্যাবশ্যক পণ্যের মজুতদারি ও কালোবাজারি, আর্থিক দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে এবং ঠকাচ্ছে ক্রেতাসাধারণকে। নিরেস পণ্যে বোঝাই গ্রামের বাজার। গ্রামাঞ্চলে আর এক বড়ো সমস্যা হল নামীদামি ব্র্যান্ডের জাল জিনিসপত্তর। হাটবাজারে এসব পণ্যের বিক্রিবাটাতে কোনও নজরদারি না থাকায়, এসব বহু জিনিস স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যা বেড়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের দরুনও। বিমা, ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ, চিকিৎসার মতো পরিষেবা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে, অথচ এসব ক্ষেত্রে নেই কোনও 'চেক অ্যান্ড ব্যালান্স'। পরিষেবা প্রদানকারীদের হাতে গ্রামের গ্রাহকদের বঞ্চনার একশেষ। স্বাস্থ্যের বড়ো রকম ক্ষতি করছে জাল ওষুধবিষুধ। সবচেয়ে বেশি অসহায় মেয়ে, শিশু ও চাষিরা। চাষিদের কাছে খারাপ বীজ, ভেজাল কীটনাশক ও অন্যান্য জিনিস বিক্রি তো আকছার ঘটনা।

গণমাধ্যমের প্রসার হওয়ায়, গ্রামাঞ্চলে মাথা চাড়া দিয়েছে ভোগবাদ। এখন তাই অনেকে মনে করছে, বাজার শক্তির হাতে ক্রেতার ভবিতব্যতা ছেড়ে দেওয়া যায় না। সব দেখে-শুনে, ক্রেতা সুরক্ষার চৌহদ্দি বাড়িয়ে গ্রাহক স্বার্থ বাঁচাতে কয়েকটি আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে ভারত সরকার। এর মধ্যে আছে ১৯৮৬-র ডিসেম্বরে তৈরি ক্রেতা সুরক্ষা আইন। ক্রেতাদের কাছে এটাই প্রধান আইনি প্রতিকার।

ভারতে, ক্রেতা সুরক্ষার বিস্তৃত বিবরণ আছে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-তে। এই সমাজ হিতকর আইন ক্রেতার অধিকার নির্দিষ্ট এবং তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। ভারতে এটাই প্রথম ও একমাত্র এ ধরনের আইন। আইনটির সুবাদে সাধারণ ক্রেতা কম খরচে ও বহু ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি তাদের অভিযোগের প্রতিকার পায়। বাজারে কিছুদিন আগে পর্যন্ত দাপট চালিয়ে গেছে সংগঠিত শিল্পোৎপাদক, পণ্য ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদানকারীরা। ক্রেতাদের অধিকার ও তাদের নালিশের প্রতিকার নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে, আইনটির দৌলতে 'ক্রেতা সাবধান' নীতিবাক্যটি এখন অতীতের কথা।

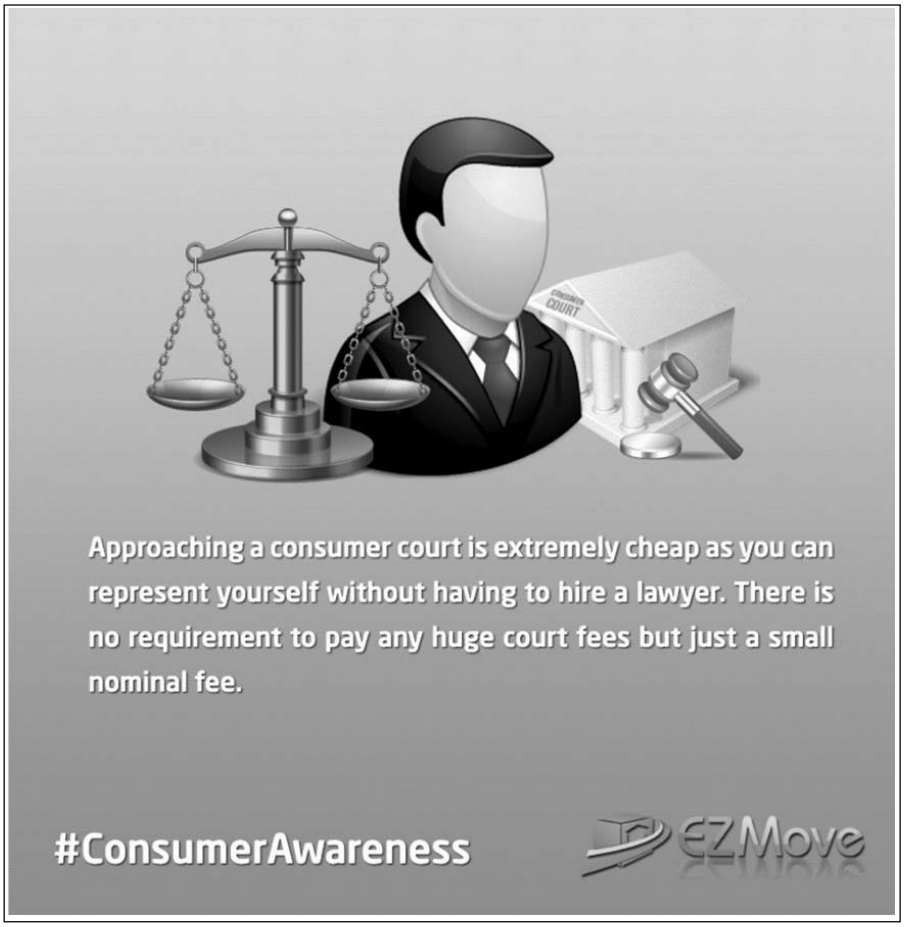

এই আইনবলে, ক্রেতা সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রের পাশাপাশি প্রতিটি রাজ্য ও জেলাতে গড়া চাই ক্রেতা সুরক্ষা পর্ষৎ। আইনটির বিধানমাফিক, প্রত্যেক জেলায় তৈরি হয়েছে ক্রেতা অভিযোগ নিষ্পত্তি ফোরাম। ক্রেতাসাধারণ, সামান্য কোর্ট ফি দিয়ে, সাধারণ কাগজে লেখা নালিশ পেশ করতে পারে এই ফোরামে। সেই অভিযোগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন জেলা স্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। পণ্য ও পরিষেবা, এ দুয়েরই ক্রেতা নালিশ জানাতে পারে। জেলা স্তরের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় রাজ্য ক্রেতা অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিশনে এবং তারপর জাতীয় ক্রেতা অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিশনে। এসব ট্রাইব্যুনালের কেতাকানুনে আনুষ্ঠানিকতার বাহুল্য তুলনায় কম এবং তারা ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর অঙ্গও বটে। চুক্তি আইনে বলা আছে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলির অঙ্গীকার কী কী শর্ত মোতাবেক পরস্পরের ক্ষেত্রে আইনত অবশ্য পালনীয় হবে। কোনও পক্ষ তার প্রতিশ্রুতি মানতে ব্যর্থ হলে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ কী প্রতিকার পাবে, উল্লেখ আছে তারও।

গাঁয়েগঞ্জে চাই ক্রেতা শিক্ষা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে ক্রেতা শিক্ষার প্রয়োজন। কেননা ক্রেতারা আজ ক্রমশ জটিলতা বেড়ে চলা বাজারের মোকাবিলা করছে এবং তারা গুচ্ছের তথ্য ও খটমট সব পণ্য ও পরিষেবার মধ্যে বেছে নেওয়ার পরিস্থিতির মুখোমুখি। ফলে তাদের জালজোচ্চুরির ফাঁদে পড়ার সমূহ আশঙ্কা। আর সেজন্য আগের চেয়ে ক্রেতাদের কুশলতা ও জ্ঞানের সীমা বাড়া দরকার। ওয়েলস ও আথার্টন বলেছেন, ক্রেতা শিক্ষা হল "আজকের জটিল বাজারে ক্রেতা যাতে তার সামনে হাজির সুযোগসুবিধের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারে, সেজন্য ভোগী সমাজে ব্যক্তির কুশলতা, জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি অর্জনের প্রক্রিয়া।"

গ্রামাঞ্চলে ক্রেতা শিক্ষার কাঠামো

১৯৮৬ সাল ইস্তক, ক্রেতা শিক্ষা ও সচেতনতায় মনোযোগ দিয়েছে ভারত সরকার। আইন ক্রেতাকে দিতে পারে নিছক কিছু অধিকার। কিন্তু এর রূপায়ণ মূলত নির্ভর করে ক্রেতাদের সচেতন প্রচেষ্টার উপর। ক্রেতা সচেতনতা ও শিক্ষার অভাব গ্রামে বেশি তীব্র। শিক্ষা ও সচেতনতা ক্রেতাকে ক্ষমতাশীল করে তোলে। শিক্ষা ব্যক্তিকে বিচক্ষণতার সঙ্গে বাছাই বা পছন্দ, সমস্যা সমাধান করা এবং আরও তথ্য ও সাহায্য খোঁজার কুশলতা জোগায়।

ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণার জন্য জাতীয় কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা গেছে গ্রামাঞ্চল ইতোমধ্যে বিকাশ হার বৃদ্ধিতে টপকে গেছে শহরকে। আগামী দশকে অব্যাহত থাকবে এই ধারা। বছরে ৫ লক্ষের বেশি টাকা আয় এমন প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৪৬ শতাংশের বাস গ্রামে। দ্রুত বিকিকিনি হওয়া অস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে গ্রামের বাজার শহরের চেয়ে বড়ো হবে বলে হিসেব করা হয়েছে; গ্রামাঞ্চলে ভোগ ব্যয় দেশের মোট ভোগ ব্যয়ের ৬০ শতাংশের মতো। তাই ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষায় গ্রামাঞ্চলে সামাজিক, আইনি ও গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য, কেননা আরও বেশি বেশি কোম্পানি গ্রামে তাদের পণ্য চালানোর চেষ্টা চালাবে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে গ্রামীণ ক্রেতাদের শিক্ষিত করে তোলা দরকার। ক্রেতা হিসেবে তাদের খরচ করা টাকার উপযুক্ত মূল্য উশুল সুনিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক্রেতা শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে জড়িতদের মধ্যে আছে :

- ক্রেতা শিক্ষা বিকাশের লক্ষে কাজ করে চলা ক্রেতা সংগঠন এবং অন্যান্য নাগরিক সমাজ
- শিল্প-ব্যবসায় অ্যাসোসিয়েশন ও বিভিন্ন কোম্পানি
- বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- শিক্ষক সংগঠন, আইনজীবী, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষক
- পরিবার ও অভিভাবক সংগঠন

- গণমাধ্যম

  ক্রেতা শিক্ষার পরিসীমা বাড়ায় এবং তা ক্রমশ বেশি প্রো-অ্যাকটিভ বা স্বতঃসক্রিয় হওয়ায়, আরও বহু গোষ্ঠী এব্যাপারে অংশ নিচ্ছে এবং ভোগের স্বভাবে প্রভাব ফেলতে গুরুত্ব দেওয়া বেড়েছে।

বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন ও গণমাধ্যমের ভূমিকা

গ্রামের ক্রেতা-সহ সমাজের অসহায় শ্রেণির মানুষের প্রতি গণমাধ্যমের দায়িত্ব আছে। আধুনিক প্রযুক্তি এসে পড়ায় এখন বহু রকম গণমাধ্যম গ্রামের ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে। বিজ্ঞাপন হল নতুন নতুন পণ্য সম্বন্ধে তথ্যের বড়ো উৎস।

গ্রামের বাজারে বহু কোম্পানি ঢুকে পড়ার দরুন প্রতিযোগিতা তুঙ্গে ওঠায় মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম আজগুবি বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ। ফলে ক্রেতাদের বঞ্চনার একশেষ। ক্রেতা কল্যাণ নিয়ে মাথা ঘামাতে বয়েই গেছে বিজ্ঞাপন সংস্থা ও বিজ্ঞাপনদাতাদের। কেবল ও স্যাটেলাইট চ্যানেলের দৌলতে দেশের দূরদূরান্ত ও দুর্গম এলাকার মানুষও জানে বাজারে আসা নতুন নতুন সব জিনিসের কথা।

ভুলভাল বা মিথ্যে বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে নেই তেমন কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। গ্রামাঞ্চলের গরিব ও অশিক্ষিত ক্রেতাদের ক্ষয়ক্ষতির ফাঁদে পড়ার সমূহ আশঙ্কা। সরকারের উচিত উৎপাদক ও পরিষেবা প্রদানকারীদের অমূলক দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন রুখে দেওয়া।

ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে "জাগো গ্রাহক জাগো" এক উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। তবে, গ্রামের ক্রেতাদের সঙ্গে ভালোভাবে যোগাযোগ করতে আমাদের আরও এগোনো চাই। গ্রামের ক্রেতার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়ভীতি ও প্রত্যাশার সুলুকসন্ধান রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। টিভি এখন গাঁয়েগঞ্জের অনেক বাড়িতেই। যদিও হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়াটা এক বড়ো সমস্যা। গ্রামের

মানুষের কাছে পৌঁছতে ট্রানজিসটার রেডিওর শরণ নেওয়া যায়।

দাবি ও পালটা দাবি মারফৎ ক্রেতা ঠকানো বন্ধ করার জন্য আমাদের চাই এক কার্যকর নিয়ামক সংস্থা। অসাধু ব্যবসার বিশদ সংজ্ঞা আছে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬-এ। এক্ষেত্রে ক্রেতা আদালতগুলি কিছু চমৎকার আদেশ দিয়েছে। ভুলভাল বিজ্ঞাপন রোধে একচেটিয়া ও ব্যবসা সীমিতকরণ কমিশন (MRTPC)-এর মতো সক্রিয়তা অবশ্য তারা দেখাতে পারে না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের বিষয়ে ক্রেতা আদালতের তদন্ত করার পরিকাঠামো ও ক্ষমতা নেই, একচেটিয়া কমিশনের মতো নিজে থেকে এসব কেস হাতে তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রেও খাটে একথা। অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়াও (ASCI) নিয়ামক হিসেবে ততটা কাজের হয়নি। একচেটিয়া কমিশন উঠে যাওয়ায়, লোক ঠকানো বিজ্ঞাপন রুখতে আমাদের অন্য কোনও উপায়ের কথা ভাবা দরকার।

ভেজাল মোকাবিলা

কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যে ভেজাল নিবারণ আইন সংশোধন করে ১৯৮৬ সালে এবং প্রত্যেক নাগরিককে খাদ্য পরিদর্শক (ফুড ইন্সপেকটর) হতে এবং খাদ্য নিরাপত্তার কাজে অংশ নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। নাগরিকের ক্ষমতা তৈরির ব্যবস্থা রূপায়ণের কাজ অবশ্য ব্যর্থ হয়। ক্রেতাকে তাই খাদ্য নিয়ামকের ভরসাতেই থাকতে হচ্ছে। ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও গড়মান কর্তৃপক্ষের (FSSAI) মতে, রোজকার খাবারদাবারের মধ্যে দুধ থেকে তৈরি খাদ্য (খোয়া, মাখন, ঘি, ছানার মিষ্টি), অড়হর ও রাজমার মতো ডাল, সরষের তেল, বাদাম তেল, মাংস, ফল ও সবজিতে ভেজালের বাড়বাড়ন্ত। খোলা বিক্রি হওয়া জিনিসপত্রে তো ভেজালের একশেষ। নামী ব্র্যান্ডের প্যাকেটের খাবার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হওয়ার সম্ভাবনা, কেননা তাদের সুনামের বিষয়ে সংস্থাগুলি সজাগ।

খাদ্য নিরাপত্তা ও গড়মান আইনে ভেজাল শব্দটারই পাত্তা মিলবে না। আইনটিতে আছে নিরাপদ খাবার, নিরেস খাবার ও অনিরাপদ খাবারের কথা। নিচু মানের খাবারের ক্ষেত্রে কিছু জরিমানা দিলেই ছাড়া পাওয়া যায়।

অনিরাপদ গোত্রের খাদ্যের বেলায় অবশ্য ভিন্ন ব্যাপার।

বলবৎকরণে ব্যর্থতা

খাদ্য নিরাপত্তা ও গড়মান আইন চালু হওয়ার পর, খাবারদাবারে গুণমান যাচাইয়ের এক নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও, বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার সেই একই কর্মীদের হাতে দেওয়া হয়েছে আইন প্রয়োগের ভার। ক্রেতা আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের মতে, দপ্তর আইন রূপায়ণে ব্যর্থ। ৯৭ শতাংশ ক্রেতাই খাবারদাবার যাচাই করে দেখে না। ফলমূল ও শাক-সবজি তাজা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ঠিকঠাক পরিপক্ক কিনা তা দেখা দরকার। পোকায় কাটা, থেঁতলানো ফল-সবজি অবশ্যই না কেনা উচিত। টিনবন্দি ও বোতলের খাবারের সিল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ দেখে নেওয়া তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চিত হতে হবে যে ঢাকনা ঠিকঠাক 'সিল' অবস্থায় আছে। এফপিও (ফ্রুট প্রোডাক্টস অর্ডার), আইএসআই বা আগমার্ক দেখা দরকার।

গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট ও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সচেতনতা জাগানো

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ বৈদ্যুতিন সাক্ষরতা অভিযান : গ্রামের ৬ কোটি পরিবারকে ডিজিটালি সাক্ষর করে তুলতে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান (PMGDISHA)-এ সায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ২,৩৫১.৩৮ কোটি টাকা। ২০১৯-র মার্চের মধ্যে পল্লী ভারতকে ডিজিটাল সাক্ষর করে তোলাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

প্রকল্পটি বিশ্বে এধরনের বৃহৎ কর্মসূচির অন্যতম। ২০১৬-'১৭-তে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ২৫ লক্ষ প্রার্থীকে। ২০১৭-'১৮-এ ২.৭৫ কোটি এবং ২০১৮-'১৯-এ প্রশিক্ষণ পাবে ৩ কোটি লোক।

দেশে আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতে এর আওতায় প্রশিক্ষণের সুযোগ মিলবে গড়ে ২০০-৩০০ মানুষের। ডিজিটালি সাক্ষর ব্যক্তিরা কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোন ব্যবহার, নগদহীন লেনদেন ইত্যাদি করতে সক্ষম হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় এই প্রকল্প দেখভালের দায়িত্ব বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের। উল্লেখ্য, ২০১৪-তে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সংক্রান্ত সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্রামে কম্পিউটার আছে মাত্র ৬ শতাংশ পরিবারে। অর্থাৎ, ১৫ কোটির বেশি পরিবারে নেই কোনও কম্পিউটার। প্রকল্পটির মাধ্যমে এসব অনেক পরিবার ডিজিটালি সাক্ষর হয়ে উঠবে।

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দু'টি দিক—ডিজিটাল সাক্ষরতা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ। কর্মসূচির সাফল্যের জন্য দু'টোই দরকার। নগদবিহীন লেনদেনের দিকে সরকারের জোর বাড়ানোর নীতির সঙ্গে তালমিল রেখে ডিজিটাল সাক্ষরতার কোর্সে গুরুত্ব পাবে ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহার, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস, আনস্ট্রাকচার্ড সাপ্লিমেন্টারি সার্ভিস ডেটা, আধার এনারোলড পেমেন্ট সিস্টেম ও অন্যান্য ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।

২০১৪-র আগস্টে, ভারত সরকার শুরু করে জাতীয় ডিজিটাল সাক্ষরতা মিশন। এই মিশন পরিচালনার ভার পেয়েছে বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রক। ২০১৬-এ যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের আওতা থেকে বের করে তৈরি হয় এই নতুন মন্ত্রকটি। মিশন রূপায়িত হচ্ছে ন্যাসকম, ইনটেল ও এইচপি-র মতো অংশীদার সংস্থাগুলি মারফৎ। গরিবি রেখার নিচের মানুষ (বিপিএল), তপশিলি জাতি ও উপজাতির লোক প্রশিক্ষণ পায় বিনা খরচে। বাকিদের কাছ থেকে নেওয়া হয় সামান্য ফি।

মিশনের লক্ষ্য, প্রতিটি পরিবারের একজনকে ডিজিটালি সাক্ষর করে তোলা।

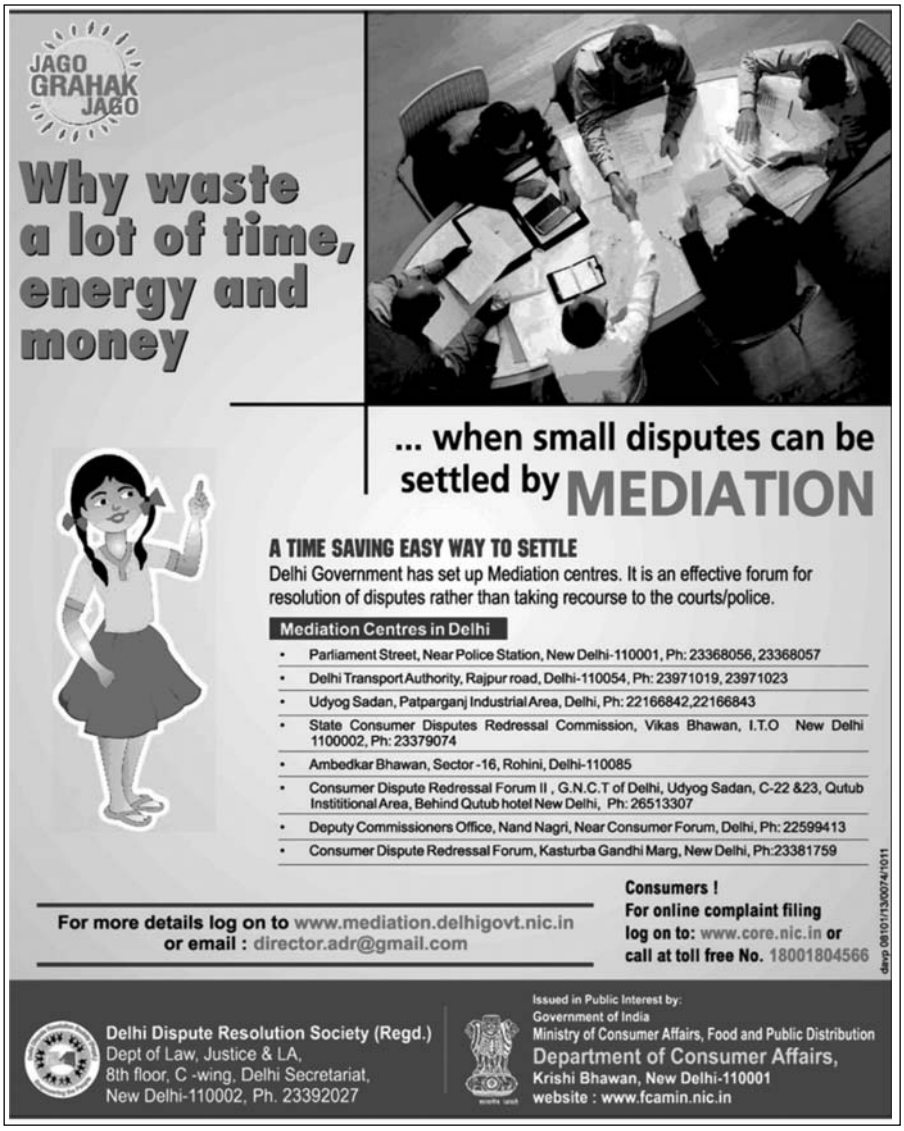

প্রাথমিক টার্গেট ছিল ৫০ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষের জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতার বন্দোবস্ত করা। বিশেষ গুরুত্ব পায় অঙ্গনওয়াড়ি ও রেশন ডিলার-এর মতো তৃণমূল স্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ। মিশন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট অনুসারে, প্রারম্ভিক টার্গেট ইতোমধ্যে অর্জন করা গেছে। ইদানীংকার হিসেবে, ৮০ লক্ষ ২৭ হাজার ব্যক্তি প্রশিক্ষণ পেয়েছে। প্রশিক্ষণ পেতে নাম লিখিয়েছে ১ কোটি লোক। নতুন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান হচ্ছে ডিজিটাল সাক্ষরতার মানোন্নয়ন।

গ্রামীণ ক্রেতাদের কেনাকাটার ধরনে বিবর্তন ঘটছে। শহরের ক্রেতাদের থেকে এসবের ফারাক আছে বেশ। তাদের বস্তুগত ও মানসিক কল্যাণ বৃদ্ধির উপযোগী পণ্য ও পরিষেবা সম্পর্কে সচেতন করতে চাই গ্রামীণ ক্রেতার বিশেষ চাহিদা মেটানোর জন্য উন্নত পণ্য ও পরিষেবা এবং মবিলিটি প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনা। তারা যে পণ্য কেনে ও যে পরিষেবা তাদের মেলে, সে বিষয়ে তাদের ন্যায্য প্রত্যাশা পূরণের উপর নির্ভর করে ক্রেতার মঙ্গলামঙ্গল। ভারতে ক্রেতা সুরক্ষা আইন আছে ঠিকই, কিন্তু ক্রেতারা সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়। গ্রামীণ ক্রেতাদের সুরক্ষার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফল খুব একটা ইতরবিশেষ হয়নি। এজন্য দায়ি বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থাদি। গ্রামীণ গ্রাহক কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নিতে মোটামুটিভাবে নির্ভর করে গণমাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের উপর। ঠকে গেলে, তারা জানে না কীভাবে তার প্রতিকার মেলে।

ক্রেতা শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ক্রেতা সংগঠন ও অনুরূপ নাগরিক গোষ্ঠীগুলির। তারা ক্রেতাকে তথ্য জোগানোর ক্ষমতা ধরে এবং পণ্য পরিষেবা সম্পর্কে সব কিছু জেনেবুঝে কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।

কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বা তার আগে ক্রেতার কাছে তথ্য পৌঁছে যাওয়া দরকার। স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে এখন ক্রেতা শিক্ষা ঢোকানোর বিষয়টি বিবেচনা করার সময়ও এসেছে।

জাল ও ভেজাল জিনিস থেকে ক্রেতাকে রক্ষা করতে চাই আইনের বিভিন্ন ধারার সুষ্ঠু প্রয়োগ। ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষিত করতেই এটা জরুরি।

চাই অভিযোগ নিষ্পত্তির জোরদার ব্যবস্থা

তাদের অভিযোগের ফয়সালা ক্রেতার কাছে এক বড়ো বিষয়। অভিযোগ মীমাংসা ব্যবস্থার নাগাল পাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু খাতায়কলমে থাকাটা যথেষ্ট নয়, এই সুযোগ বাস্তবে কাজে লাগানোর বন্দোবস্ত থাকা দরকার। তাদের প্রতি অন্যায় হলে তার

বিহিত হবে, এটা সুনিশ্চিত হলে, নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রতি ক্রেতার মনে আস্থা জাগবে।

পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

শুধুমাত্র ক্রেতাকে শিক্ষিত করা নয়, গ্রামের হাটে-বাজারে জাল ও ভেজাল জিনিস বিক্রি বন্ধ করার জন্য পঞ্চায়েতি প্রাতিষ্ঠান-গুলিকে জড়িত করা আবশ্যক। ক্রেতা সুরক্ষা এবং ক্রেতা কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এসব প্রতিষ্ঠান এবং নীতি রচয়িতারাও তা স্বীকার করে নিয়েছেন।❑

2018-র WBCS পরীক্ষায় পাশ করতে অবশ্যই চাই

কার্তিক চন্দ্র মন্ডল সম্পাদিত

3000+ Chapterwise MCQ Questions on -

1) ভারতের ইতিহাস ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম 2) ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল
3) বিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা), প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিবেশ
4) ভারতের অর্থনীতি ও ভারতের রাজনীতি

(বিঃ দ্রঃ এই 4টি বই আলাদা আলাদা খন্ডে ডিসেম্বর 2017-তে প্রকাশিত হয়েছে)

5) জেনারেল স্টাডিজ - 2018 ₹ 950

বইটির বিষয়বস্তু ● বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর ● বর্তমান ভারত ● পশ্চিমবঙ্গ ● পৃথিবী ● বিবিধ ● সাহিত্য সংস্কৃতি ● চলচ্চিত্র ● ভারতীয় রাজনীতি ● আন্তর্জাতিক সংস্থা ● ভারতীয় অর্থনীতি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ● পরিবেশ ● জীববিজ্ঞান ● রসায়ন ● পদার্থবিদ্যা ● কম্পিউটার ● বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ● ভারতের ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ● সাধারণ ভূগোল ● ভারতের ভূগোল ● পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল ● খেলাধুলা ● পুরস্কার ● ইংরেজি ● গণিত ও জি. আই ● কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং 5 Free Practice Sets

6) ভারতের ইতিহাস ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম - ₹ 495
Free 5 Practice Sets

7) কমপিটিটিভ ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড জেনারেল ইনটেলিজেন্স - ₹ 495
Free 10 Online Practice Sets

8) কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 2018 অ্যান্ড জিকে ₹ 70

মন্ডল প্রকাশনী
21, রামনাথ বিশ্বাস লেন
শিয়ালদহ, কলকাতা - 700 009
মোবাইল ঃ 98362 23112
ইমেল : mondalprakashoni@gmail.com

ভারতীয় মানক ব্যুরো : গ্রাহকের সুরক্ষা ঢাল

*নানা উপায় অবলম্বনে ভারতীয় মানক ব্যুরো উপভোক্তাদের হাতে সেরা গুণমানের পণ্যসামগ্রী তুলে দিতে জোরদার তৎপরতা চালিয়ে আসছে। ব্যুরো কর্তৃক শংসায়িত পণ্য ও পরিষেবার গুণমান যাতে সাধারণ উপভোক্তারা নিজেরাই সহজ যাচাই করে দেখতে পারেন সেজন্য **BIS** তাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সংস্থান রেখেছে। ওয়েবসাইট ছাড়াও মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেও এই কাজটি করা যেতে পারে। আর এভাবেই **BIS** শংসায়িত পণ্যসামগ্রীর গুণমানের ক্ষেত্রে উপভোক্তা নিজের যাবতীয় সংশয়ের নিরসন নিজেই করতে পারেন।*

আমাদের চৌহদ্দির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দর্শক হলেন গ্রাহক ("A customer is the most important visitor on our premises...") কথাটি আর কেউ নয়, বলেছেন আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। যে কোনও প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ভিত্তি হলেন গ্রাহককুল। যে কোনও সংস্থার কৌশলগত অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্যই থাকে, গ্রাহকবর্গের চাহিদাকে চিহ্নিত করে তা পূরণ করা। সংস্থা চালনার প্রতিটি ধাপে যদি গ্রাহককুলের গুরুত্বকে বিবেচনায় রাখা হয়, তা হলে একদিকে যেমন গ্রাহকের সন্তুষ্টি সুনিশ্চিত করতে তা কাজে আসবে, অন্যদিকে তেমনি সংস্থা তার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে।

ভারত এক বিপুল জনসংখ্যার দেশ। আর সমস্ত ধরনের শিল্পোৎপাদক (Manufacturing) ও বিপণন সংস্থার জন্যই এই জনসংখ্যা এক বিরাট বাজার তৈরি করেছে। দেশ যে বিকাশের পথে দ্রুতগতিতে হেঁটে চলেছে তার দৌলতে তথা জনসংখ্যায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানুষের সহাবস্থানের দরুন সব ধরনের সংস্থার জন্যই তা এক স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে সৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ঠাঁই করে নিয়েছে অসৎ কিছু সংস্থাও।

উল্লিখিত বিষয়টিকে মাথায় রাখলে, গ্রাহকদের নিজেদের সুরক্ষার জন্যই এখন অতি সক্রিয় হওয়াটা নিতান্তই জরুরি। পাশাপাশি সরকারের তরফেও গ্রাহক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সুষ্ঠু পন্থাপদ্ধতি উদ্ভাবন করে এগিয়ে আসা চাই।

এখন থেকে সত্তর বছরেরও বেশি সময় আগে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঊষালগ্নেই আমাদের দেশের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃবর্গ কিন্তু এই লক্ষ্যেই ভারতীয় জাতীয় মানক সংস্থা (National Standards Body of India) হিসাবে Societies Registration Act, 1860-এর আওতায় রেজিস্ট্রিকৃত ভারতীয় মানক সংস্থা বা Indian Standards Institution (ISI) গঠন করেন। ভারতীয় শিল্পক্ষেত্র যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানক বা মানদণ্ড গ্রহণ করে তার প্রস্তুতি ও প্রসারকল্পে উদ্যোগী হওয়াটাই ISI-এর গুরুদায়িত্ব বলে স্থির হয়। পরবর্তীকালে, সংস্থার দায়িত্বের পরিধি আরও সম্প্রসারিত করা হয়। Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 বা ১৯৫২ সালের ভারতীয় মানক সংস্থা (শংসায়িত চিহ্ন) আইন মোতাবেক পণ্যের শংসাপত্র প্রদানের কাজকর্মের দায়িত্বও তুলে দেওয়া হয় সংস্থার হাতে। দেশে অর্থনীতি ও শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধির তথা বাড়বাড়ন্তের সূত্রে BIS Act, 1986 মোতাবেক ১৯৮৭ সালে সংস্থা ভারতীয় মানক ব্যুরো (Bureau of Indian Standards) এই নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্থার সাফল্য, জনপ্রিয়তা ও সম্প্রসারণের সূত্রে তথা ইতোমধ্যে বাজারের পরিবেশের যে রদবদল ঘটে গেছে

[তথ্যসূত্র : ভারতীয় মানক ব্যুরো।]

তার জেরে BIS Act, 2016--এর ঘোষণা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মানক সংক্রান্ত কাজকর্ম ছাড়াও BIS জাতীয় অর্থনীতিকে বহু উপায়ে বাস্তবিক পক্ষে সুফল জুগিয়ে চলেছে। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য গুণমানের পণ্যের বন্দোবস্ত, উপভোক্তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকির হাত থেকে অনেকাংশে পরিত্রাণ, আমদানি ও রপ্তানির বিকল্পগুলিকে উৎসাহ জোগানো, একই পণ্যের অসংখ্য রূপভেদ যাতে বাজার ছেঁয়ে না ফেলে তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এমনই গুটিকয় সুফলের অন্যতম। পণ্যের মান নির্ধারণ (Standardization), শংসায়িত করা (Certification), ও গুণমান যাচাই (Testing)-এর মাধ্যমে BIS এই কাজগুলি করে থাকে।

দেশের অর্থনীতির স্বার্থে উল্লিখিত বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করতে গিয়ে উপভোক্তাদের জন্য BIS সর্বোত্তম গুণমানের নিশ্চয়তা দিতে এক ব্যবস্থাপনার বিকাশ ঘটিয়েছে। এই বহু ধরনের কর্মকাণ্ড এর আওতায় পড়ে, নিচে যার তালিকা পেশ করা হল :

(i) মানকের সূত্র নির্ধারণ বা Standards Formulation

(ii) পণ্য শংসায়ন প্রকল্প বা Product Certification Scheme

(iii) বাধ্যতামূলক নিবন্ধীকরণ প্রকল্প বা Compulsory Registration Scheme

(iv) বিদেশি উৎপাদক শংসায়ন প্রকল্প বা Foreign Manufacturers Certification Scheme

(v) হলমার্ক চিহ্ন প্রকল্প বা Hallmarking Scheme

(vi) পরীক্ষাগার পরিষেবা বা Laboratory Services

(vii) পরীক্ষাগার স্বীকৃতি প্রদান প্রকল্প বা Laboratory Recognition Scheme

(viii) ভারতীয় মানক বিক্রয় বা Sale of Indian Standards

(ix) উপভোক্তা বিষয়ক কর্মকাণ্ড বা Consumer Affairs Activities

BIS Hallmark চিহ্ন

(x) প্রশিক্ষণ পরিষেবা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বা Training Services, National & International Level

(xi) তথ্য সংক্রান্ত পরিষেবা বা Information Services

"মানক সংক্রান্ত কাজকর্ম ছাড়াও BIS জাতীয় অর্থনীতিকে বহু উপায়ে বাস্তবিক পক্ষে সুফল জুগিয়ে চলেছে। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য গুণমানের পণ্যের বন্দোবস্ত, উপভোক্তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকির হাত থেকে অনেকাংশে পরিত্রাণ, আমদানি ও রপ্তানির বিকল্পগুলিকে উৎসাহ জোগানো, একই পণ্যের অসংখ্য রূপভেদ যাতে বাজার ছেঁয়ে না ফেলে তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এমনই গুটিকয় সুফলের অন্যতম।"

নয়াদিল্লিতে স্থিত সদর দপ্তর তথা কলকাতা (পূর্বাঞ্চলীয়), চেন্নাই (দক্ষিণাঞ্চলীয়), মুম্বাই (পশ্চিমাঞ্চলীয়), চণ্ডীগড় (উত্তরাঞ্চলীয়), দিল্লি (মধ্যাঞ্চলীয়), এই পাঁচটি আঞ্চলিক দপ্তর এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা শাখা অফিসগুলির মাধ্যমে সংস্থা তার কাজকর্ম পরিচালনা করে। পাঁচটি আঞ্চলিক দপ্তরের অধীনস্থ এই ক্ষেত্রীয় অফিসগুলি শিল্পক্ষেত্রকে শংসায়ন পরিষেবা প্রদান করে থাকে, তথা রাজ্য সরকার, শিল্প সংস্থা, টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান ও উপভোক্তা সংস্থাগুলির মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে পণ্যের জন্য অনুরূপতা যাচাই (Conformity Assessment) করা হয়ে থাকে :

ISI চিহ্ন

(ক) BIS পণ্য শংসায়িত প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল উপভোক্তাদেরকে পণ্যের গুণমান, সুরক্ষা ও নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে তৃতীয় পক্ষ হিসাবে নিশ্চয়তা (Third Party Guarantee) প্রদান। ISI শংসা চিহ্ন মানক চিহ্ন (Standard Mark) হিসাবে পরিচিত। পণ্যের উপর এই ছাপ থাকার অর্থ দাঁড়ায় তার নির্দিষ্ট গুণগত মানের নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে। পণ্যটির লাইসেন্স যে সংস্থার নামে থাকে তার কাজকারবারের উপর নিয়মিত নজরদারি চালানো হয়। খোলা বাজার এবং কারখানা, উভয় জায়গা থেকেই পণ্যের নমুনা সংগ্রহ করে গুণমান যাচাই করে দেখা হয় আচমকা পরিদর্শন চালিয়ে। এরকম কড়া ভাবেই ISI চিহ্নযুক্ত পণ্যের নির্দিষ্ট গুণমান বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে সংস্থা। BIS থেকে মানক সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট ছাড়পত্র মেলার পর লাইসেন্স প্রাপ্ত পণ্যগুলির ক্ষেত্রে উৎপাদকেরা নিজেরাই যাতে সেগুলিকে শংসায়িত করতে পারেন তার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শংসায়িত সামগ্রীর গুণমান আদৌ রক্ষিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে ব্যুরো খুব কড়া নজরদারি চালিয়ে থাকে।

উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীকে ISI চিহ্নযুক্ত করতে উদ্যোগী হবে কিনা, সেটা সম্পূর্ণ উৎপাদক সংস্থার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, এর জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ইদানীংকালে জনস্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, নিরাপত্তা, পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যাপক হারে ব্যবহারের চলন ইত্যাদি দিকগুলিকে বিবেচনায় এনে বিভিন্ন আইনের আওতায় সময় সময় আদেশ জারি করে বিবিধ পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে ISI শংসাপত্রকে আবশ্যিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আবেদনপত্র জমা দিলে তার ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদানের কাজ BIS এখনও চালিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু বাধ্যতামূলক শংসায়নের ক্ষেত্রে তা বলবৎ করে থাকে প্রজ্ঞাপিত কর্তৃপক্ষ (Notified Authorities)। LPG গ্যাস সিলিন্ডার, রেগুলেটর, ভাল্‌ব এধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে শংসায়িত করা হয়। কোন কোন পণ্যসামগ্রী বাধ্যতামূলকভাবে শংসায়িত তার একটি তালিকা BIS ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

(খ) মূল্যবান ধাতু নির্মিত সামগ্রীতে মূল্যবান ধাতুর অংশভাক কতটা তার সরকারি রেকর্ড রাখার জন্য তথা মূল্যবান ধাতুর বিশুদ্ধতার পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন হিসাবে হলমার্ক ছাপ লাগানো হয়। এক তো, সাধারণ মানুষ যাতে অশুদ্ধ ধাতু কিনে ঠকে না যান, ক্রেতার সুরক্ষার সেই দিকটি পাকাপোক্ত করা এবং দুই, সূক্ষ্মতার বৈধ মান রক্ষিত করার বিষয়ে উৎপাদকদের নীতিগতভাবে বাধ্য করা, এই দু'টিই হল হলমার্ক চিহ্ন প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতে বর্তমানে, সোনা ও রুপো, শুধু এই দুই মূল্যবান ধাতুকেই হলমার্ক চিহ্নের আওতায় রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে

*"উপভোক্তারা অতি সহজে ব্যবহার করতে পারবেন এমন একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে **BIS**, যার নাম **CARE**। সংস্থার ওয়েবসাইট অথবা গুগল প্লে-স্টোর থেকে পাওয়া যেতে পারে এই অ্যাপ। অ্যান্ড্রয়েড বা **iOS** প্ল্যাটফর্ম আছে এমন যে কোনও স্মার্ট ফোনে এই অ্যাপ ডাউনলোড করা সম্ভব। বিভিন্ন তথ্যের নাগাল পেতে তথা **ISI** চিহ্নযুক্ত পণ্য অথবা হলমার্কযুক্ত সামগ্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য এই অ্যাপটি ব্যবহার করা যাবে।"*

বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি সামগ্রী নিবন্ধীকরণের চিহ্ন

হলমার্ক চিহ্নের উপযুক্তভাবে যে মান নির্ধারণ করা হয়েছে, BIS কর্তৃক প্রদত্ত হলমার্ক ছাপ তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রকল্প অনুযায়ী, BIS গহনা ব্যবসায়ীদেরকে লাইসেন্স প্রদান করে নিজেদের প্রস্তুত করা অলংকারে হলমার্ক ছাপ লাগাতে। যেসব অলংকার ব্যবসায়ী BIS থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন, তারা ব্যুরো স্বীকৃত যে কোনও ধাতু বিশুদ্ধতা যাচাই এবং হলমার্কিং কেন্দ্র থেকে নিজেদের প্রস্তুত করা অলংকারে হলমার্ক চিহ্ন লাগাতে পারে। কোনও ধাতু বিশুদ্ধতা যাচাই এবং হলমার্কিং কেন্দ্র (Assaying and Hallmarking Centre)-কে স্বীকৃতি দেওয়া হয় IS 15820 : 2009-এর নিরিখে।

(গ) বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি সামগ্রী (বাধ্যতামূলক নিবন্ধীকরণের অবশ্যপূরণীয় শর্ত) আদেশ বা Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order-এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রক (Ministry of Electronics & Information Technology, MeitY) ত্রিশটিরও বেশি বৈদ্যুতিন সামগ্রীর জন্য সুরক্ষার নিরিখে অবশ্যপূরণীয় শর্তাবলীর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই সমস্ত বৈদ্যুতিন

সারণি-১

ক্রমিক সংখ্যা	যে ধরনের জিজ্ঞাস্য তথ্য প্রয়োজন	লিঙ্ক	বিশদ
১.	মানক চিহ্নিত করতে	আপনার মানকের অবস্থান নির্ণয় করুন > মানকের জন্য অনুসন্ধান করুন	ব্যুরোর ওয়েবসাইটের বাম দিকের মেনু-বারে, RTI-এর নিচে, 'Locate Your Standards' লেখাটির উপর ক্লিক করলে 'Search for Standards' শীর্ষক একটি পেজ আসবে। এই পৃষ্ঠায় বর্তমান মানক-গুলি সম্পর্কে বিশদ তথ্য মিলবে। কোন কোন মান বা শর্ত পূরণ করলে লাইসেন্স মিলবে 'Buy'-সহ তা বিস্তারিত জানা যাবে এখান থেকে।
২.	কোনও নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য লাইসেন্স বা লাইসেন্সধারীর সম্পর্কে বিশদ তথ্যের নাগাল পেতে	আপনার মানকের অবস্থান নির্ণয় করুন > মানকের জন্য অনুসন্ধান করুন >> (লাইসেন্স নাম্বারের আওতায় দেওয়া নাম্বারে ক্লিক করুন)	উল্লিখিত পেজ-এ 'No. of licences'-এর আওতায় দেওয়া সংখ্যায় ক্লিক করলে লাইসেন্স/লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বিষয়ে বিশদ তথ্য জানা যাবে।
৩.	কোনও নির্দিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্স/লাইসেন্সধারী/ আবেদনকারীর এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ-তথ্যের নাগাল পেতে	পণ্যের শংসায়ন > অনলাইন তথ্য >> আবেদন/লাইসেন্স সংক্রান্ত	ব্যুরোর ওয়েবসাইটের শীর্ষ মেনুবারে 'Product Certification' লেখা একটি ট্যাব আছে। এটির ওপর ক্লিক করলে একটি সাব মেনু আসবে। এখানে 'Online Information'-এ ক্লিক করতে হবে। তারপর 'Application/Licence Related' লেখাটির উপর গিয়ে ক্লিক করতে হবে। ফের একটি সাব মেনু আসবে, যার মধ্যে আছে 'List of Licences (Buyer's Guide)', 'Status of Licences' এবং 'Know your products/IS No.'। এসবই বিশেষভাবে উপভোক্তাদের জন্য উপকারে আসবে।
৪.	BIS মানক চিহ্নযুক্ত পণ্য ও অন্যান্য পরিষেবা সংক্রান্ত নালিশ জানাতে	উপভোক্তার জন্য > অনলাইন অভিযোগ নথিভুক্তি	BIS ওয়েবসাইটের শীর্ষ মেনু বার-এ উপভোক্তাদের জন্য ('For Consumers') লেখা একটি ট্যাব আছে। এই ট্যাবের নিচে সাব মেনুর সারবত্তায় বর্ণনা করা আছে অভিযোগ নথিভুক্ত করার পদ্ধতি। অনলাইন অভিযোগ নথিভুক্তির আওতায় উপভোক্তা তার সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা যাবে সে সংক্রান্ত বিশদ তথ্য দখিল করে ব্যুরোর ওয়েবসাইটে নিজেকে নথিভুক্ত করতে পারেন। তার পর ওই সাইটেই নিজের অভিযোগটি অনলাইন নথিভুক্তির সুযোগ পাবেন।

ও তথ্য-প্রযুক্তি সামগ্রীর জন্য ভারতীয় মানক ব্যুরো বা BIS বাধ্যতামূলক নিবন্ধীকরণ প্রকল্প (Compulsory Registration Scheme, CRS) চালিয়ে থাকে। অতিসক্রিয়তার সঙ্গে উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা তথা তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য পক্ষদেরকে (other stakeholders) সুবিধা করে দিতে এদের সকলের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো নিতান্ত জরুরি। এরাও যাতে পণ্যসামগ্রীর মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে, ফিডব্যাক দিয়ে নিজেদের মতামত জানাতে পারে, নিজেদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারে, সেজন্য ব্যুরোর ওয়েবসাইটে সংস্থান রাখা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটের বিভিন্ন লিঙ্কের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ নিজেই বিবিধ বিষয়বস্তু যাচাই করে দেখার সুযোগ পাবেন। এধরনের লিঙ্কের একটি তালিকা সারণি-১-তে দেওয়া হল।

উপভোক্তারা অতি সহজে ব্যবহার করতে পারবেন এমন একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে BIS, যার নাম CARE। সংস্থার ওয়েবসাইট অথবা গুগল প্লে-স্টোর থেকে পাওয়া যেতে পারে এই অ্যাপ। অ্যান্ড্রয়েড বা iOS প্ল্যাটফর্ম আছে এমন যে কোনও স্মার্ট ফোনে এই অ্যাপ ডাউনলোড করা সম্ভব। বিভিন্ন তথ্যের নাগাল পেতে তথা ISI চিহ্নযুক্ত পণ্য অথবা হলমার্কযুক্ত সামগ্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য এই অ্যাপটি ব্যবহার করা যাবে।

এই সমস্ত নানা উপায় অবলম্বনে ভারতীয় মানক ব্যুরো উপভোক্তাদের হাতে সেরা গুণমানের পণ্যসামগ্রী তুলে দিতে জোরদার তৎপরতা চালিয়ে আসছে। ব্যুরো কর্তৃক শংসায়িত পণ্য ও পরিষেবার গুণমান যাতে সাধারণ উপভোক্তারা নিজেরাই সহজ যাচাই করে দেখতে পারেন সেজন্য BIS তাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সংস্থান রেখেছে। ওয়েবসাইট ছাড়াও মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেও এই কাজটি করা যেতে পারে। আর এভাবেই BIS শংসায়িত পণ্যসামগ্রীর গুণমানের ক্ষেত্রে উপভোক্তা নিজের যাবতীয় সংশয়ের নিরসন নিজেই করতে পারেন।❑

উপভোক্তার উপর জিএসটি-র কী প্রভাব?

টি. এন. অশোক

GST চালুর পর পাঁচ মাস কেটে গেছে, কিন্তু ব্যবসায়ী ও উপভোক্তারা এখনও এই নতুন কর বিধি গ্রহণ করতে গিয়ে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন বলে মনে হয় না। হোটেল রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া, বেড়ানো প্রভৃতির খরচাপাতি বাড়ায় সব থেকে বেশি প্রভাব পড়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ছোটো ব্যবসাপত্রের ওপর। তাছাড়া দীর্ঘ, জটিল ধোঁয়াশাযুক্ত প্রক্রিয়ার কারণে সমস্যায় পড়েছে নতুন উদ্যোগ, উদ্বেগে ছোটো উদ্যোগপতিরা। যদিও GST পরিষদ অবশ্য অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার নিষ্পত্তির আশ্বাস দিয়েছে।

চলতি বছরের পয়লা জুলাই থেকে সারা দেশে মহা সমারোহে পণ্য ও পরিষেবা কর বা GST চালু হল। এর ঘোষণা করা হয় সংসদের যৌথ অধিবেশনের মঞ্চ থেকে। GST চালুর প্রধান উদ্দেশ্য হল, গোটা দেশজুড়ে পণ্য চলাচলের জন্য অভিন্ন হারে কর ধার্য করা এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভারতে ব্যবসা-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

GST চালুর পর পাঁচ মাস কেটে গেছে, কিন্তু ব্যবসায়ী ও উপভোক্তারা এখনও এই নতুন কর বিধি গ্রহণ করতে গিয়ে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন বলে মনে হয় না। হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া, বেড়ানো প্রভৃতির খরচাপাতি বাড়ায় সব থেকে বেশি প্রভাব পড়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ছোটো ব্যবসাপত্রের ওপর। তাছাড়া দীর্ঘ, জটিল ধোঁয়াশাযুক্ত প্রক্রিয়ার কারণে সমস্যায় পড়েছে নতুন উদ্যোগ, উদ্বেগে ছোটো উদ্যোগপতিরা। যদিও GST পরিষদ অবশ্য অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার নিষ্পত্তির আশ্বাস দিয়েছে।

কিন্তু GST-তে সমস্যাটা ঠিক কোথায়? প্রথমেই বলে রাখা দরকার, GST-র ধারণার মধ্যে কোনও গলদ নেই। বিশ্বজুড়ে এই পদ্ধতি স্বীকৃত। GST পরিষদে অনুমোদিত কিছু সংশোধনী-সহ প্রধানমন্ত্রী সেই সর্বজনমান্যতা প্রাপ্ত পদ্ধতিটিই এদেশে অনুসরণ করেছেন। সমস্যার বীজ সম্ভবত লুকিয়ে রয়েছে এর চতুর্স্তরীয় কর কাঠামোয় (০ শতাংশ, ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৮ শতাংশ ও ২৮ শতাংশ) পণ্য ও পরিষেবার বিন্যাসের মধ্যে।

প্রথমে উপভোক্তা ও তারপর ব্যবসার ওপর এই কর স্তর বিন্যাসের অভিঘাত কতটা কেমন পড়ছে, এই নিবন্ধে মূলত তার তত্ত্বতালাশ করা হয়েছে। বিস্তর বিচার-বিতর্কের পর GST পরিষদ সব পণ্য ও মুখ্য পরিষেবাগুলির ওপর প্রযোজ্য করের হার চূড়ান্ত করেছে, বিবিধ কর ধাপের আওতায়। এতদিন ধরে চলে আসা সাবেক পদ্ধতিতে যে ভুলত্রুটি রয়েছে, তার সংশোধন ঘটিয়ে নতুন এই কর ব্যবস্থা ভারতীয় অর্থনীতির পালে হাওয়া লাগাবে, এমনই আশা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের। এর মূল লক্ষ্য হল, গোটা দেশের সব রাজ্যের পরোক্ষ কর হারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। ০ শতাংশ, ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৮ শতাংশ ও ২৮ শতাংশ হারে বিবিধ পণ্য ও পরিষেবাগুলির উপর GST আরোপ করার পর দেখা যাচ্ছে, পঞ্চাশ শতাংশ পণ্য ও পরিষেবাই পড়েছে ১৮ শতাংশ করের আওতায়।

আর এখানে এসেই GST পরবর্তী জমানায় মানুষের জীবনটা আচমকা পালটে গেছে। কারণ, নিত্যব্যবহার্য কিছু পণ্য ও পরিষেবা পেতে উপভোক্তাকে আগের তুলনায় বেশ বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। পরিসংখ্যান দিয়ে নির্দিষ্ট পণ্য ও পরিষেবা ধরে ধরে এ নিয়ে আর একটু বিশদে বিশ্লেষণ করা যাক।

[লেখক সংবাদ সংস্থা PTI-এর অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। ই-মেল : feedback@ashoktnex@gmail.com]

উপভোক্তাদের উপর প্রভাব

● **জুতো ও জামাকাপড় :** ৫০০ টাকার বেশি দামের জুতোর ওপর GST-র হার রাখা হয়েছে ১৮ শতাংশ। আগে এই হার ছিল ১৪.৪১ শতাংশ। তবে ৫০০ টাকার চেয়ে কম দামের জুতোর ওপর আগের তুলনায় অনেক কমিয়ে GST ধার্য করা হয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ। অর্থাৎ ৫০০ টাকার বেশি দামের জুতো কিনলে আপনার খরচ বাড়বে। রেডিমেড পোশাকের ওপর আগে কর দিতে হ'ত ১৮.১৬ শতাংশ। GST নেওয়া হবে ১২ শতাংশ হারে। অর্থাৎ, পোশাক-আশাক দামে সস্তা হবে। ফ্যাশন সচেতন তরুণ প্রজন্ম তথা বয়স্কদের জন্যও এটা যে খুশির খবর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

● **অনলাইন ট্যাক্সি :** ওলা বা উবেরে এক চক্কর ঘুরে আসা এখন সস্তা হয়ে গেল। অনলাইন ট্যাক্সি বুকিং-এর ওপর কর আগের ৬ শতাংশ থেকে কমে হল ৫ শতাংশ।

● **বিমানের টিকিট :** GST-র আওতায় বিমানের ইকোনমি ক্লাসের টিকিটের ওপর ৫ শতাংশ হারে এবং বিজনেস ক্লাসের টিকিটের ওপর অনেকটা বেশি, ১২ শতাংশ হারে কর ধার্য করা হয়েছে। ফলে বিজনেস ক্লাসের যাত্রীদের তাদের টিকিটের জন্য অনেকটা বেশি অর্থ ব্যয় করতে হবে। কিন্তু ইকোনমি ক্লাসে করের হার কমার দৌলতে যে সাশ্রয় হচ্ছে তার সুফল বিমান সংস্থাগুলির তরফে উড়ান যাত্রীদের দেওয়া হবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

● **ট্রেনের ভাড়া :** ট্রেনের ভাড়ার ক্ষেত্রে অবশ্য GST-র প্রভাব তেমন চোখে পড়ছে না। এখানে করের হার ছিল সাড়ে চার শতাংশ, GST-র দৌলতে তা বেড়ে ৫ শতাংশ হয়েছে। তবে ব্যবসাগত কারণে সফরের জন্য যারা ট্রেনে চেপে থাকেন, তারা টিকিটের মূল্যের ওপর Input Tax Credit দাবি করার অধিকার পাওয়ায় কার্যত তাদের খরচের পরিমাণ কমেছে। লোকাল ট্রেন এবং দূরপাল্লার ট্রেনের স্লিপার ক্লাসের যাত্রীদের টিকিটের দামে কোনও হেরফের হচ্ছে না। তবে, খরচ বেড়েছে ফার্স্ট ক্লাস ও এসি কোচের যাত্রীদের।

● **সিনেমার টিকিট :** ১০০ টাকার কম দামের সিনেমার টিকিটের ওপর ১৮ শতাংশ এবং তার বেশি দামের টিকিটে ২৮ শতাংশ হারে GST চাপানো হয়েছে। এর ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের চলচ্চিত্রপ্রেমীরা, সেখানে সিনেমার টিকিটের গড় দাম ঘোরাফেরা করে ১৭৫ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে। দক্ষিণে, বিশেষত তামিলনাড়ুতে কিন্তু ছবিটা কিছুটা অন্য রকম, কারণ সেখানে জয়ললিতার আমলে আনা আইনবলে সিনেমার টিকিটের সর্বাধিক মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ১২৫ টাকায়। সিনেমার টিকিটের ক্ষেত্রে GST-র সঙ্গে যুক্ত হয় রাজ্য সরকারের ধার্য করা বিভিন্ন স্থানীয় কর, এতে করে সিনেমা দেখাটা বেশ ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দক্ষিণে তামিল ও তেলুগু চলচ্চিত্র শিল্পে সব থেকে বেশি সংখ্যক দ্বিভাষিক সিনেমা তৈরি হয়। সিনেমাপ্রেমীরা মুখ ফিরিয়ে নেবেন এই আশঙ্কায় এই দুই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তরফেই সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির কাছে স্থানীয় কর মকুবের আর্জি জানানো হয়েছে। তবে এ নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

● **জীবন বিমার প্রিমিয়াম :** জীবন বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, সাধারণ বিমা—সবের ক্ষেত্রেই GST-র হার বাড়ানোয় সব ধরনের বিমাই মহার্ঘ হচ্ছে। পলিসিগুলির কিস্তির অঙ্ক বাড়ছে, যার তাৎক্ষণিক প্রভাব চোখে পড়ছে টার্ম পলিসি ও এনডাউনমেন্ট পলিসির কিস্তির উপর।

● **মিউচুয়াল ফান্ডের রিটার্ন :** মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ওপর যে রিটার্ন পাওয়ার কথা, মিউচুয়াল ফান্ডের TER, অর্থাৎ, Total Expense Ratio-র ওপর GST ধার্য হওয়ায় বিনিয়োগকারীর আয়ের ওপর প্রভাব পড়বে। এই করের হার ৩ শতাংশ বাড়তে চলেছে। সংশ্লিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি সেই ব্যয়ভার বহণ না করলে তা যাবে বিনিয়োগকারীর পকেট থেকেই। তবে এই খরচের পরিমাণ খুবই সামান্য বলে জানিয়েছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

● **অলঙ্কার :** সোনাতে লগ্নি এবার সামান্য মহার্ঘ হল। কারণ, সোনার ওপর GST বসলো ৩ শতাংশ হারে এবং গহনা তৈরির মজুরির ওপর ৫ শতাংশ হারে। আগের কর কাঠামোয় বেশিরভাগ রাজ্যে সোনার ওপর ২ শতাংশ হারে কর ধার্য ছিল।

● **সম্পত্তি ক্রয় :** নতুন ব্যবস্থায় নির্মাণকার্য শেষ, পজেশনের জন্য তৈরি এমন সম্পত্তির তুলনায় থেকে নির্মীয়মান সম্পত্তি সস্তা হয়েছে। নির্মীয়মান সম্পত্তির ওপর ১৮ শতাংশ হারে GST বসানো হলেও বিল্ডাররা Input Tax Credit ফেরৎ পাওয়ার সুবাদে বাস্তবে এক্ষেত্রে করের হার ১২ শতাংশের বেশি হবে না বলে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

● **শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা :** শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রকে GST-র আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা উভয়ই GST থেকে ছাড় পেয়েছে। অর্থাৎ, উপভোক্তারা এধরনের পরিষেবা পেতে যে অর্থ ব্যয় করবেন তার উপর আর অতিরিক্ত কোনও কর তাকে দিতে হবে না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি যেসব পণ্য ও পরিষেবা কেনে, তার কোনও কোনওটির ওপর ধার্য করের হার বাড়ায়, সেই অতিরিক্ত করভার তারা গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দিতেই পারেন।

● **হোটেলে থাকার ব্যয়ভার :** হোটেলে থাকাটা এবার থেকে বেশ ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়াবে বলেই মনে হয়। সাধারণত ভালো কোনও তিন তারা থেকে পাঁচ তারা হোটেলের ঘরভাড়া দৈনিক ন্যূনতম ২৫০০ থেকে শুরু করে ১০ হাজার টাকারও বেশি। হোটেলের ঘরভাড়া দৈনিক ১০০০ টাকার কম হলে কোনও GST দিতে হবে না। কিন্তু ভাড়া ৫০০০ টাকার বেশি হলেই GST-র হার দাঁড়াবে ২৮ শতাংশ। এটা সত্যিই বড়ো বেশি। এরপর যারা মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যাবেন, তাদের চন্দ্রিমা কি আর মধুময় থাকবে?

● **গাড়ি কেনা :** হাইব্রিড কার বাদে ভারতীয় বাজারে বিশেষত ছোটো গাড়ি তুলনায় সামান্য সস্তা হতে পারে। কারণ নির্মাতা সংস্থা, ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি, মডেল নির্বিশেষে সব গাড়ির ওপর GST-র হার ২৮ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে কী ধরনের গাড়ি তার ওপর নির্ভর করে ১ শতাংশ, ৩ শতাংশ বা ১৫ শতাংশ হারে অতিরিক্ত সেস চাপবে। সুতরাং, SUV, MUV, সেডান ইত্যাদি সব ধরনের গাড়ির দামই বেশ খানিকটা বাড়বে। ছোটো গাড়ির দামের ক্ষেত্রে কম কর হারের সুফল দেশের বাজারের গাড়ি নির্মাতাদের মধ্যে কতজন বাস্তবে সাধারণ ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহ দেখাবেন, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। এসময় গাড়ি শিল্প যখন মন্দার মধ্যে দিয়ে চলছে, তখন গাড়ির দাম যৎসামান্য কমলেও তা এই শিল্পটিকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

● **মোবাইল ফোনের বিল :** মোবাইলে কথা বলার জন্য এবার থেকে আমজনতাকে বেশি মাশুল গুণতে হবে, কারণ আগেকার ১৫ শতাংশ করের বদলে টেলিকম পরিষেবার ওপর ১৮ শতাংশ হারে GST ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু টেলিকম পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত এয়ারটেল, টাটা, ভোডাফোন, আইডিয়া সেলুলার, রিলায়েন্স জিও-র মতো বড়ো মাপের সংস্থাগুলিও যেহেতু বাজার ধরার জন্য একে অপরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় নেমেছে, সেহেতু বাড়তি এই ৩ শতাংশ করের ধাক্কা তারা গ্রাহকদের ওপর না চাপিয়ে নিজেরাই বহণ করবে বলেই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের অভিমত। বিশেষত রিলায়েন্স জিও আসরে নামার পর, মোবাইল টেলি-পরিষেবার বাজারকে আমূল নাড়িয়ে দিয়েছে।

● **রেস্তোরাঁর বিল/বাইরে খাওয়াদাওয়া :** সপ্তাহের শেষে পরিবারের সবাইকে নিয়ে একদিন বাইরে খাওয়ার রেওয়াজ বজায় রাখতে হলে তার জন্য এবার থেকে বাজেট বাড়াতে হবে। রেস্তোরাঁর বিলের ওপর GST-র হার কত হবে, তা নির্ভর করবে সেটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, না কি মদ পরিবেশন করা হয় না এমন নন-এসি রেস্তোরাঁ, তার ওপর। পাঁচতারা হোটেলের খাবারের বিলের ওপর ১৮ শতাংশ হারে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নয় এমন রেস্তোরাঁর বিলের ওপর ১২ শতাংশ হারে এবং বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে এমন ছোটো হোটেল, ধাবা ও রেস্তোরাঁর খাবারের বিলের ওপর ৫ শতাংশ হারে GST ধার্য করা হয়েছে। [বি.দ্র. : গত ১০ নভেম্বর GST পরিষদ অবশ্য সিদ্ধান্ত নেয় যে এবার থেকে সব রেস্তোরাঁতেই GST-র হার হবে ৫ শতাংশ। বিস্তারিত জানতে এই সংখ্যার 'যোজনা ডায়েরি'-র অর্থনীতি বিভাগটি দেখুন।]

● **IPL এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান ঘটনা :** IPL-এর মতো জনপ্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের টিকিটের ওপর ২৮ শতাংশ হারে GST বসানো হয়েছে। আগে এসব ক্ষেত্রে করের

হার ছিল ২০ শতাংশ। ফলে ক্রিকেট ম্যাচের টিকিটের দাম বাড়বে। তবে থিয়েটার, সার্কাস, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান, লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান বা নাটকের শোয়ের ক্ষেত্রে GST ধার্য হয়েছে ১৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী করের হারের থেকে কম।

● **DTH ও কেবল পরিষেবা :** DTH সংযোগ ও কেবল পরিষেবার মাশুল খরচ সামান্য কমবে। এগুলির ওপর GST-র একটিই নির্দিষ্ট হার, ১৮ শতাংশ। আগে এক্ষেত্রে বিনোদন করের হার ধার্য ছিল ১০ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে, তার সঙ্গে যুক্ত হ'ত ১৫ শতাংশ পরিষেবা কর।

● **বিনোদন পার্ক :** বিনোদন ও থিম পার্কের টিকিটের দাম বাড়তে চলেছে। আগে এর ওপর পরিষেবা করের হার ছিল ১৫ শতাংশ। এখন GST-র আওতায় হার ধার্য হয়েছে ২৮ শতাংশ।

আসুন, এবার কোন পণ্যগুলিকে GST-র আওতা থেকে বিলকুল বাদ দেওয়া হয়েছে সেই তালিকায় চোখ বোলানো যাক। প্রক্রিয়াকৃত নয় এমন দানাশস্য, চাল ও গম ইত্যাদি। প্রক্রিয়াকৃত নয় এমন দুধ, তাজা শাক-সবজি, মাছ, মাংস ইত্যাদি। ব্র্যান্ড নামবিহীন আটা, বেসন, ময়দা, বাচ্চাদের আঁকার বই-খাতা, সিঁদুর, বালা প্রভৃতি। অর্থাৎ, দৈনন্দিন জীবনের এই গুটি কয়েক ক্ষেত্রেই মাত্র GST-র ছাড়ের সুফল পাবে আমজনতা।

কাজেই, বলা যায় উপভোক্তাদের ওপর GST-র ভালোমন্দ মিশিয়ে এক রকম মিশ্র প্রভাব পড়েছে। কিছু পণ্য ও পরিষেবা দামী হয়েছে, কিছু হয়েছে সস্তা। কিন্তু মানুষ যেগুলো করতে খুব ভালোবাসে, যেমন বাইরে কোনও জায়গায় ঘুরতে যাওয়া, ভালো হোটেলে থাকা, মাঝে মধ্যে বাইরে খাওয়াদাওয়া করা—এই সবই আগের তুলনায় বেশ মহার্ঘ হয়ে পড়েছে।

ব্যবসা ক্ষেত্রের উপর প্রভাব

GST প্রচলনের মূল লক্ষ্য হল ভারতকে 'এক জাতি-এক কর ব্যবস্থা-এক বাজার'-এ পরিণত করা। দেশের ব্যবসায়ীদের একাংশ এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের একটা বড়ো মাপের অংশ একে স্বাগত জানিয়েছেন। উৎপাদন শুল্ক, মূল্যযুক্ত কর, পরিষেবা করের মতো প্রায় এক ডজন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি শুল্ক বা করের পরিবর্ত হিসাবে এই নতুন কর চালু হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পের ওপর GST-র প্রভাব কেমন পড়েছে, এবার সেটা দেখে নেওয়া যাক।

● **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প :** নতুন কর ব্যবস্থার যুগে কেন্দ্রীয় GST (CGST) ও রাজ্য GST (SGST)-কে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যার অর্থ, যেসব সংস্থার বার্ষিক টার্নওভার ২০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি (নির্দিষ্ট কয়েকটি রাজ্যে ১০ লক্ষ), তাদের GST-র সব নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। নতুন এই নিয়মের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থাগুলির চলতি মূলধনের (Working Capital) ওপর। তবে আগের জমানায় SME ক্ষেত্রে ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা ছিল মাত্র ৫ লক্ষ টাকা। এখন এই ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা (নির্দিষ্ট কয়েকটি রাজ্যে ১০ লক্ষ) করায় তার কিছু ইতিবাচক প্রভাবও পড়বে এই ক্ষেত্রের ওপর।

এছাড়া দেশে ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক দ্বৈত করের বিলোপসাধন, নতুন ব্যবসার ওপর করের বোঝা হ্রাস, দ্রুত পরিষেবা জোগানো ও মালপত্র পরিবহণের ক্ষেত্রে উন্নতি প্রভৃতি নয়া বলবৎ হওয়া GST কর ব্যবস্থার অন্যতম কয়েকটি ইতিবাচক অবদান।

● **রিয়েল এস্টেট শিল্পক্ষেত্র :** রিয়েল এস্টেট এমন একটি প্রধান শিল্পক্ষেত্র, যেখানে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়। নতুন এই GST ব্যবস্থায় সব নির্মীয়মান বাড়ি ও সম্পত্তির ওপর সম্পত্তির মূল্যের ১২ শতাংশ GST ধার্য করা হয়েছে (স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ ছাড়া)। তবে মনে রাখতে হবে, সম্পূর্ণ তৈরি পজেশন নেওয়ার উপযুক্ত বাড়ি ও ইতোমধ্যেই সমাপ্ত আবাসন প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে এই ১২ শতাংশ করের হার প্রযোজ্য হবে না। যেমন, কিনা নির্মীয়মান বাড়ির বিক্রয়ের ওপর সেভাবে কোনও পরোক্ষ করই ধার্য হয় না। অসম্পূর্ণ আবাসন প্রকল্প ও নির্মীয়মান প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ ক্রেতাকে বহণ করতে হয়।

নির্মীয়মান বাড়ি ও প্রকল্পের ওপর ১২ শতাংশ হারে GST ধার্য করা হয়েছে। আগে করের হার ছিল ৬.৫ শতাংশ। রিয়েল এস্টেটের ওপর GST-র হার আসলে ১৮ শতাংশ। ডেভেলপার বিল্ডিংয়ের মোট যে দাম নির্দিষ্ট করবে, তার এক-তৃতীয়াংশ কর জমির মূল্য থেকে বাদ দিতে হবে। GST-র আওতায় ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার সংস্থান রয়েছে, তবে তা নির্মাণকার্য শেষ হয়ে যাওয়া প্রকল্পের ক্ষেত্রে মিলবে না। GST-র দৌলতে এই উচ্চ কর ভারের বোঝা হয় ডেভেলপার বহণ করবে অথবা তা তিনি ক্রেতাদের ওপর চাপিয়ে দিতেও পারেন। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্র, প্রকল্পের বা বাড়ির দাম বেশ খানিকটা বেড়ে যাবে।

● **গাড়ি শিল্পের ওপর প্রভাব :** GST-র ফলে যেসব শিল্প সব থেকে বেশি লাভবান হয়েছে, তার অন্যতম হল গাড়ি শিল্প। রোড ট্যাক্স, উৎপাদন শুল্ক, বিক্রয় কর, মূল্যযুক্ত কর, মোটর ভেহিকেল ট্যাক্স, রেজিস্ট্রেশন ডিউটি—এই যাবতীয় কর উঠে গিয়ে এক্ষেত্রে এসেছে একটিমাত্র নির্দিষ্ট হারের কর—GST। তবে বিভিন্ন রাজ্য এখনও বাস-বাইক-গাড়ির ওপর করের বিভিন্ন হার ও ছাড় উৎপাদকদের বা গাড়ির ডিলারদের না জানানোয় কিছুটা বিভ্রান্তির অবকাশ রয়ে গেছে। সম্প্রতি GST পরিষদ মাঝারি মাপের, হাইব্রিড ও বিলাসবহুল গাড়ির ওপর সেস ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করেছে। মোটর ভেহিকেলস

আইনের একটি নতুন ধারা মোতাবেক যেসব গাড়ি ১৩ জন পর্যন্ত যাত্রী বহণে সক্ষম, সেগুলির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ সেস লাগবে। গাড়ির ওপর ধার্য করা হয়েছে সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ GST। করের হার পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন গাড়ি শিল্প ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা।

উপসংহার

কিছু সংশোধনী-সহ GST দীর্ঘমেয়াদে থেকে যাবে, বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। GST-র জেরে কিছু পণ্য ও পরিষেবা আরও দামি হয়েছে, কিছু হয়েছে সস্তা। এরই মধ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ব্যবসা-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সূচকে ভারত একলাফে ৩০ ধাপ উঠে এসেছে। তালিকার ১৩০তম স্থান থেকে ভারতের এখন ঠাঁই হয়েছে ১০০তম স্থানে। সব থেকে বড়ো সুখবরটা হল, এই নিবন্ধ লেখার সময়ে দিল্লিতে GST পরিষদ বৈঠকে বসে ১৭৮-টিরও বেশি পণ্যের উপর GST-র হার কমাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সংশোধনের সুপারিশকারী মন্ত্রিগোষ্ঠীর প্রধান, অসমের অর্থমন্ত্রী বলেছেন, তাদের ধারাবহিক প্রয়াস থাকবে যত বেশি সম্ভব পণ্য ও পরিষেবাকে সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ করের আওতা থেকে বের করে আনার। সরকার GST চালু করার ফলে ভারতীয় কর কাঠামো বিশ্বমানের সমপর্যায়ের হয়ে উঠেছে এবং দেশে অভূতপূর্ব ব্যবসা-অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক, চুঙ্গি কর ইত্যাদি হাজারটা করের বদলে এই একটিমাত্র নির্দিষ্ট হারের কর বলবৎ থাকায় সারা দেশের কর কাঠামোয় সামঞ্জস্য এসেছে, সুগম হয়েছে গোটা দেশজুড়ে পণ্য চলাচল। দেশ ও বাণিজ্য জগতের ওপর GST-র দীর্ঘমেয়াদি সুফল অপরিসীম।❑

ক্রেতা অভিযোগ ফয়সালা : বিধিবদ্ধ আইনি সংস্থান

বি. সি. গুপ্ত

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংশোধিত নীতিনির্দেশিকায় উল্লিখিত ন্যায্য, স্বচ্ছ, দ্রুত ও কম খরচে ক্রেতা অভিযোগ সুরাহার লক্ষ্যপূরণে নালিশ মীমাংসার বিকল্প ব্যবস্থার জন্য ভারতে পর্যাপ্ত বিধিবদ্ধ আইনি সংস্থান আছে। এই ব্যবস্থা মারফত ক্রেতা অভিযোগ মেটানোর জন্য একটি রূপায়ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি।

এতে উপকার হবে দূরদূরান্ত ও দুর্গম এলাকা-সহ দেশের সব অঞ্চল এবং সমাজের সব শ্রেণির লোকের।

সম্প্রতি সাধারণ পরিষদের দ্বারা পরিমার্জিত ক্রেতা সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি-নির্দেশিকায় সদস্য দেশ-গুলিকে ন্যায্য, সাধ্যায়ত্ত ও দ্রুত অভিযোগ মীমাংসার লক্ষ্যে ক্রেতা সুরক্ষার নীতি বানাতে বলা হয়েছে। এসব নীতিনির্দেশিকা গৃহীত হওয়ার ফলে আত্মবিশ্লেষণের এক প্রক্রিয়া গতি পেয়েছে। বর্তমানে অনুসৃত পদ্ধতিগুলি ভালো করে খতিয়ে দেখা এবং খুব সাধারণ ও দেশের দূরদূরান্ত অঞ্চলের ক্রেতাদের নাগালে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রূপায়ণ করার উপায় উদ্ভাবন এর উদ্দেশ্য।

সাধারণ পরিষদ ৩৯/২৪৮ নং প্রস্তাব মারফত প্রথম এই নীতিনির্দেশিকা গ্রহণ করেছিল ১৯৮৫-র ১৬ এপ্রিল। ১৯৯৯-এর ২৬ জুলাই-এর প্রস্তাবের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এর কলেবর বাড়িয়ে দেয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নীতিনির্দেশিকায় আছে :

"ঙ। প্রতিকার পেতে ক্রেতাকে সক্ষম করার ব্যবস্থা

৩২। সত্বর, ন্যায্য ও সুলভে প্রতিকার পেতে ক্রেতা বা উপযুক্ত সংগঠনকে সক্ষম করতে সরকারগুলির উচিত আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে আইনি এবং/বা প্রশাসনিক ব্যবস্থাদির পত্তন করা বা বজায় রাখা। এসব পদ্ধতিতে কম আয়ের ক্রেতাদের চাহিদার দিকটিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই।"

২০১৫-র ২২ ডিসেম্বরের ৭০/১৮৬ নং প্রস্তাব মারফত সাধারণ পরিষদের সাম্প্রতিক সংশোধিত নীতিনির্দেশিকায় আছে :

১১। চ। **ক্রেতার অভিযোগ**

ব্যবসা সংস্থার উচিত অনাবশ্যক খরচপাতি বা বোঝা ছাড়াই ক্রেতার জন্য ত্বরিত, ফলপ্রদ, স্বচ্ছ, ন্যায্য ফয়সালার ব্যবস্থা করা। বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি পরিষেবা, ক্রেতা সন্তুষ্টি ব্যবস্থাদির বিষয়ে দেশ ও বিদেশের স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলার দিকটি ব্যবসা সংস্থাকে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

১৪। সদস্য রাষ্ট্রগুলির উচিত এমন ক্রেতা সুরক্ষা নীতির পত্তন করা যা উৎসাহ দেয় :

(ছ) ন্যায্য, সাধ্যায়ত্ত ও দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি;.....

চ। বিবাদ মীমাংসা

৩৭। সদস্য রাষ্ট্রগুলির উচিত প্রশাসনিক, বিচারবিভাগীয় ও বিকল্প অভিযোগ ফয়সালা পদ্ধতি মারফত ক্রেতার নালিশ সমাধানে ন্যায্য, কার্যকর, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থা বিকাশে উৎসাহ দেওয়া। আন্তঃসীমান্ত কেসগুলির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। সদস্য দেশগুলিকে দ্রুত, ন্যায্য, স্বচ্ছ, কম খরচসাপেক্ষ ও সহজে নাগাল পাওয়া সম্ভব এমন পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রেতা বা উপযুক্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে তাদের অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য আইনি এবং/বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা পত্তন বা বজায় রাখতে হবে। এসব পদ্ধতিতে কমজোর ও অসুবিধাগ্রস্ত ক্রেতাদের চাহিদার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া চাই।

ক্রেতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

৩। দেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট দরকারের কথা ভেবে সদস্য রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা

[লেখক সদস্য, জাতীয় ক্রেতা অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিশন। ই-মেল : bcgupta2000@yahoo.com]

গ্রহণের দিকটিও স্বীকার করে নিয়ে "ক্রেতা" বলতে সাধারণভাবে বোঝায় কোনও স্বাভাবিক ব্যক্তিকে যে মূলত ব্যক্তিগত, পারিবারিক প্রয়োজনে কাজ করছে, সে ব্যক্তির নাগরিকতা যাই হোক না কেন।

১৯৮৫-এ সাধারণ পরিষদ রাষ্ট্রসঙ্ঘের ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতিনির্দেশিকা গ্রহণের পর, ভারতে ১৯৮৭-র ১৫ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয় ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬-র ৬৮ নং আইন)। এই আইনে জেলা, রাজ্য ও জাতীয়—এই তিন স্তরে ক্রেতার অভিযোগ মেটানোর ব্যবস্থা আছে। জেলা ক্রেতা আদালতের প্রধান হন জেলা বিচারকের সম পদমর্যাদার বিচারবিভাগীয় আধিকারিক। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রাজ্য কমিশনের শীর্ষে থাকেন হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। আর জাতীয় কমিশনের প্রধান হন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি। এসব আদালত/কমিশন বেশ ভালো কাজ করেছে। জমা পড়া অভিযোগের ৯০ শতাংশের বেশি নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে বহুকাল যাবৎ চলে আসা পদ্ধতিগত ঢিলেমি, পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবের মতো হরেক কারণে বহু কেস মিটতে সময় লেগেছে অনেক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, দেওয়ানি মামলার মতোই ক্রেতার অভিযোগ পেশ করেছেন আইনজীবীরা। গাদাগুচ্ছের সাক্ষী ও নথিপত্রের ঠেলায় টাকাকড়ি ও সময়ের দফারফা। রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি, দু' ক্ষেত্রেই ট্যাঁকের জোর থাকায় পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদক/ জোগানদার মামলা বহু দিন ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা চালায়। ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয় গরিব, হতভাগ্য ক্রেতা। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, সময়, অর্থ, ভোগান্তির কথা ভেবে ক্রেতারা সহজে আদালত বা কমিশন মুখো হতে চায় না। আইনজীবীর সাহায্য ছাড়াই মামলা রুজু করতে কোনও বাধা নেই। তবে টাকার জোর থাকায় ব্যবসায়ী শ্রেণি তাদের হয়ে আইনজীবী খাড়া করে। পেশাদার আইনজ্ঞের তুখোড় সওয়ালের সামনে সাধারণ ক্রেতা হাবুডুবু খায়। শুধু কি তাই, গতবাঁধা জগদ্দল সামলে রায় স্বপক্ষে এলেও স্বস্তি কৈ! প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী শ্রেণির টালবাহানার জন্য রায় কার্যকর করতে ফের ছুটতে হয় উপযুক্ত আদালতে। মোটের উপর, বিধিবদ্ধ আদালতের পথ মাড়াতে চায় না অধিকাংশ ক্রেতাই। এজন্য বড়ো শহর থেকে দূরের জেলা ক্রেতা আদালতে ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা হাতে গোনা যায় (খুব বেশি হলে ১০০ বা ২০০)। অথচ এমন আদালতের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে খরচ হয় মোটা অঙ্কের টাকা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংশোধিত নীতিনির্দেশিকায় উল্লিখিত বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তির মোদ্দা কথা হল, সালিশি, মধ্যস্থতা ইত্যাদির মাধ্যমে আদালতের বাইরে মীমাংসা করা।

অভিযোগের দ্রুত, ন্যায্য ও স্বচ্ছ নিষ্পত্তি এর মূল উদ্দেশ্য। ভারতে দেওয়ানি পদ্ধতি বিধি ও আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৭-র ৮৯ ধারায় বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা আছে ইতোমধ্যেই।

দেওয়ানি পদ্ধতি বিধি ১৯০৮ (১৯০৮-র ৫ নং আইন)-এ ৮৯ ধারাটি ঢোকানো হয় ১৯৯৯-এর সংশোধিত আইন মারফত। মলিমথ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক এই বিধান কার্যকর হয় পয়লা আগস্ট, ২০০২ থেকে।

● ৮৯ নং ধারা : আদালতের বাইরে মীমাংসা :

১। আদালতের যদি মনে হয় নিষ্পত্তির সম্ভাবনা আছে এবং তা পক্ষগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তাহলে আদালত মীমাংসার শর্তাবলি ঠিক করে পক্ষগুলিকে তা খতিয়ে দেখার জন্য দেবে এবং তাদের মতামত জানার পর, সম্ভাব্য মীমাংসার শর্ত প্রণয়ন করে তা পাঠাবে :

(ক) সালিশিতে

(খ) মিটমাটের জন্য

(গ) লোক আদালত-সহ বিচারবিভাগীয় মীমাংসায়

(ঘ) মধ্যস্থতার উদ্দেশ্যে

২। অভিযোগ :

(ক) সালিশির জন্য পাঠানো হলে, সালিশি ও মীমাংসা আইন ১৯৯৬-এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

(খ) লোক আদালতে পাঠালে, আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৭-র ধারা ২০-র উপ-ধারা (১)-এর বিধান অনুসারে ফয়সালা হবে।

(গ) বিচার বিভাগীয় নিষ্পত্তির জন্য, আদালত তা কোনও উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে পাঠালে, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লোক আদালত প্রতিম গণ্য হবে এবং আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৭-এর

যাবতীয় বিধি প্রযুক্ত হবে, ধরা হবে বিবাদটি ওই আইনের সংস্থানমাফিক লোক আদালতে পাঠানো হয়েছে।

(ঘ) মধ্যস্থতার জন্য, আদালত পক্ষগুলির মধ্যে আপসের চেষ্টা চালাবে।

● আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৭ :

১৯৯৫-এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারি আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৭-এ লোক আদালত মাঝে মাঝে বসাতে বলা হয়েছে। কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিক এবং সমাজকর্মী ও মহিলাদের প্রতিনিধি-সহ অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গড়া হয় এই আদালত। আদালতে ঝুলে থাকা বা আদালতে মামলা রুজুর সম্ভাবনা আছে এমন কেসগুলি আদালত পাঠাতে পারে লোক আদালতের কাছে। ন্যায়বিচার, সমতা ও সততার নীতি অনুসরণ করে বিবাদমান পক্ষগুলির মধ্যে আপস বা মীমাংসার সূত্রে অভিযোগ ফয়সালার চেষ্টা করবে লোক আদালত। আইনে বিভিন্ন জনহিতকর পরিষেবার ব্যাপারে স্থায়ী লোক আদালত গড়ার সংস্থান আছে। আইনটির ২১ নং ধারা মাফিক লোক আদালতের রোয়েদাদ দেওয়ানি আদালতের রায় রূপে গণ্য এবং তার বিরুদ্ধে আপিল করা চলে না। বিবাদমান পক্ষগুলি তা মেনে চলতে বাধ্য। লোক আদালতে দায়ের করা মামলাকে বিচার বিভাগীয় আদালতে রুজু করার মামলার সমতুল বলে ধরতে হবে। সাক্ষ্য নেওয়া, নথিপত্র পেশ এবং এমনকি সরকারি রেকর্ড বা নথিপত্র চেয়ে পাঠানোর ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে লোক আদালতকে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট, লোক আদালত মারফত পক্ষগুলি একবার কোনও সমাধানে পৌঁছলে সেটাই চূড়ান্ত বিচার। রোয়েদাদ রূপায়ণ অথবা আপিল,

পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা ইত্যাদি কার্যকর করার জন্য কোনও আবেদন পেশের দরকার নেই। ফলে দ্রুত, কম খরচসাপেক্ষ বিচারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য যথাযথ অর্জন করা গেছে। আইনে এটাও বলা হয়েছে, লোক আদালত অভিযোগ ফয়সালায় ব্যর্থ হলে, মামলাটি প্রথাগত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচারের জন্য যথাযথ অধিক্ষেত্রের আদালতে ফিরে যাবে।

আইনে আছে যে, বিধিবদ্ধ আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের আওতায় গঠিত জাতীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরের ফোরামের অধীনে এসব লোক আদালতের আয়োজন করতে হবে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হচ্ছে জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে এর নেতৃত্ব দেন সুপ্রিম কোর্টের কোনও বিচারপতি বা প্রাক্তন বিচারপতি। থাকেন কিছু মনোনীত সদস্য। রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের মাথায় বসেন হাইকোর্টের বিচারপতি বা প্রাক্তন বিচারপতি। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এর পৃষ্ঠপোষক। জেলা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জেলা ও সেশন বিচারক। জেলা কর্তৃপক্ষে থাকেন কিছু সদস্যও। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট ও তালুক স্তরে আইনি পরিষেবা কমিটি গঠনেরও সংস্থান আছে।

দেওয়ানি পদ্ধতি বিধির ৮৯ ধারার আওতাধীন পদ্ধতির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে বহু রিট পিটিশন জমা পড়েছে। দু'টি পৃথক ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের তিন সদস্যের বেঞ্চ রায় দিয়েছে, ৮৯ ধারা বাধ্যতামূলক। এই রায় দেওয়া হয় "সালেম অ্যাডভোকেটস বার অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারত যুক্তরাষ্ট্র [(২০০৩) ১ সুপ্রিম কোর্ট কেস ৪৯]" এবং এর পর ফের "সালেম অ্যাডভোকেটস বার অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারত যুক্তরাষ্ট্র [(২০০৫) ৬ সুপ্রিম কোর্ট কেস সি সি ৩৪৪]" মামলায়। "AF Cons Infrastructure Ltd. & Ann Vs. Cherian Varkey Construction Co. (P) Ltd & Ors. [২০১০(৪) সুপ্রিম কোর্ট কেস ২৪]" মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে "নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিকল্প অভিযোগ ফয়সালা বাধ্যতামূলক :

"বিকল্প অভিযোগ ফয়সালা প্রক্রিয়ার জন্য সাধারণত উপযোগী কেস :

ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী/উৎপাদক/পরিষেবা প্রদানকারী তার ব্যবসা/পেশাগত সুনাম ও বিশ্বাসযোগ্যতা বা পণ্যের জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে আগ্রহী এহেন বিতর্ক-সহ যাবতীয় ক্রেতা অভিযোগ"।

চিকিৎসা গাফিলতির মোকদ্দমা ২৩ বছর ধরে চলার পর সুপ্রিম কোর্ট ৩০-৮-২০১৭-এ "Bijoy Sinha Roy (d) by LR. Vs. Biswanath Das & Ors." [দেওয়ানি আপিল নং ৪৭৬১-৬৩/২০০৯]-এ বলেছে,

১৬। রায় দেওয়ার আগে, ক্রেতা ফোরামের ন্যায়বিচারের প্রশাসন সংক্রান্ত আর এক গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ করা অবশ্যক। পরিষেবায় ত্রুটিবিচ্যুতির অভিযোগ নিয়ে ক্রেতা আদালতে আসা ব্যক্তি চায় জলদি সমাধান। ক্রেতা ফোরাম গঠনের উদ্দেশ্যই ছিল ক্রেতার অভিযোগের দ্রুত মীমাংসা। দুনিয়াব্যাপী ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনের পটভূমিতে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ আনা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৮৫-র ৯ এপ্রিলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই আইনের কাঠামো তৈরি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবে ভারত অন্যতম শরিক। আইনটি সত্বর সত্বর অভিযোগ ফয়সালার মাধ্যমে ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। অন্য কোনও আইন খর্ব করা নয়, এই আইনের সংস্থানগুলি সংযোজনমূলক। সোজা কথায়, আইনটি বাড়তি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করে। এ আইনের আওতাধীন কর্তৃপক্ষগুলি আধা-বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষতিপূরণ রায়ের লক্ষ্য হচ্ছে পরিষেবা প্রদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গুণগত পরিবর্তন আনা।

১৭। উপরে বর্ণিত আইনের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে শুনানিকালে ক্রেতা ফোরামে এই ইস্যুগুলি উঠে আসে :

(১) দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তির দিকে নজর দেওয়া চাই।

(২) বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তির সুযোগ পাওয়া দরকার।

১৮। ক্রেতার অভিযোগ দ্রুত মেটানোর লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইনটির ২৪খ ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সব রাজ্য কমিশনের উপর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব আছে জাতীয় কমিশনের। দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তাই জাতীয় কমিশন নজরদারি ব্যবস্থা চালু করার ক্ষমতা রাখে। বিভিন্ন স্তরের ক্রেতা ফোরামে ফয়সালার অপেক্ষায় আবেদন ঝুলে থাকে বহুদিন। এতে আইনের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিরর্থক হয়ে পড়ে। এ দিকটি বিবেচনা করে

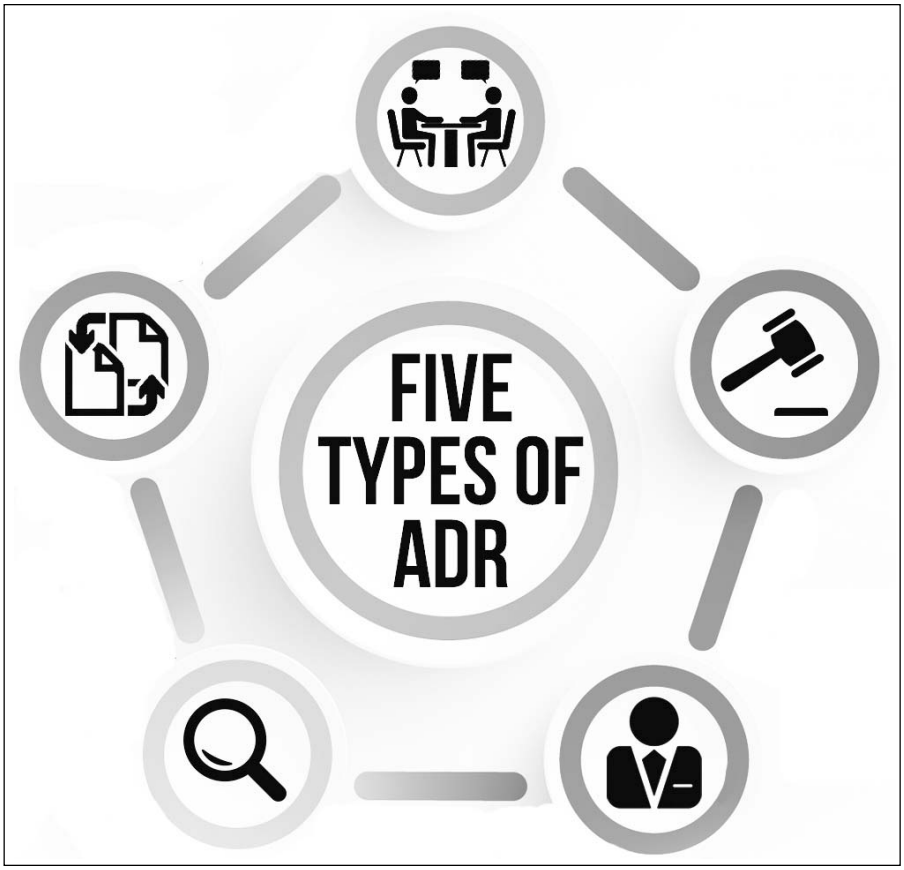

দেখতে ও উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য আমরা অনুরোধ জানাই জাতীয় কমিশনকে। এক্ষেত্রে হুসেন বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য [(২০১৭) ৫ সুপ্রিম কোর্ট কেস ৭০২ পরিচ্ছেদ ২২] মামলাটির সাম্প্রতিক রায়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে জাতীয় কমিশন বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্যের জন্য ভিডিও কনফারেন্স-এর কথাও বিবেচনা করে দেখতে পারে।

১৯। অন্য দিকটি হচ্ছে নিবন্ধ অভিযোগ ফয়সালার ব্যবহারের বিষয়ে। আদালতের বাইরে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থা বাতলাতে দেওয়ানি মামলা সংহিতায় জোড়া হয়েছে ৮৯ নং ধারা। শুধুমাত্র দেওয়ানি আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও, ক্রেতা ফোরামেও তা না হওয়ার কোনও হেতু নেই। তাই, আমাদের মতে ক্রেতা ফোরামগুলির উচিত ওই বিধান কাজে লাগানো। এ ব্যাপারে যথাযথ নির্দেশ জারি করতে আমরা অনুরোধ জানাই জাতীয় কমিশনকে।

২০। আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৭ অনুসারে, জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রাখতে পারে জাতীয় কমিসন ও রাজ্য কমিশন।

অগ্রগতির পথ

উপরের লেখা থেকে বোঝা যায়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংশোধিত নীতিনির্দেশিকায় উল্লিখিত ন্যায্য, স্বচ্ছ, দ্রুত ও কম খরচে ক্রেতা অভিযোগ সুরাহার লক্ষ্যপূরণে নালিশ মীমাংসার বিকল্প ব্যবস্থার জন্য ভারতে পর্যাপ্ত বিধিবদ্ধ আইনি সংস্থান আছে। এই ব্যবস্থা মারফত ক্রেতা অভিযোগ মেটানোর জন্য একটি রূপায়ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি।

এটা খুব ভালো ব্যাপার যে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইনের আওতায় লোক আদালতের অনুরূপ হচ্ছে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ মাফিক জেলা ক্রেতা আদালত। জেলা ক্রেতা আদালতের শীর্ষে থাকেন একজন বিচার বিভাগীয় আধিকারিক। অন্য দুই সদস্যের মধ্যে একজন মহিলা। লোক আদালত রূপে কাজ করতে উপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণের জন্য জেলা ক্রেতা আদালতকে তাই লোক আদালত হিসেবে

ঘোষণা করতে পারে জাতীয়/রাজ্য/জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ।

লোক আদালতের ব্যবস্থা নিয়ে তাদের কাছে কিছু বক্তব্য পেশের পর, ২০০৫-এর আগস্টে জাতীয় কমিশন প্রতি সপ্তাহের শেষ কাজের দিনে জেলা ক্রেতা আদালত/রাজ্য কমিশনকে লোক আদালত বসানোর নির্দেশ জারি করে। নির্দেশে বলা হয়, এক বা দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভিযোগের শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে, এবং তাদের উপস্থিতিতে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা যায়। এসব নির্দেশ অনুসরণ করে জেলা ক্রেতা আদালত/রাজ্য কমিশনের প্রচেষ্টার উপর প্রতিনিয়ত নজর রাখা দরকার।

২০০৭-এর জুলাই, লোক আদালত মারফত শ্রম বিরোধ মীমাংসার জন্য বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নিয়ে অনুরূপ বক্তব্য জানানো হয় ইতালির টুরিনে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং সেন্টার অব দ্য ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন-এ। দিল্লিতে আঙ্কটাডের সদ্যসমাপ্ত ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত আঞ্চলিক সম্মেলন, "নতুন বাজারে ক্রেতা ক্ষমতায়ন"-এ সংশোধিত নীতি-নির্দেশিকা রূপায়ণের হালহকিকত খতিয়ে দেখা হয়। সেখানেও বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতির ব্যবহার নিয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। দ্রুত ও কম খরচসাপেক্ষ ক্রেতা অভিযোগ মীমাংসার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ক্রেতা অভিযোগ নিষ্পত্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এখন উচিত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে, সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা কার্যকর করা। আইনে ইতোপূর্বে উল্লিখিত সংস্থান মাফিক, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও একাজে সামিল করা উচিত।

বৈদ্যুতিন-বাণিজ্য ও বৈদ্যুতিন বিশ্বের যুগে, বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি ব্যবহার করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শ আড়াই-এর মতো ক্রেতাগোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, কনজিউমার্স ইন্টারন্যাশনাল ২০০৮ সালকে বৈদ্যুতিন-বাণিজ্য বছর হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহযোগী এই প্রতিষ্ঠানের ২০১৭-র থিম হল 'উন্নততর বৈদ্যুতিন বিশ্ব'।

ব্রিটেনে পয়লা অক্টোবর, ২০১৫ থেকে কার্যকর হয় নতুন ক্রেতা অধিকার আইন, ২০১৫। পণ্য এবং পরিষেবা ছাড়াও, এই আইনে আন্তর্ভুক্ত হয়েছে তৃতীয় বড়ো ক্যাটিগরি 'বৈদ্যুতিন পণ্য'। দ্রুত বিবাদ মীমাংসা, বিশেষত আন্তঃসীমান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে তাই অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি গ্রহণের এটাই উপযুক্ত সময়। ভারত এ ব্যাপারে নড়েচড়ে বসেছে। ন্যাশনাল স্কুল অব ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্গালোর ইতোমধ্যে খুলেছে এক অনলাইন মধ্যস্থতা কেন্দ্র (অনলাইন মিডিয়েশন সেন্টার)।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতিনির্দেশিকায় বর্ণিত লক্ষ্যের বাস্তব রূপ দিতে তাই বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি/অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বিস্তারে দ্রুত পদক্ষেপ করা দরকার। এতে উপকার হবে দূরদূরান্ত ও দুর্গম এলাকা-সহ দেশের সব অঞ্চল এবং সমাজের সব শ্রেণির লোকের।❑

প্রসঙ্গ আর্থিক পরিষেবা উপভোক্তার স্বার্থরক্ষা

জি. সুন্দরম

আজকের দিনের আর্থিক পরিষেবা শিল্পক্ষেত্র তার বিবিধ পণ্য ও পরিষেবা-সহ ব্যক্তিবিশেষ ও কোম্পানিগুলির টাকাপয়সার দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে। গরিব মানুষজনকে দারিদ্র্যের কবল থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা দেখাচ্ছে আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্র, আর বিত্তবান শ্রেণির সামনে সুযোগ করে দিচ্ছে তাদের টাকাকে বাজারে খাটিয়ে আরও বেশি অর্থ উপার্জনের। কিন্তু আমার অভিমত, এর গোটাটাই নির্ভর করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির সুবিধা-সহ উপভোক্তা সুরক্ষার বন্দোবস্ত বর্তমান থাকার উপর।

উপভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের একগুচ্ছ মূল্যবান নীতিনির্দেশিকা রয়েছে। কার্যকর ক্রেতা তথা উপভোক্তা সুরক্ষা আইনবিধি, যেসব প্রতিষ্ঠান এই আইনগুলি বলবৎ করার সঙ্গে জড়িত এবং অবশ্যই প্রতারিত বা ভুক্তভোগী উপভোক্তার অভিযোগর প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্র এই বিষয়গুলিই মূলত ঠাঁই পেয়েছে উল্লিখিত নীতিনির্দেশিকাসমূহে। ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে সাধারণ পরিষদ ৩৯/২৪৮ নং প্রস্তাব মারফৎ এই নীতিনির্দেশিকা প্রথম গ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে ১৯৯৯/৭ নং প্রস্তাব মারফৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এই নীতিনির্দেশিকার কলেবর বৃদ্ধি করে। আর ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ৭০/১৮৬ নং প্রস্তাব মারফৎ সাধারণ পরিষদ এই নির্দেশিকার সংশোধিত সংস্করণ গ্রহণ করে।

২০১৫ সালের এই সাম্প্রতিকতম নির্দেশিকাতেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রথমবারের জন্য আর্থিক পরিষেবা বিষয়ক একটি অধ্যায় শামিল করে। এতে ন্যায়সঙ্গত শর্ত আরোপ (fair treatment) এবং সঠিক তথ্য প্রকাশ (proper disclosure), ঋণদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা প্রদর্শন (responsible lending), অপব্যবহার ও প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছতা বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। আর্থিক পরিষেবায় মানুষকে শামিল করা, এই পরিষেবার নাগাল পাওয়া ও তা ব্যবহারের সময় উপভোক্তার স্বার্থ সুরক্ষা, তথা আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার বিষয়ক সংহত উপভোক্তা নীতি প্রণয়ন ও তা বলবৎ করতে উদ্যোগ নেওয়ার সুপারিশও করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা ও উপভোক্তাদের উপর তার নেতিবাচক প্রভাবের সূত্রেই OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)/জি ২০ গোষ্ঠী বিগত ২০১১ সালে আর্থিক উপভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষা সংক্রান্ত উচ্চ স্তরীয় নীতিনিয়ম উদ্ভাবনে উদ্যোগী হয়। "সুষ্ঠু আর্থিক পরিষেবা প্রদানে সক্ষম বাজারের প্রতি উপভোক্তার অগাধ ভরসা ও আস্থা আখেরে দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক পরিষেবার স্থায়িত্ব, বৃদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও উদ্ভাবনার পরিসর বাড়ায় এবং (সাম্প্রতিক) আর্থিক সঙ্কট উপভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষার উপর নতুন করে নজর দেওয়ার জায়গা তৈরি করেছে" বলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ স্বীকার করে নিয়েছে। তবে, আর্থিক সঙ্কট থাকুক বা না থাকুক, যে কোনও পরিস্থিতিতেই সরকার ও অ-সরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে উপভোক্তা স্বার্থরক্ষায় আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই প্রেক্ষিতেই, আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের শামিল করা ও তাদের ক্ষমতায়ন জরুরি। আর উপভোক্তাদের ক্ষমতায়নের কাজে সাফল্য পাওয়া যাবে তখনই, যখন কি না তারা কী তাদের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সে বিষয়ে সম্যক অবগত থাকবে এবং সেজন্য দাবি জানাতে সক্ষম হবে।

উপভোক্তাদের শিক্ষিত তথা সচেতন করে তোলা এবং বাজারে ব্যবসায়ী ও উপভোক্তা,

[লেখক ভারত সরকারের ক্রেতা বিষয়ক মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব এবং "ভয়েস সোসাইটি"-র চেয়ারম্যান। ই-মেল : drgsundaram@yahoo.com]

এই উভয় পক্ষের মধ্যে তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকার নিরিখে যে দুস্তর ফারাক চোখে পড়ে, তার মধ্যে সামঞ্জস্য নিয়ে আসাটাই সম্ভবত অধিকাংশ উপভোক্তা স্বার্থসুরক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে শীর্ষ অগ্রাধিকার। এটা বলা অনেক সহজ বটে, কিন্তু করাটা বেশ কঠিন। উপভোক্তাদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হলে সে কাজে একাধিক পক্ষকে (stakeholders) শামিল হয়ে হাত লাগাতে হতে হবে। উপভোক্তা সুরক্ষা ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও উপভোক্তা সংগঠন, শিক্ষাজগৎ ও গণমাধ্যম এর মধ্যে পড়ছে। এখানে আমরা বিশেষভাবে ধর্তব্যের আওতায় আনব সাম্প্রতিককালের বৈদ্যুতিন বাণিজ্য বা ই-কমার্স এবং ডিজিটাল বিপ্লবকে। এই সংক্রান্ত আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রটি আরও বেশি জটিল। উপভোক্তারাও তাই নিত্যনতুন জটিল থেকে জটিলতর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। প্রতিদিন তার উপর, এমন কি ই-মেলের মাধ্যমেও ঝাঁকে ঝাঁকে অফারের বর্ষণ হয়ে চলে, যার বিন্দুবিসর্গও সে বুঝে উঠতে পারে না। ভারতে ১৯৮৬ সাল থেকেই ক্রেতা সুরক্ষা আইন চালু আছে। এখানেই প্রশ্নটি উঠে আসে, তারপরও কি আলাদা করে আর্থিক পরিষেবার জন্য কোনও উপভোক্তা আইনের দরকার আছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক পৃথক বিধির সংস্থান অবশ্যই আছে। কিন্তু ক্রেতাসাধারণের জন্য তা বাস্তবে কতটা কার্যকর সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

উপভোক্তাদের স্বার্থ যাতে আরও ভালোমতো রক্ষিত হয়, সেজন্য চালু ক্রেতা সুরক্ষা আইনকে সংশোধন করে আরও বেশি সংহত রূপ দেওয়া হবে। আর্থিক পরিষেবা একটি অতি জটিল ক্ষেত্র। এই ময়দানে রকমারি খেলুড়ের সাক্ষাৎ মেলে। এই ক্ষেত্রে মোট পরিসম্পদের ৬৪ শতাংশ ব্যাঙ্কগুলিই একাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এছাড়াও চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্ট, এজেন্ট বা প্রতিনিধি, দালাল, পরমার্শদাতা, মধ্যস্থতাকারী ইত্যাদি বহু ধরনের সংগঠিত ও অসংগঠিত কারবারি এই ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। কাজেই উপভোক্তার সম্পদের (জমাকৃত অর্থ-সহ) সুরক্ষাকল্পে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ও বিমার ব্যবস্থাপত্রের সংস্থান থাকা উচিত। উপভোক্তার আর্থিক সাক্ষরতা, অর্থাৎ কি না আর্থিক পরিষেবা বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞানগম্যি থাকাটাও সমান জরুরি। এক্ষেত্রে, আর্থিক পরিষেবা বিষয়ে উপভোক্তা বা ক্রেতার স্বার্থরক্ষার্থে

রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে নীতিনির্দেশিকা রয়েছে, যার উল্লেখ ইতোমধ্যেই করা হয়েছে, তাতে চোখ বুলানোটা বেশ কাজে আসবে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের খাতকদের থেকে কী হারে সুদ নেবে, কী কী চার্জ নেবে বা কী কী শর্ত আরোপ করবে তাদের উপর; যে ব্যাঙ্ক ঋণ থেকে ৯০ দিনের বেশি সময় ধরে সুদ ও আসল আদায় উভয়ই বকেয়া (non-performing assets, NPAs); বড়োমাপের ও প্রভাবশালী খাতকদের দেওয়া যে ঋণ উদ্ধারের আদৌ আশা নেই, তার ভবিতব্য ইত্যাদি বিষয়ের সাপেক্ষে বৃহত্তর নীতির রূপরেখা নির্ধারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি রাজ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত ব্যাঙ্কিং লোকপাল (Ombudsman)-ও এই সব বিষয়ে ব্যাঙ্কের খাতকদের বক্তব্য শুনে প্রতিকারের উদ্যোগ নেন। আর্থিক পরিষেবা বলতে মূলত বোঝায় অর্থলগ্নি শিল্পক্ষেত্র (finance industry) যেসব অর্থনৈতিক পরিষেবা প্রদান করে থাকে। এর আওতায় আসছে টাকাপয়সা লেনদেন হয় এমন ব্যাপক সংখ্যক কারবার। যেমন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি, বিমা সংস্থা, উপভোক্তাদের পণ্য ও পরিষেবা ক্রয়ে ঋণদাতা কোম্পানি, শেয়ার বেচা-কেনায় যুক্ত ফার্ম, বিনিয়োগকারী সংস্থা, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি। বস্তুত, "Voice Society" একটি তুলনামূলক সমীক্ষা চালিয়েছে ক্রেডিট কার্ড-সহ দেড়শো রকম আর্থিক পণ্যের বিষয়ে।

বিমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি (SEBI), ভোগ্যপণ্যের সংক্রান্ত Forward Market Commission ইত্যাদির আওতায় রয়েছে আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রের এক ব্যাপক বিস্তৃত এলাকা। এছাড়াও মিউচুয়াল ফান্ড (যার উপর বহু গ্রাহক নির্ভরশীল), বিনিয়োগকারী সংস্থা, উপভোক্তাদের পণ্য ও পরিষেবা ক্রয়ে ঋণদাতা কোম্পানি ইত্যাদি হরেক প্রকৃতির আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এই জঙ্গলে পথ হারিয়ে হন্যে হয়ে পড়েন বেচারা উপভোক্তা বা গ্রাহক।

ঠিক এখানেই আর্থিক পরিষেবায় শামিল হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ওঠে, বিশেষ করে ভারতের মতো বিশাল আয়তনের দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রেক্ষিতে, যেখানে সাক্ষরতার স্তরের নিরিখে বিপুল বৈষম্য চোখে পড়ে। কেরলের মতো রাজ্যে, যেখানে সাক্ষরতার হার অত্যন্ত বেশি, বিশেষ করে মহিলা

সাক্ষরতার, সেখানে একাজ সহজ হতে পারে। কিন্তু, ভারতে কিছু অঞ্চলে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বলে যে একটা বস্তু আছে, তাও অনেকের কাছে এখনও অজানা। সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার দৌলতে নাগরিকদের দেশের অর্থব্যবস্থায় শামিল করার এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। ৩৫ কোটির বেশি মানুষ এই যোজনার আওতায় অ্যাকাউন্ট খুলে প্রথমবারের জন্য নিজেদের ব্যাঙ্কের খাতায় টাকা জমা করেছেন। আবার এই ব্যাঙ্ক খাতা খোলার দৌলতে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে দেয় আর্থিক সুবিধা সরাসরি উপকার হস্তান্তর (Direct Benefit Transfer, DBT) ব্যবস্থা অনুযায়ী সটান ঢুকে যাচ্ছে এদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। মধ্যবর্তী দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির হাত না ঘুরেই এভাবে সরাসরি সরকারের ঘর থেকে নির্ঝঞ্ঝাটে তাদের কাছে টাকার সুষ্ঠু হস্তান্তরের ফলে তাদের মধ্যেও জাতীয় বিকাশে শামিল হওয়ার একটা বোধ তৈরি হচ্ছে।

এতদিন পর্যন্ত, তরুণ বয়সি পেশাদারেরা তথ্য-প্রযুক্তিকেই তাদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে স্থান দিত। এখন ছবিটা বদলে গেছে, আর্থিক পরিষেবাকে কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতে আগ্রহী হচ্ছেন তারা। আজকের দিনের আর্থিক পরিষেবা শিল্পক্ষেত্র তার বিবিধ পণ্য ও পরিষেবা-সহ ব্যক্তিবিশেষ ও কোম্পানিগুলির টাকাপয়সার দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে। গরিব মানুষজনকে দারিদ্র্যের কবল থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা দেখাচ্ছে আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্র, আর বিত্তবান শ্রেণির সামনে সুযোগ করে দিচ্ছে তাদের টাকাকে বাজারে খাটিয়ে আরও বেশি অর্থ উপার্জনের। কিন্তু আমার অভিমত, এর গোটাটাই নির্ভর করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির সুবিধা-সহ উপভোক্তা সুরক্ষার বন্দোবস্ত বর্তমান থাকার উপর।

উপভোক্তা সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতিনির্দেশিকা, ২০১৬-এ জে অধ্যায়ের ৬৬ নং ধারায় আর্থিক পরিষেবাসমূহ সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতি বিশদ সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে আর্থিক পরিষেবা উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষায় যথাযথ কিছু নীতি গ্রহণ করতে ও ব্যবস্থাপত্র গড়ে তুলতে হবে বা তার জন্য প্রোৎসাহিত করতে হবে। এর মধ্যে পড়ছে :

(ক) আর্থিক উপভোক্তা সুরক্ষা নিয়ামক ও বলবৎকরণ নীতিসমূহ;

(খ) প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষ এবং সহায়সম্পদ-সহ নজরদারি সংস্থা, যাতে করে এরা নিজেদের মিশন চালিয়ে যেতে পারে;

(গ) জমাকৃত অর্থ-সহ উপভোক্তাদের সম্পদ সুরক্ষায় যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও বিমা ব্যবস্থাপত্র;

(ঘ) উন্নততর আর্থিক শিক্ষাবিষয়ক রণকৌশল, যা আর্থিক সাক্ষরতার প্রসার ঘটাবে;

(ঙ) ন্যায়সঙ্গত শর্ত আরোপ এবং সঠিক তথ্য প্রকাশ, যাতে করে তাদের স্বীকৃত এজেন্টেদের কার্যকলাপের দায়ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এড়াতে না পারে ও জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত হয়। স্বার্থের সংঘাত বিষয়ে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীদের তরফে একটি লিখিত নীতি থাকতে হবে; যাতে করে সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাতের জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। যখন পরিষেবা প্রদানকারী ও কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে এধরনের কোনও স্বার্থের সংঘাতের পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে, তা অতি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট উপভোক্তার কাছে প্রকাশ করতে হবে, যাতে করে সেই স্বার্থের সংঘাতের দরুন উদ্ভূত সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি উপভোক্তা এড়াতে সক্ষম হন;

(চ) আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী ও তাদের স্বীকৃত এজেন্টরা দায়িত্ব সহকারে নিজেদের ব্যবসা পরিচালনা করবেন। উপভোক্তার চাহিদা ও আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এমন পণ্যই তাকে বেচা হবে বা সেই অনুযায়ীই তাকে ঋণ দেওয়া হবে এই সব বিষয় এর মধ্যে শামিল;

(ছ) প্রতারণা ও অপব্যবহারের হাত থেকে উপভোক্তার আর্থিক ডেটাকে সুরক্ষিত রাখতে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা;

(জ) সঠিক দরদাম এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বাড়াতে একটি নিয়ামক কাঠামো, যাতে করে যে তহবিল উপভোক্তাদেরকে হস্তান্তরিত করা হবে তার মূল্য ও ডেলিভারি সংক্রান্ত তথ্যাদি কোনও ধোঁয়াশা ছাড়াই উপভোক্তাকে জানানো হয়, বিনিময় হার, যাবতীয় ফি এবং এই টাকা হস্তান্তরের অফারের সাথে জড়িত আলাদা কোনও 'কস্ট' যদি ধরা থাকে, সমস্ত তথ্যই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে হবে উপভোক্তাকে। সেই সঙ্গে, এই লেনদেন সফল না হলে তার নিদান কী, জানাতে হবে সে তথ্যও।

নীতিনির্দেশিকার উল্লিখিত অধ্যায়ের ৬৭ নং ধারায় বলা হয়েছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, আর্থিক শিক্ষা এবং আর্থিক পরিষেবার নাগাল ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপভোক্তা সুরক্ষা ইত্যাদি সংক্রান্ত উপভোক্তা নীতিগুলিতে জোর দেবে তথা এগুলির মধ্যে সঙ্গতিসাধনের পন্থা গ্রহণ করবে সদস্য রাষ্ট্রগুলি।

এছাড়াও ৬৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, আর্থিক পরিষেবা শিল্পক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলি প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা এবং মানকগুলিকে বিবেচনায় রেখে পর্যালোচনা ও সংশোধনের রাস্তায় যেতে পারে। আবার তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যে নির্দেশিকা ও মানকগুলির যথাযত তালমেল রয়েছে, সেগুলি রদবদল না করেই অনুসরণ করতে পারে। অন্যদিকে, আবার অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে এবিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসলে সেই সূত্রে রূপায়ণের ক্ষেত্রে সীমান্তের বাধ্যবাধকতার সমস্যা থাকে না। তা করতে গিয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলি বেশ কয়েকটি উচ্চ স্তরীয় আন্তর্জাতিক নীতি সংহিতা থেকে প্রয়োজনীয় পাঠ নিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) এবং জি ২০ গোষ্ঠীর আর্থিক উপভোক্তা সুরক্ষা সংক্রান্ত উচ্চ স্তরীয় নীতিসমূহ, জি ২০ গোষ্ঠীর উদ্ভাবনামূলক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নীতিসমূহ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক উপভোক্তা সুরক্ষার জন্য উত্তম আচরণবিধি।

উপভোক্তা সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতিনির্দেশিকা, ২০১৬-এ কে অধ্যায়ের ৬৯ নং ধারায় বলা হয়েছে, বিশেষ করে বিকাশশীল বিশ্বে, সদস্য দেশগুলি উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষার পরিসর বাড়াতে তাদের স্বাস্থ্যের সূত্রে আবশ্যিক এলাকাগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে যেখানে যেখানে প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে। যেমন, কি না খাদ্য, ওষুধ, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সার্বজনিক সুবিধা (রান্নার গ্যাস, নিকাশি, টেলি-পরিষেবা, ইত্যাদি) এবং অবশ্যই নজর দিতে হবে পর্যটনের বিশেষত্বের দিকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য বণ্টন ব্যবস্থার সুযোগ, সমমানের আন্তর্জাতিক লেবেল ও তথ্য এবং শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচির জন্য নীতি গ্রহণ করতে বা তা বজায় রাখতে হবে। বর্তমান নথিপত্রের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলি প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে।❑

WBCS - 2017 মেনস্

হার্ড ওয়ার্ক নয়, দরকার স্মার্ট ওয়ার্ক

জানুয়ারীর শেষে সম্ভবত চুকে যাচ্ছে প্রিলির পালা। তার কয়েকমাস পর মেনস্। প্রিলির মতো ২০০ নয়, এখানে প্রস্তুতি নিতে হবে ১২০০ বা ১৬০০ নম্বরের জন্য। সুতরাং অগোছালোভাবে পড়াশুনা করলে চলবে না। প্রস্তুতি নিতে হবে স্ট্র্যাটেজীক্যালি। কঠোর পরিশ্রম বা হার্ড ওয়ার্কের সঠিক বিকল্প হতে পারে স্মার্ট ওয়ার্ক। কিভাবে তা সম্ভব – সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সামিম সরকার।

প্রিলি আদতে ছাটাই পর্ব। লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে থেকে কেটে ছেঁটে হাজার চারেক প্রার্থী ছাড়পত্র পায় মেনসে বসার। প্রিলিতে প্রাপ্ত নম্বর ক্যারি ফরোয়ার্ড হয় না, তাই প্রিলিতে শুধুমাত্র পাশ মার্ক পেলেই চলে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আসল লড়াই হয় মেনসে। মেনস হল প্রকৃত পক্ষে বাছাই পর্ব। এখানে এক নম্বরের ভগ্নাংশে নির্ধারিত হয় প্রার্থীর সাফল্য-ব্যর্থতা। WBCS অফিসার হওয়ার বাসনা থাকলে মেনস পরীক্ষাতেই নিশ্চিত করে নিতে হবে চাকরিটিকে। কেননা, ইন্টারভিউয়ের জন্য কিছু ফেলে রাখা উচিত হবে না। ইন্টারভিউ বড়ই আনপ্রেডিক্টেবল, সামান্য দশ পনের মিনিটে কিছু ভুলচুকের মূল্য দিতে হতে পারে সারা জীবন ধরে। মেনস ১৬০০ (C এবং D এর ক্ষেত্রে ১২০০) নম্বরের ম্যারাথনপরীক্ষা। কোন একটি পেপার খারাপ হয়ে গেলে শুধরে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ও সময় পাওয়া যায়, ইন্টারভিউয়ে যার স্কোপ একেবারেই নেই।

ডব্লুবিসিএস মেনস্-এর ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে

WBCS - এ নিজের প্রথম পছন্দের চাকরিটি পাওয়ার পূর্বশর্ত হল মেনসে সর্বাধিক নম্বর তুলে নেওয়া। তা করার জন্য সবার আগে প্রয়োজন সঠিক এবং যথাযথ একটি প্ল্যানিং বা স্ট্র্যাটেজী তৈরী করা। তারপর প্রয়োজন ওই স্ট্র্যাটেজীকে নিখুঁত ভাবে কাজে লাগানো। সঠিক পরিকল্পনা এবং তার যথার্থ রূপায়নের মাধ্যমেই আসতে পারে কাঙ্খিত সাফল্য। স্ট্র্যাটেজী বা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মেনসের সিলেবাসটিকে ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল, কম্পালসরি পেপারগুলির সিলেবাসের উল্লেখ থাকে নামমাত্র যার দ্বারা একটি ফিজিবল স্ট্র্যাটেজী তৈরী করা সম্ভব নয়। তাই ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ এর প্রশ্নপত্র গুলিকে নিয়ে কাঁটাছেড়া করতে হবে, করতে হবে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ। প্রশ্নগুলিকে বিশ্লেষণ করে সিলেবাসের একটি রূপরেখা তৈরী করতে হবে। সেই মতো নিতে হবে প্রস্তুতি। এরপর আসছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি— তোমার দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতিকে সর্বোত্তমভাবে পরীক্ষার খাতায় নামিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে তোমার প্রতিনিধি হিসাবে PSC -র কাছে যাবে A4 সাইজের একটি OMR শীট। সুতরাং নিজের প্রস্তুতিকে ম্যাক্সিমাম নম্বরে কনভার্ট করার একমাত্র মাধ্যম হল OMR শীট। বহু পরীক্ষার্থী শুধু পড়েই যায় দিন রাত এক করে। কিন্তু মকটেস্ট বা মহড়া পরীক্ষা দেয় না। খ্যাতনামা অভিনেতা, খেলোয়াড় কিংবা শিল্পী সকলেই নিয়মিত অনুশীলন বা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকেন, তবেই আসল মঞ্চে চোখ ধাঁধানো পারফরমেন্স করতে পারেন। কিন্তু আমরা, WBCS পরীক্ষার্থীরা, কি করে ভেবে নিই যে কোন অনুশীলন বা মকটেস্ট ছাড়া PSC -র আসল পরীক্ষায় বাজিমাত করবো। এটি চূড়ান্ত মূর্খামীরই নামান্তর। সুতরাং শুধু ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ে গেলেই চলবে না, দরকার নিয়মিত মকটেস্ট দেওয়া। মকটেস্ট গুলি অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড এবং লেটেস্ট হবে। এ ধরনের মকটেস্ট একমাত্র অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনেই নেওয়া হয়। সাফল্যের জন্য নিয়মিত WBCS অফিসারদের সাথে পরামর্শ করা দরকার, তাদের নির্ধারিত পন্থায় প্রস্তুতি নিতে পারলে সাফল্য সহজসাধ্য হয়। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এমন এক সংস্থা যেখানে ক্লাস নেন মূলত সদ্য পাশ করা ব্রিলিয়ান্ট WBCS টপাররা। লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম ১০ এর মধ্যে থাকা WBCS অফিসারদের গাইডেন্স একমাত্র এখানেই পাওয়া যায়। নোটস্, ক্লাস টেস্ট, মকটেস্ট তৈরী করেন সুতপা কর ম্যাডাম। সুতরাং একদিকে ভীষণ ভালো ক্লাসরুম গাইডেন্স এবং অপরদিকে উন্নত মানের নোটস ও মক টেস্টের যুগপৎ মেলবন্ধন ঘটেছে এখানে। এখন শুধু প্রয়োজন তোমাদের পরিশ্রম। হার্ড ওয়ার্ক নয়, স্মার্ট ওয়ার্ক। বাকিটুকু নির্দ্বিধায় অ্যাকাডেমিকের হাতে অর্পণ করতে পারো।

দ্বিতীয় খন্ড

সামিম সরকারের

ডব্লুবিসিএস প্ল্যানার

বইটির আলোচ্যসূচী ঃ

•কেন মেনস •কম্পালসরির ওপর আলোকপাত •কোয়ালিটি উত্তর লেখার কৌশল •ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট • দ্য লাস্ট হার্ডল •প্রশ্ন আসে কোথা থেকে • যে প্রশ্ন আসবেই • কি করবেন / কি করবেন না •হবি, ড্রেস কোড, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ •কমিউনিকেশন স্কিল •টপারদের ইন্টারভিউ •কয়েকটি বহু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন •পুনশ্চঃ

প্রকাশ ঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১৮ ✆7031842001, 9038786000

POSTAL COURSE FOR

WBCS-2018

প্রিলি ও মেনসের জন্য পোস্টাল কোর্স চালু আছে। পোস্টাল কোর্সে রয়েছে— • প্রিলি এবং মেনসের ১০০% কমনযোগ্য নোটস্ • ১৫০টিরও বেশি ক্লাসটেস্ট এবং মকটেস্ট • ডব্লুবিসিএস অফিসার দ্বারা ইন্টারভিউয়ের জন্য বিশেষ গ্রুমিং সেশন • নির্বাচিত কিছু ক্লাস। • প্রিলি এবং মেনস্-এর জন্য স্ট্র্যাটেজি এবং নেগেটিভ কন্ট্রোলের বিশেষ ক্লাস।

পোস্টাল ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে। প্রিলি মকটেস্ট ২০১৭র ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে।

Academic Association

53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

Website : www.academicassociation.in

9038786000
9674478600
9674478644

উচ্চ ফলন ও আর্থিক মুনাফার লক্ষ্যে ফসল বৈচিত্র্য

রীতেশ সাহা, সিতাংশু সরকার, বিজন মজুমদার ও সোনালি ভট্টাচার্য্য

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সুসংহত পুষ্টিযুক্ত খাদ্যোপাদান ও সেচ ব্যবস্থা নির্ভর দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। ক্রমশ বেড়ে চলা জনসংখ্যায় প্রত্যেকের জন্য অন্নসংস্থানের উপায় ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অধিক মাত্রায় ফলনের মাধ্যমে হতে পারে। অর্থাৎ, প্রত্যেকের জন্য খাদ্যের জোগান দিতে প্রতি একক জমি থেকে আরও অনেক বেশি ফলন পেতে হবে। পরিমাপ করা গেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির একই হার বজায় থাকলে, ২০২৫ সালে ৩০ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক বছর ৫০-৬০ লক্ষ টন করে খাদ্যশস্য বেশি উৎপাদন করে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ক্রমশ কমছে আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যা। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগান দেওয়াটাই বর্তমান সময়ে চিন্তার প্রধান কারণ। বিভিন্ন তথ্যসূত্র অনুযায়ী ধরে নেওয়া যায় যে আগামী ২০৫০ সালে ভারতের জনসংখ্যা ১৬৪ কোটিকে স্পর্শ করবে এবং সেই সঙ্গে মাথাপিছু জলের বাৎসরিক জোগান কমে দাঁড়াবে মাত্র ১১৪০ ঘনমিটার। একইভাবে এই বিপুল জনসংখ্যার জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ জমির পরিমাণ কমতে কমতে ১ বিঘার থেকেও কমে গিয়ে ঠেকবে (মাত্র ০.১০ হেক্টর)। ফলে খাদ্যের পর্যাপ্ত জোগানের জন্য এই সামান্য পরিমাণ জমি থেকেই অনেক বেশি উৎপাদনের উপায় বের করতে হবে বা কৃষির উল্লম্ব বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দেবে।

ভূমির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কৃষিতে নিবিড়তা বাড়ানোর পদ্ধতি গ্রহণের সূত্রেই অর্থনৈতিকভাবে টেকসই, বিবিধ ফসল বৈচিত্র্য সম্পন্ন কৃষিপ্রণালিই চাষিদের ঝুঁকি সামলানোর সুযোগ দেবে; ফলে জীবিকার নিশ্চয়তা বাড়বে। ফসলচক্রের নিবিড়তা ও বৈচিত্র্য মাটির ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈব বৈশিষ্ট্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে মাটির গুণগত মান বৃদ্ধি করে। পরীক্ষায় প্রমাণিত, শুধুমাত্র ভূমির উপরিতল সমান করেই ১০-২৫ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে, ৪০ শতাংশ জল সংরক্ষণ হয়, সারের ব্যবহারের কার্যকারিতা ১৫-২৫ শতাংশ বাড়ে এবং আল ও নালায় কম জমি লাগার দরুন, জমির পরিমাণ শতকরা ২-৬ শতাংশ বাড়ে।

দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়গুলি হল গাঙ্গেয় সমতলভূমি অঞ্চলের সেচনির্ভর গম চাষে উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা কমতে থাকা, প্রায় থমকে যাওয়া ফলনের মাত্রা এবং সাধারণভাবে কৃষিতে জলের অপ্রতুল জোগান। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সুসংহত পুষ্টিযুক্ত খাদ্যোপাদান ও সেচ ব্যবস্থা নির্ভর দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। ক্রমশ বেড়ে চলা জনসংখ্যায় প্রত্যেকের জন্য অন্নসংস্থানের উপায় ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অধিক মাত্রায় ফলনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। ধরে নেওয়া যাক, ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা ১৬৪ কোটি হবে, তা হলে জনপ্রতি জলের জোগান কমে মাত্র ১১৪০ ঘনমিটার দাঁড়াবে, যা কিনা ২০০১ সালে ১৮২০ ঘনমিটারের কাছাকাছি ছিল। এভাবে চলতে থাকলে ২০২৫ সাল নাগাদ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ উন্নয়নশীল দেশে তীব্র জলসংকট দেখা দেবে। একইভাবে মাথাপিছু বরাদ্দ জমির পরিমাণ কমতে কমতে ২০২৫ সালে মাত্র ০.১ হেক্টর (বা ০.৭৫ বিঘা) হবে। তথ্য থেকে

[ড. সাহা ব্যারাকপুর-স্থিত কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী, মৃত্তিকা বিজ্ঞান। ই-মেল : saharitesh74@rediffmail.com। ড. সরকার সেই সংস্থায় শস্য বিজ্ঞান বিষয়ক প্রধান বিজ্ঞানী। ই-মেল : sarkaragro@gmail.com। ড. মজুমদার ওই একই সংস্থায় মৃত্তিকা রসায়ন বিষয়ক প্রধান বিজ্ঞানী। ই-মেল : bmajumder65@gmail.com। ড. ভট্টাচার্য্য পশ্চিমবঙ্গ উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত।]

এটা স্পষ্ট যে প্রত্যেকের জন্য খাদ্যের জোগান দিতে প্রতি একক জমি থেকে আরও অনেক বেশি ফলন পেতে হবে। পরিমাপ করা গেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির একই হার বজায় থাকলে, ২০২৫ সালে ৩০ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক বছর ৫০-৬০ লক্ষ টন হারে খাদ্যশস্য বেশি উৎপাদন করে খাদ্য উৎপাদনের এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হবে।

যেকোনও ফসলচক্রের দীর্ঘদিন উচ্চ ফলনের স্থায়িত্ব জমির মাটির সঠিক এবং যথাযথ উর্বরতা ব্যবস্থাপনা, অর্থাৎ, পর্যাপ্ত ও সুষম পুষ্টিযুক্ত খাদ্যোপাদান জোগান ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। মাটির উচ্চ ফলন দেবার ক্ষমতা সুষম, সুসংহত বিচক্ষণ উদ্ভিদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, যেখানে জৈব উর্বরক উৎসের পূর্ণ ব্যবহার ও কেবলমাত্র প্রয়োজন ভিত্তিক ও আবশ্যিক রাসায়নিক সারের ব্যবহারকে মান্য করা হবে, তার উপর নির্ভর করে। ১৯৫০-৫১ সালে, এদেশে সারের ব্যবহার ছিল মাত্র ০.৫ কেজি প্রতি হেক্টরে/ প্রতি বছরে। ফলে উৎপাদন ছিল মাত্র ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন। ২০০৮-০৯ সালে সারের ব্যবহার বেড়ে হয়েছে ১১৭ কেজি/ প্রতি হেক্টরে/প্রতি বছরে, ফলে মোট ফলনও বেড়ে ২৩ কোটি টনে পৌঁছে গেছে। আর কেবলমাত্র প্রধান প্রধান উদ্ভিদ খাদ্যোপাদানের জোগানের ফলে ও অধিক ফলনের জন্য অন্যান্য খাদ্য উপাদান (যেমন—সালফার বা গন্ধক) এবং অনুখাদ্যের (জিঙ্ক, বোরন, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম) ঘাটতি দেখা গেছে। দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ ফলনলাভের পূর্বশর্ত হল, অঞ্চল ভিত্তিক ও শস্য পদ্ধতির রীতি অনুযায়ী সুষম ও পর্যাপ্ত উদ্ভিদ খাদ্যোপাদানের ব্যবস্থাপনা। ফসল উৎপাদনের অনুকূল পরিস্থিতি পেতে মাটির নিম্নমানের ভৌত অবস্থার পরিমার্জনা প্রয়োজন। মাটির ভৌত অবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন—মাটির কণার বিন্যাস (texture), গঠন (structure), আপাত ঘনত্ব (bulk density) ইত্যাদির উপর মাটির জলধারণ ও জোগান ক্ষমতা, অক্সিজেন পরিবহন ও পরিব্যাপ্তির মাত্রা (oxygen diffusion), মাটির তাপমাত্রা এবং ফসলের শিকড়ের জন্য ভৌত রোধ কী পরিমাণ হবে, তা নির্ভরশীল। তাই উচ্চ ফলনের জন্য মাটির যথাযথ কর্ষণ, ফসলের অবশিষ্টাংশের পুনর্ব্যবহার, মাটির শোধন, জলসেচ ও সময়মতো জলনিকাশি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অপরিহার্য। স্বাভাবিক জমিতে বারবার বেশিমাত্রায় কর্ষণ করার ফলে মাটির জৈব পদার্থ দ্রুত জারণ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষয় হয়, ফলে ফসলকে প্রয়োজনীয় জল ও পরিপোষক জোগান দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে মাটি। একথা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত কমে আসা, সেই সঙ্গে দিন দিন জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বহুগুণ বেড়েছে বলে তা পূরণের জন্য কৃষি পদ্ধতির আরও প্রগাঢ় বৃদ্ধি প্রয়োজনে হয়েছে। বহু বছর ধরে চলে আসা ঋতু পরিবর্তনের মাত্রা এখন আরও বেশি প্রকট—বৃষ্টির মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত, ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্কট, ক্রমবর্ধিত মজুরি—ইত্যাদি কারণে প্রথাগত ফসল বৈচিত্র্য ও চাষ পদ্ধতি আর অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বা কার্যকরী থাকছে না। সেজন্য বিশেষ যত্নের সঙ্গে সময়োপযোগী এবং পৃথক পৃথক জলবায়ু ভিত্তিক কৃষি অঞ্চলের জন্য নতুন ধরনের ফসল বৈচিত্র্য আনতে হবে এবং তা চাষিদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে হাতে-কলমে প্রদর্শন ক্ষেত্রের মাধ্যমে চাক্ষুষ দেখাতে হবে, যাতে সব অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার হয় এবং উৎপাদন ও লাভ বাড়ে। নতুন ফসল বৈচিত্র্যের বৈশিষ্টগুলি হবে : (১) নিম্ন মূল্যের শস্যের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে উচ্চ মূল্যের শস্য উৎপাদন, (২) বেশি জল প্রয়োজন এমন ফসলের পরিবর্তে, কম জলে উৎপন্ন হয় এমন ফসলের চাষ বাড়ানো, (৩) এক ফসলি প্রথা থেকে বহুফসলি/বা যৌথ ফসলের ধারণা, (৪) কেবলমাত্র ফসল উৎপাদনের পরিবর্তে, ফসল-গবাদি পশু-মৎস্যচাষ-মৌমাছি পালন একত্রে করার বন্দোবস্ত, (৫) শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক কাঁচামালের উৎপাদন না করে—উৎপাদিত শস্যের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজন ইত্যাদি।

"মাটির উচ্চ ফলন দেবার ক্ষমতা-সুষম, সুসংহত বিচক্ষণ উদ্ভিদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, যেখানে জৈব উর্বরক উৎসের পূর্ণ ব্যবহার ও কেবলমাত্র প্রয়োজন ভিত্তিক ও আবশ্যিক রাসায়নিক সারের ব্যবহারকে মান্য করা হবে, তার উপর নির্ভর করে। ১৯৫০-৫১ সালে, এদেশে সারের ব্যবহার ছিল মাত্র ০.৫ কেজি প্রতি হেক্টরে/ প্রতি বছরে। ফলে উৎপাদন ছিল মাত্র ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন। ২০০৮-০৯ সালে সারের ব্যবহার বেড়ে হয়েছে ১১৭ কেজি/ প্রতি হেক্টরে/প্রতি বছরে, ফলে মোট ফলনও বেড়ে ২৩ কোটি টনে পৌঁছে গেছে।"

ফসল বৈচিত্র্য ও ভূমির পুনর্বিন্যাস : ভারতের পরিপ্রেক্ষিত

ভারতে মূলত ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তরের দশকের শুরুতে সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে কৃষি-প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্রধানত অর্থনৈতিকভাবে লাভদায়ক ফসল বৈচিত্র্য ব্যবহার করা শুরু হয়। ফসল বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে প্রধানত পাঁচ ধরনের নির্ণায়ক হেতু দায়ি। সেগুলি হল :

(ক) সেচ, বৃষ্টিপাত ও মাটির উর্বরতা বিষয়ক কারণ;

(খ) প্রযুক্তি বিষয়ক কারণ, যেমন উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, জলসেচ প্রযুক্তি; সেই সঙ্গে বাজার, গুদামজাত করার ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াকরণ;

(গ) মানুষের খাদ্যের ও গোখাদ্যের যথেষ্ট জোগান এবং চাষির কৃষিতে লগ্নি করার ক্ষমতা;

(ঘ) তা ছাড়া মূল্য বিষয়ক কারণগুলি হল—কাঁচামাল ও উৎপাদিত শস্যের দাম, বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক নিয়মকানুন, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করে;

(ঙ) পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ও সমগোত্রীয় বিষয়ক কারণগুলির মধ্যে পড়ছে খামারের পরিমাপ ও স্বাধিকার, গবেষণা, সম্প্রসারণ, বাজার ব্যবস্থা এবং সরকারি বিধিনিষেধ ও এই সম্পর্কিত আইনকানুন।

কারণগুলির প্রত্যেকটি একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এগুলিই চাষিকে ফসল বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার নির্ণায়ক কারণ হিসাবে আলাদা আলাদা এবং একত্রিত ভাবে প্রভাবিত করে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কারণগুলির প্রভাব তুলনামুলক ভাবে পরিবর্তিত হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, ভারতীয় কৃষিতে এই ফসল বৈচিত্র্যের কারণগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক কারণটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক, উভয় ক্ষেত্রেই অন্যান্য উৎপাদন কর্মকাণ্ডের মতোই কৃষিক্ষেত্রও বাণিজ্যকীকরণ ও বিশ্ব উদারীকরণ নীতি মেনে এগোনোর ফলে চাষিদের সিদ্ধান্তে—অর্থনৈতিক কারণগুলি বেশি করে প্রভাবিত করবে এটাই স্বাভাবিক। এই পথে কৃষির অগ্রগতির ফলে কৃষি পণ্যের বেশি উৎপাদন—জমির পরিমাণ বাড়ার ফলে নয় বরং চাষে ফসল বৈচিত্র্য গ্রহণ ও নিবিড় কৃষি ব্যবস্থার ফলে সম্ভব হচ্ছে। তবে পরবর্তী ধাপে কৃষিক্ষেত্রের অর্থনৈতিক উৎপাদনের হারের বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির থেকেও উৎপাদিত শস্যের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে বেশি করে হবে। তাই বিচক্ষণ ফসল বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্য হতে হবে—অর্থনৈতিকভাবে ফলপ্রসু এবং এমন সব শস্যের চাষ, যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই রোগ, পোকা এবং আগাছার প্রকোপ কম হবে, মাটির জীবাণুর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে, জনমজুরের উপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং চাষিদের কৃষি বিষয়ক ঝুঁকি সামলানোর ক্ষমতা বাড়বে।

রবি ফসলে মাটির অবশিষ্ট জলের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে ভূমির উপরিতলের পুনর্বিন্যাস জরুরি। উদাহরণ স্বরূপ—জাভা এবং ইন্দোনেশিয়ায় উত্থাপিত ও নিমজ্জিত জমি (যাকে স্থানীয় ভাষায় সোরজান বলা হয়) খুবই জনপ্রিয়। এই পুনর্বিন্যস্ত জমির উঁচু অঞ্চলে উচ্চমূল্যের ফসল ও নিচু অঞ্চলে ধান চাষ করা হয়। এই ধরনের ভূমির পুনর্বিন্যাস স্থায়ী অথবা সাময়িক হতে পারে। সাময়িকভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয় ধান কাটার পরে এবং প্রধানত সবজি চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এক্ষেত্রে জমির নিচু ভাগ ব্যবহৃত হয় না, ফলে মোট জমির প্রায় শতকরা ২০-৪০ ভাগ অব্যবহৃত থাকে। আর স্থায়ীভাবে পুনর্বিন্যস্ত জমির পুরোটাই সারা বছর বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের কাজে লাগে। উঁচু ভাগে সবজি বা সমগোত্রীয় ফসল ও নিচু ভাগে প্রায়শই ধান/মাছ চাষ করা হয়। এর ফলে ওই জমির শস্য নিবিড়তা যেমন বাড়ে, সেই সঙ্গে চাষির আয়ও বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদানের সঠিক ও সংহত প্রয়োগের জন্য জমির উপরিতলের সমতা আবশ্যিক। এটা প্রমাণিত যে সমতল জমিতে সেচের জল এবং সারের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার হয় এবং অপচয় হয় ন্যূনতম। উত্তর ভারতীয় সমতল ভূমি অঞ্চলে জমি তৈরির সময় লেজার-নিয়ন্ত্রিত ভূমি পুনর্বিন্যাস যন্ত্রের ব্যবহারে জমির গড় উচ্চতার ফারাক মাত্র ±২ সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকে। কেবলমাত্র জমির উপরিভাগ সমতল করে ফসলের উৎপাদন ১০-২৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যায়, সেচের জলের প্রয়োজন ৪০ শতাংশ কম হয়, উদ্ভিদ খাদ্যের ব্যবহারের দক্ষতা ১৫-২৫ শতাংশ বাড়ে এবং আল ও নালার পরিমাণ কমায় মোট জমির পরিমাণ ২-৬ শতাংশ বাড়ে।

বৃষ্টিনির্ভর চাষ অঞ্চলে ফসল বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের পুষ্টির নিরাপত্তা বাড়ানো, আরও কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পরিবেশ সহায়ক কৃষি সম্ভব। এরকমের কিছু বিচার্য বিষয় এবং ফসল বৈচিত্র্যের ফলে কী ধরনের লাভ এই অঞ্চলে পাওয়া যেতে পারে তা ১নং সারণিতে লিপিবদ্ধ করা হল। এই অঞ্চলে ফসল বৈচিত্র্যের ফলে যা যা লাভ হতে পারে তা হল : (ক) বিকল্প ফসল থেকে বেশি লাভ, (খ) রোগ-পোকার প্রকোপ কম, (গ) জনমজুরের সুবিন্যস্ত ব্যবহার, (ঘ) বিকল্প ফসলগুলির লাগানোর ও কাটার সময় আলাদা আলাদা হবার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কম ঝুঁকি, (ঙ) নতুন বিকল্প শস্য উচ্চ মূল্যের পণ্যের নবীকরণযোগ্য উৎস হতে পারে।

সারণি-১
ফসল বৈচিত্র্যের ফলে বিচার্য বিষয়গুলি এবং সেই সম্পর্কিত লাভ

বিচার্য বিষয়	ফসল বৈচিত্র্যের ফলে লাভ
উৎপাদন ও স্থায়িত্ব/ উচ্চ ঝুঁকি ও ব্যয়বহুলতা	বর্ষজীবি ও বহুবর্ষীয় মিশ্রিত ফসলের উৎপাদনের মাধ্যমে ফলন ও আয় বৃদ্ধি, ফলে ঝুঁকি ও খরচ কমবে
জমির অবনয়ন/অবক্ষয়	ভূমির সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে জমির অবক্ষয় বা অবনতি কম হবে
অপ্রতুল কর্মসংস্থান	সারা বছর ধরে ধাপে ধাপে কর্মসংস্থান
লভ্যাংশের নিম্নগামিতা	বিভিন্ন উপাদান থেকে বেশি আয়
শক্তির ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা	শক্তির উচ্চ ব্যবহার সক্ষমতা সম্পন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার

"বৈচিত্র্যময় ফসলচক্র রোগের ও আগাছার প্রকোপ কমিয়ে, শিকড়ের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে, মাটির জলের সদ্ব্যবহার এবং খাদ্যোপাদানের জোগান সুনিশ্চিত করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। আদর্শ ফসল বৈচিত্র্যে এমন ফসল বাছাই করা হয় যাদের বেড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় উপকরণ ভিন্ন ধরনের।"

ফসল বৈচিত্র্যের প্রভাব

বৈচিত্র্যময় ফসলচক্র রোগের ও আগাছার প্রকোপ কমিয়ে, শিকড়ের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে, মাটির জলের সদ্ব্যবহার এবং খাদ্যোপাদানের জোগান সুনিশ্চিত করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। আদর্শ ফসল বৈচিত্র্যে এমন ফসল বাছাই করা হয় যাদের বেড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় উপকরণ ভিন্ন

সারণি-২
ভার্টিসল মাটিতে সোয়াবীনের তুল্য ফলনের হিসাবে সর্বমোট ফলনে ভূমির বিন্যাস ও ফসল বৈচিত্র্যের প্রভাব

	সোয়াবীনের তুল্য ফলনের হিসাবে সর্বমোট ফলন (কিলোগ্রাম প্রতি হেক্টরে)							
	জমি প্রশস্ত-মাদা এবং নালি যুক্ত				জমির উপরিতল সমতল/চ্যাপ্টা			
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭
ছোলা ফসলে সেচ								
সেচ-১	২৮১৮	২৭৪৭	৩৮৫৭	৩৫৫১	২২৫৭	২৪২৫	৩৩৭০	৩১৬৫
সেচ-২	২৯২৯	২৯০৩	৪১৯৬	৩৯০০	২৪২২	২৫৪২	৩৫৯১	৩৫৭৬
শস্য পদ্ধতির রীতি								
সোয়াবীন-ছোলা	৩৫৩০	২১০৯	৩০১৯	৩০৪৪	২৬৯৮	১৮৯৪	২৬১৩	২৬৯১
ভুট্টা-ছোলা	২৯৩১	৩৪৫৭	৪৫০৭	৪৩৫৪	২২৯৫	৩০৩৬	৩৮৩২	৩৯৫৯
সোয়াবীন/ভুট্টা-ছোলা	৩৩৮৫	২৮০৭	৪৫৬৪	৪১৪৫	২৭৯৮	২৪৮৫	৩৯৩৩	৩৭৬৫
সোয়াবীন/অড়হর	২৬১৫	২৩৬৯	৩৫৩২	৩১৩৪	২২৬২	২০২৭	২৯১২	২৭৭৮
ভুট্টা/অড়হর	১৯০৭[ক]	৩৩৮৫	৪৫১৩	৩৯৫১	১৬৪৬	২৯৭৫	৪১১২	৩৬৫৯

[ক]২০০৩-০৪ সালে অড়হরের একক ফসল লাগানো হয়েছিল।

ধরনের। যেমন, বেশি নাইট্রোজেন ব্যবহারকারী ভুট্টার সঙ্গে সোয়াবীন বা মুসুর ডাল জাতীয় কম নাইট্রোজেন চাহিদাসম্পন্ন শস্য ফসল বৈচিত্র্যে স্থান করে নিতে পারে। পরীক্ষায় প্রমাণিত যে ডালজাতীয় শস্য চাষের পরে সেই জমিতে গম লাগালে ফলন বেশি হয় এবং এই ফলন বৃদ্ধি নাইট্রোজেন ও অন্যান্য লাভের দৌলতে হয়ে থাকে।

যেখানে জমিতে জলের অভাব, এমন অঞ্চলের ফসল বৈচিত্র্যে বিভিন্ন মাত্রার জলের প্রয়োজন এমন সব ফসল যোগ করতে পারলে মোট উৎপাদন বাড়ে এবং সারের যথাযথ ব্যবহার সম্ভবপর হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে মুসুর (lentil)-মসিনা (flax) ফসল ওঠার পরে জমিতে গম লাগালে, সেই গম বেড়ে ওঠার জন্য ৭৪ মিলিলিটার জল পায়, কিন্তু সর্ষের পরে লাগালে মাত্র ৪৫ মিলিলিটার ও গমের পরে লাগালে ৫৯ মিলিলিটার জল পাবে। তাই যেখানে জলের অভাব আছে, সেখানে গমের আগে মুসুর-মসিনাকে ফসলচক্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ফসল বৈচিত্র্য শস্যের খাদ্যোপাদানের চাহিদা ও জোগানকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। যেমন, কোনও ফসলের অবশেষে যদি নাইট্রোজেনের মাত্রা কম থাকে তা পরবর্তী ফসলের নাইট্রোজেন গ্রহণ পদ্ধতির উপর প্রভাব ফেলবে। ফসলের অবশেষে কী মাত্রার নাইট্রোজেন আছে তার উপর নির্ভর করে এই নাইট্রোজেনের নিশ্চলীকরণ (immobilozation) ও সহজলভ্যতার (mineralization) ভারসাম্য কোন দিকে যাবে। সব ফসলের অবশেষ অবশ্যই ধীরে ধীরে পচন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাবে এবং তার অভ্যন্তরের সব খনিজ পদার্থ (খাদ্যোপাদান) মুক্ত করবে। এই অবশিষ্টাংশে যদি কার্বন/নাইট্রোজেনের অনুপাতে খুব বেশি ফারাক থাকে তবে অবশেষের পচনকাল দীর্ঘ হবে। দেখা গেছে যদি ফসলে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত সার দেওয়া হয়, তবে সেই ফসলের অবশেষ তাড়াতাড়ি পচে। এমনকি এও দেখা গেছে, যথেষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ দ্বারা উৎপাদিত গমের অবশেষ, ডাল জাতীয় শস্যের অবশেষের মতো একই দ্রুততায় পচছে। তাই বলা যায় যে, কী জাতীয় ফসল এবং কতটা সার প্রয়োগে উৎপাদন করা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করবে এই সব ফসলের অবশেষে কতটা পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকবে এবং কী পরিমাণে পরবর্তী ফসলকে তা দিতে পারবে। ফসলের অবশেষ কীভাবে জমিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার উপরও নির্ভর করে—অবশেষের পচনের পরে কতটা নাইট্রোজেন পরবর্তী ফসলকে দিতে পারবে। যদি বেশি ফারাকের কার্বন/নাইট্রোজেন অনুপাতের ফসল অবশেষ নাইট্রোজেন ঘটিত সারের সঙ্গে জমিতে প্রয়োগ করা হয়, তবে দেখা গেছে ফসলের অবশেষের নাইট্রোজেন পরবর্তী ফসল পাবে না, বরং সারের মাধ্যমে প্রযুক্ত নাইট্রোজেনও ওই পচন প্রক্রিয়ার জীবাণুরা ব্যবহার করবে এবং ফসল নাইট্রোজেন থেকে বঞ্চিত হবে। এছাড়াও ফসলের অবশেষের প্রয়োগের পরে যদি জমিতে ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেই সার থেকে নাইট্রোজেন বাষ্পীভবন বা সমগোত্রীয় পদ্ধতিতে নষ্ট হবে। তাই এই অবস্থায় নাইট্রোজেন ঘটিত সার মাটির উপরে না দিয়ে কিছুটা নিচের স্তরে প্রয়োগ করতে হবে এবং মাটির উপরিভাগে বেশি ফারাক অনুপাতের কার্বন/নাইট্রোজেন যুক্ত শস্যের অবশেষ প্রয়োগ করা দরকার।

ফসলের নিবিড়তা ও বৈচিত্র্য মাটিতে ফসফরাসের সক্রিয়তা প্রভাবিত করে। একই জমিতে পর পর ফসল উৎপাদিত হতে থাকলে এবং জৈব বা অজৈব কোনও প্রকারেরই ফসফরাস জমিতে না দেওয়া হয়, তাহলে দ্রুত ফসফরাসের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায় এবং এই ঘাটতি জৈব ও অজৈব দুই প্রধানের ফসফরাসের ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। জমিকে পতিত রাখার বারের সংখ্যা বাড়াতে থাকলে জমি থেকে ফসফরাসের দ্রুত ঘাটতি হয় না। গত ২৪ বছর ধরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বার বার জমি পতিত রাখলে মাটিতে ফসফরাসের মাত্রা বাড়ে। তাছাড়া

সারণি-৩
ভূমির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তৈরি প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত এবং উপরিতল সমতল/চ্যাপ্টা জমির থেকে বর্ষার জল নির্গমন ও মাটি ক্ষয়ের খতিয়ান

সাল	বৃষ্টিপাত	বর্ষার অতিরিক্ত জল নির্গমন (মিলিমিটার)		মাটি ক্ষয়ের পরিমাপ (কিলোগ্রাম/হেক্টরে)	
	(মিমি)	প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত	উপরিতল সমতল/ চ্যাপ্টা	প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত	উপরিতল সমতল/চ্যাপ্টা
২০০৩	১০৫৮	১৬৩.০ (১৫.৪ শতাংশে)	২১৪.৯ (২০.৩ শতাংশে)	১৯৫৬	২৮৩৭
২০০৪	৭৯৮	১২৪.০ (১৫.৫৪ শতাংশে)	১৮৩.৩ (২৩.০ শতাংশে)	৬৫৭	১৪৬৬
২০০৫	৯৪৬	১৭৭.০ (১৮.৭ শতাংশে)	২৪৬.০ (২৬.১ শতাংশে)	১৪০২	৩১২৩
২০০৬	১৫১৩	৫০২.০ (৩৩.২ শতাংশে)	৮৭৩.০ (৫৭.৭ শতাংশে)	৩৫০৩	৬৩৬৫
(বন্ধনীর মধ্যে ঋতু হিসাবে বৃষ্টির শতকরা ভাগ দেখানো হয়েছে)					

জমিতে ফসফরাস ও নাইট্রোজেন উভয়ই প্রয়োগ করা হলে এবং পর পর ফসল লাগালেও ফসফরাসের জোগান বাড়ে এবং এই বৃদ্ধি ফসল দ্বারা ফসফরাসের অপসারণ থেকে বেশি। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, ফসফরাসের এই বৃদ্ধি হয় প্রকৃতপক্ষে মাটির নিচের স্তর থেকে ফসফরাস উপরের দিকে জৈব প্রক্রিয়ায় উঠে আসে বলে।

বিভিন্ন ধরনের ভূমির পুনর্বিন্যাস, যেমন—উঁচুমাদা-নিচু জমি, আল-নালি ইত্যাদির ফলে জমি থেকে বৃষ্টির জলের দূরীকরণ ও মাটির ক্ষয় কমে এবং মাটির নিচের স্তরে জলের প্রবেশের পরিমাণ বাড়ে। এই ধরনের ভূমির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে জল বয়ে যাবার গতিবেগ কমে, ফলে মাটির গভীরে জল প্রবেশ করার সময় পায়। তাছাড়াও হঠাৎ বেশি বৃষ্টিপাত হলে জমিতে তৈরি করা নালি অঞ্চল দিয়ে অতিরিক্ত জল সহজেই জমি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এবং জল জমে ফসলের ক্ষতি করতে পারে না।

ভোপালে পরীক্ষার মাধ্যমে এই ধরনের পুনর্বিন্যাস করা জমিতে পাঁচ ধরনের ফসলচক্র ব্যবহার করে তাদের একের অপরের উপর প্রভাব দেখা হয়েছে। এই পাঁচ ধরনের ফসলচক্র ছিল—(১) সোয়াবীন-ছোলা, (২) ভুট্টা-ছোলা, (৩) সোয়াবীন/ভুট্টা অন্তর আবাদ-ছোলা, (৪) সোয়াবীন/অড়হর অন্তর আবাদ, (৫) ভুট্টা/অড়হর অন্তর আবাদ। বর্ষার ফসলগুলি বৃষ্টির জলে উৎপন্ন করা হয়েছে আর শীতের ফসলে (যেমন, ছোলা) দু'বার সেচ দেওয়া হয়েছিল। এই পরীক্ষার থেকে দেখা গেছে, ছোলাতে সেচ দেওয়া হোক বা না হোক, প্রশস্ত-মাদা ও নালি ব্যবস্থায় অন্য সমতল অবস্থার থেকে বেশি ফলন পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ধরনের ফসলচক্রের মধ্যেও মোট ফলনের মাত্রাভেদ আছে (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

"সাধারণভাবে বলতে গেলে, উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলের মাটিতে জৈব কার্বনের পরিমাণ ও অন্যান্য খাদ্যোপাদানের মাত্রা বেশি। এর একটা প্রধান কারণ হল জমির চারপাশের ছোটো ছোটো পাহাড় ও টিলা থেকে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটির খাদ্যোপাদান জমিতে বয়ে আসে। সাধারণ চাষিরা তাই কোনও রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করেই ধান চাষ করেন, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে চাষিরা প্রতি ৩-৪ বছর অন্তর অল্প মাত্রায় (৫ টন/প্রতি হেক্টরে) জৈব সার, যেমন খামার সার ব্যবহার করেন।"

এই ফসল-চক্রগুলির মধ্যে সোয়াবীন-ছোলা এই চক্র সব থেকে কম ফলন দিয়েছে। পরিলক্ষিত হয়েছে যে, যেসব ফসল-চক্রে ভুট্টাকে শামিল করা হয়েছে তার সব কয়টির ক্ষেত্রেই মোট ফলন বেশি। যদি ছোলায় জলসেচ না দেওয়া হয়, তবে ভুট্টা/অড়হর অন্তর আবাদ শুধুমাত্র সোয়াবীন ফসলের চাষ থেকে অনেক ভালো। তাই এই পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ভোপাল সংলগ্ন অঞ্চলের জন্য ভুট্টা-ছোলা, সোয়াবীন/ভুট্টার অন্তর আবাদ-ছোলা, ভুট্টা/অড়হর অন্তর আবাদ এই ধরনের ফসল বৈচিত্র্য কেবলমাত্র সোয়াবীন লাগানোর থেকে বেশি লাভজনক।

বর্ষা ঋতুতে প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত জমি ও উপরিতল সমতল বা চ্যাপ্টা এই দুই ধরনের পুনর্বিন্যাস করা জমিতে প্রবাহিত বর্ষার জল এবং মাটির ক্ষয়ের পরিমাপ করা হয়েছে। চার বছর ধরে (২০০৩-০৪ থেকে ২০০৬-০৭) চালানো পরীক্ষায় দেখা গেছে যে বয়ে যাওয়া বর্ষার জলের পরিমাণ প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত জমির ক্ষেত্রে উপরিতল সমতল বা চ্যাপ্টা জমির থেকে অনেক কম (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। এর কারণ হিসাবে দেখা গেছে, এই ধরনের প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত জমির ঢাল সবজায়গায় সমান বা একই ধরনের হওয়ায় জল বয়ে যাওয়ার গতি তুলনামূলকভাবে কম, ফলে মাটির গভীরে জল প্রবেশ করার সময় পায়। এই ধরনের প্রশস্ত-মাদা ও নালি জমিতে ওই সময়কার মোট বৃষ্টিপাতের মাত্র ২৪.৩ শতাংশ জল প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু উপরিতল সমান বা চ্যাপ্টা জমির ক্ষেত্রে এই বয়ে যাওয়া জলের পরিমাণ ৩৯ শতাংশ। পরীক্ষার চার বছরের মধ্যে যে বছর বেশি বৃষ্টি হয়েছে, সেই বছরে মাটির ক্ষয়ের পরিমাণও বেশি (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)।

যেমন, ২০০৪ সালের বর্ষা ঋতুর বৃষ্টির পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৯৮.২ মিলিমিটার এবং প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত ক্ষেত্রে মাটির ক্ষয়ের পরিমাণ ছিল ৬৫৭ কেজি/হেক্টরে; কিন্তু ২০০৬ সালে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে হয় ১৫১৩ মিলিমিটার এবং মাটি ক্ষয়ের পরিমাণও বেড়ে হয় ৩৫০৩ কেজি/হেক্টরে। সেই সঙ্গে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে প্রতি বছরই প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত জমির মাটি ক্ষয়ের

সারণি-৪
বিভিন্ন ফসলচক্রে ফসলের অবশেষের পুনর্ব্যবহারে মাটির উদ্ভিদ খাদ্যোপাদানের উপর প্রভাব

ফসল-চক্র	সহজলভ্য নাইট্রোজেন (কেজি/হেক্টর)	সহজলভ্য ফসফরাস (কেজি/হেক্টর)	সহজলভ্য পটাশিয়াম (কেজি/হেক্টর)
ধান-আলু	২৬৩.৭	৭.৯৩	৩৪৯
ধান-টমেটো	২৫৯.৫	৭.৮৮	৩৪৬
ধান-বীন	২৭৭.০	৮.৭৬	৩৫৩
ধান-গাজর	২৬৬.৪	৭.৮৬	৩৩৭
ধান-বাঁধাকপি	২৫২.২	৭.৪৭	৩২৮
ধান-পতিত	২৬৮.০	৭.৬৭	৩৪৮
প্রাথমিক মান	২৬৪.০	৬.৯৭	৩২১

পরিমাণ শতকরা ৩১-৫৫ ভাগ কম। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই দুই ধরনের ভূমির পুনর্বিন্যাসের মধ্যে প্রশস্ত-মাদা ও নালি যুক্ত জমির বৃষ্টির জল বয়ে যাওয়ার পরিমাণ এবং মাটির ক্ষয়ের পরিমাণ উপরিতল সমতল বা চ্যাপ্টা জমির থেকে অনেক কম। এছাড়াও এই প্রশস্ত-মাদা ও নালি জমি হঠাৎ করে বেশি বৃষ্টিপাতের দরুন জমা অতিরিক্ত জল বের করে দেয় এবং বর্ষার ঋতুতে জমিতে অপ্রয়োজনীয় জল দাঁড়াতে দেয় না। পরবর্তীকালে জলের অভাবের সময়ও এই ধরনের জমির মাটিতে জল বেশি দিন সঞ্চিত থাকে এবং ফলন বেশি দেয়। চাষিরা তাই বলদ-টানা লাঙ্গল দিয়ে এই ধরনের জমির পুনর্বিন্যাস করতে পারেন ও সেখানে সহজেই সোয়াবীন, ভুট্টা, অড়হর এবং ছোলা চাষ করতে পারেন। তাছাড়া এই অঞ্চলের চাষিরা প্রথাগতভাবে সোয়াবীনের পরিবর্তে নতুন ফসলচক্র যেমন—ভুট্টা-ছোলা, সোয়াবীন/ভুট্টা অন্তর আবাদ-ছোলা এবং ভুট্টা/অড়হর অন্তর আবাদ গ্রহণ করতে পারেন। বর্ষার যে অতিরিক্ত জল বয়ে যাবে, তা ওই অঞ্চলের পুকুরে ধরে রাখা যেতে পারে, যাতে প্রয়োজনের সময় ফসলে জীবনদায়ী সেচের বন্দোবস্ত করা যায়। এর ফলে ওই সব অঞ্চলে মোট উৎপাদন অনেক বাড়বে, উৎপাদন উপাদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং দীর্ঘস্থায়ী ফলন দেবার মতো স্বাস্থ্য বজায় থাকবে মাটির।

ফসল বৈচিত্র্য ও ভূমির পুনর্বিন্যাস : উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিপ্রেক্ষিত

সাধারণভাবে বলতে গেলে, উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলের মাটিতে জৈব কার্বনের পরিমাণ ও অন্যান্য খাদ্যোপাদানের মাত্রা বেশি। এর একটা প্রধান কারণ হল জমির চারপাশের ছোটো ছোটো পাহাড় ও টিলা থেকে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটির খাদ্যোপাদান জমিতে বয়ে আসে। সাধারণ চাষিরা তাই কোনও রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করেই ধান চাষ করেন, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে চাষিরা প্রতি ৩-৪ বছর অন্তর অল্প মাত্রায় (৫ টন/প্রতি হেক্টরে) জৈব সার, যেমন খামার সার ব্যবহার করেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও, বর্ষার পরে ও রবি মরশুমে জলের অভাব প্রকট হয়। সেজন্য রবি মরশুমে চাষিরা বিশেষ কোনও ফসল ফলাতে পারেন না। চাষিদের এই সঙ্কটের অবসানের জন্য বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, এই অঞ্চলের জমিকে উত্থাপিত মাদা (raised and sunken bed)-এইভাবে জমির পুনর্বিন্যাস করেই রবি মরশুমে ফসলে জলের জোগান বাড়ানো যায় এবং ফলনও বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে এই পদ্ধতিতে জমির নিচু অংশে জল প্রায় ৯০-১০০ দিন ধরে থাকতে পারে।

খামারে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় ফসলচক্রের মধ্যে ধান-টমেটো, এই চক্র সবচেয়ে বেশি ধানের তুল্য ফলন দিয়েছে (২১৪ কুইন্ট্যাল/হেক্টরে), তার পরে ধান-গাজর (২০৬ কুইন্ট্যাল/হেক্টরে) এই চক্রের স্থান। তবে গাজরের দাম বেশি হওয়ার জন্য ধান-গাজর এই ফসলচক্রে মোট আয়ের পরিমাণ সব থেকে বেশি (৬৬,৬৩৫ টাকা প্রতি হেক্টরে)। মাটির খাদ্যোপাদানের পরিমাণ বাড়াতে সব থেকে ভালো ফল দিয়েছে ধান-বীন এই চক্র; এক্ষেত্রে মাটিতে প্রতি হেক্টরে ২৭৭ কেজি সহজলভ্য নাইট্রোজেন, ৯ কেজি ফসফরাস এবং ৩৫৩ কেজি পটাশিয়ামের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে (সারণি-৪ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া মাটিতে রাইজোবিয়াম, অন্যান্য ব্যাক্টিরিয়া, ফসফরাস দ্রবণক্ষম জীবাণু এবং কেঁচোর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই অঞ্চলের পুনর্বিন্যাস করা উঁচু-নিচু মাদা জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসলচক্র লাগিয়ে দেখা গেছে যে ধান-টমেটো/মটর, এই ফসলচক্রে মাটির স্তরে জলের পরিমাণ সব থেকে বেশি ছিল (২৯.৩), কিন্তু ধান-পতিত এই ফসলচক্রে মাটির স্তরে জলের পরিমাণ অনেকটাই কম (২২.৫) ছিল। তাই ধান-টমেটো/মটর, এই ফসলচক্র সবথেকে বেশি ধানের তুল্য উৎপাদন দিয়েছে (১৮,১৩৪ কেজি/প্রতি হেক্টরে)। প্রতিদিন হিসাবে এই উৎপাদন যথেষ্ট বেশি (৭৭ কেজি/প্রতি হেক্টর/প্রতি দিন)।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শস্য পর্যায়ের বৈচিত্র্য এবং ফসলের নিবিড়তা বাড়ালে তা মাটির খাদ্যোপাদানকে প্রভাবিত করবে। এর ফলে যেমন ফলন বাড়বে, সেই সঙ্গে মাটি থেকে খাদ্যোপাদান বেশি করে অপসারিত হবে। তাই এই ধরনের কৃষি ব্যবস্থায় অপসারিত খাদ্যোপাদান অবশ্যই বাইরে থেকে সঠিক হারে ও সুষম ভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদিত শস্যের গুণমান উন্নত থাকে এবং মাটির ক্ষয় না হয়। ফসলের অবশেষ অংশ আবার জমিতে যতটা সম্ভব ফিরিয়ে দিতে হবে, যাতে ফসলের খাদ্যোপাদান সঠিকভাবে পুনরায় ব্যবহৃত হতে পারে। ফসলচক্রে শিম্বজাতীয় শস্যকে শামিল করাকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে, এতে মাটিতে নাইট্রোজেন চক্র স্বাভাবিক ভাবে কার্যকরী থাকবে। ফসফেট ও পটাশ খাদ্যোপাদানকেও বিশেষ যত্নের সঙ্গে ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিতে হবে। ফসলের চাহিদা অনুযায়ী মাটিতে উদ্ভিদ খাদ্যোপাদানের জোগানে সমতা বজায় রাখতে হবে, যাতে তা দীর্ঘদিন ধরে যথেষ্ট ফলন দেয় এবং সেই সঙ্গে পরিবেশের উপর কোনও দীর্ঘমেয়াদি বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না করে। ❑

ভারতমালা পরিযোজনা

জি. রঘুরাম

দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করে ভারতমালা প্রধানমন্ত্রীর 'নয়া ভারত'-এর স্বপ্নপূরণ করতে সাহায্য করবে। মহাসড়ক পরিবহণের বর্তমান পরিকাঠামোতে বেশ কিছু ফাঁকফোকর আছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেই সব সমস্যার সমাধান করা হবে, যা যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দ্রুতগতি ও সাবলীলতার অন্তরায়। পিছিয়ে পড়া ও জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অঞ্চল, তীর্থ ও পর্যটনস্থল, সীমান্তবর্তী এলাকা, উপকূলবর্তী অঞ্চল ও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বাণিজ্য রুট, এসব অঞ্চলের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে এই প্রকল্পে।

সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি নতুন এক পরিকল্প, 'ভারতমালা পরিযোজনা'-র কথা ঘোষণা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, 'করিডোর' বা নিরবচ্ছিন্ন সড়ক নির্মাণের রীতিকে ফের চালু করা। এর আগেও অবশ্য National Highways Development Project (NHDP) বা 'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প' শুরুই হয়েছিল 'করিডোর' নির্মাণের হাত ধরে—'সোনালি চতুর্ভুজ' বা Golden Quadrilateral (GQ), 'উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম' বা North-South-East-West (NSEW) ও বিভিন্ন পর্যায়ে বন্দরগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন সূত্রে। তবে সময়ের সাথে সাথে তা 'প্যাকেজ' রীতি অনুসরণের দিকেই ঝুঁকে পড়ে।

৮৩ হাজার ৬৭৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা বানানোর এই বিশাল মহাযজ্ঞের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬.৯২ লক্ষ কোটি টাকা। প্রথম দফায় নির্দিষ্টভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে ৩৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় সড়ক নির্মাণের উপর, ব্যয় হবে আনুমানিক ৫.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, 'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প'-এর বকেয়া ১০ হাজার কিলোমিটারের কাজ এই প্রথম দফার আওতায় শামিল করে শেষ করা হবে।

নির্দিষ্ট পনেরোশো স্থানে (points) যান চলাচল বিষয়ে তথা OD (origin destination) Survey বা 'উৎস-গন্তব্য'-এর ওপর সমীক্ষার কাজ চালিয়ে তারই ভিত্তিতে নতুন করে ২৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ চিহ্নিত করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিকল্পনা বেশ সুষ্ঠু ধাঁচের, তবে সমস্যা হল 'উৎস-গন্তব্য'-এর ওপর RITES (ভারতীয় রেলের আওতাধীন পরিবহণ সংক্রান্ত পরমার্শদাতা সংস্থা)-এর করা সমীক্ষাটি এক দশকের পুরোনো। হাতে-কলমে ও স্বয়ংক্রিয় (ক্যামেরার সাহায্যে) গণনা পদ্ধতির মাধ্যমে যান চলাচল বিষয়ে সমীক্ষা চালিয়ে ভিড়ভাট্টাপূর্ণ ঘিঞ্জি এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

উল্লিখিত ২৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটারের আওতায় 'সোনালি চতুর্ভুজ' (GQ) ও 'উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম' (NSEW), এই দুই করিডোর প্রকল্পের লেন সম্প্রসারণ ও যানজটমুক্তি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের ৫ হাজার কিলোমিটারকে শামিল করা হয়েছে। 'সোনালি চতুর্ভুজ'-কে ছয়-লেনবিশিষ্ট করাটা 'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প'-এরই একটা অঙ্গ, যার খানিকটা অংশের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। কিন্তু পরিবেশগত ছাড়পত্র, বেশ কিছু এলাকায় জমি অধিগ্রহণে সমস্যা ও অংশীদারদের তরফে চুক্তিভঙ্গের মতো ঝামেলার দরুন এই কর্মকাণ্ড বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। মাত্র ৮০০ কিলোমিটার পথকেই 'এক্সপ্রেসওয়ে' (অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যান চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট সড়ক) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[লেখক অধিকর্তা, 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট', ব্যাঙ্গালোর। ই-মেল : graghu@iimb.ac.in.। গবেষণায় সহায়তার জন্য লেখক শচীন আর্যের কাছে কৃতজ্ঞ।]

এখনও পর্যন্ত অভিজ্ঞতা যা হয়েছে তার ভিত্তিতে আগামী দিনে কাজ চালাতে কিছু পাঠ নেওয়া দরকার।

১। **প্রকল্প নির্বাচন :** উৎস ও গন্তব্যের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট অংশবিশেষে যান চলাচলের গতিপ্রকৃতি সমীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচেষ্টা। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতা থেকে মুম্বাই, পূর্ব-পশ্চিম করিডোর (east-west corridor) গোটাটাই চার লেনবিশিষ্ট করাটা জরুরি বলে ধরা হয়েছিল। এর প্রয়োজন আগেও ছিল বটে, তবে রাজনৈতিক কারণে (যার জেরে সৌরাষ্ট্র থেকে শিলচর পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম করিডোর গড়ে ওঠে) ও গোটাটাই অভিন্ন জাতীয় সড়ক রুট নয় বলে (তিন ও ছয় নম্বর জাতীয় সড়ক, অর্থাৎ, NH 3 ও NH 6 মিলে কলকাতা-মুম্বাই যাত্রাপথ গড়ে উঠেছে) NHDP-তে এদিকে নজর দেওয়া হয়নি।

২। **রূপায়ণ পর্ব ও অর্থলগ্নি :** 'সোনালি চতুর্ভুজ' (GQ) নির্মাণের সময় প্রথমবার এত বড়োমাপের কর্মকাণ্ডে Public-Private Partnership (PPP) বা সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মডেল অনুসরণ করা হয়। তবে তা ফলপ্রসূ না হওয়ায় 'সোনালি চতুর্ভুজ' (GQ) নির্মাণের কাজ শুরু হয় Engineering, Procurement, Construction (EPC) মডেল অনুসরণে। পাশাপাশি অন্যান্য করিডোরগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশি করে PPP মডেল অনুসরণে জোর দেওয়া হয় (বিশেষত যখন কেন্দ্রীয় সড়ক তহবিলের সঙ্গে viability gap funding, অর্থাৎ, অর্থনীতির দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হলেও, অর্থলগ্নির দিক থেকে বাস্তবসম্মত নয়, এমন প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দের ধারণা যুক্ত করা হয়)। যাহোক, রাজস্ব ঝুঁকি একটি বড়ো উদ্বেগের বিষয় হওয়ায় Hybrid Annuity Model আমদানি করা হয়, যেখানে সরকারি কর্তৃপক্ষ রাজস্ব ঝুঁকির দায় নেয় আর ভরতুকিপ্রাপ্ত বেসরকারি অংশীদার (Concessionaire) বহণ করে থাকে শুধু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ঝুঁকি। বেসরকারি অংশীদারদের কাছে এই মডেল বেশ আকর্ষণীয় বলে আশা করা যেতে পারে। EPC মডেলের দিকেও সরকার নজর দিচ্ছে বেশি করে। কারণ, কেন্দ্রীয় সড়ক তহবিলের পাশাপাশি টোল শুল্কের মাধ্যমে আয়ের সুযোগের দরুন অর্থলগ্নির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বেশি।

৩। **জমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত ছাড়পত্র :** এসংক্রান্ত সমস্যাগুলি চিরকালই থাকবে, এবং তার সুষ্ঠু সমাধানসূত্র খুঁজতে হবে। আদপে সব ধরনের ছাড়পত্র জোগাড় করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের/সরকারের ওপর থাকাটাই শ্রেয়। পক্ষান্তরে, বেসরকারি অংশীদার সরাসরি এসে প্রকল্পের কাজে হাত দেবে ('plug and play' mode)। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল, এই সময়পর্বে নতুন জমি অধিগ্রহণ বিল পাস হওয়ায় বাঁচোয়া। তবে, পরিবেশগত ছাড়পত্রের নিয়মাবলি, বিশেষত বন সংরক্ষণ সংক্রান্ত নিয়মকানুন, আরও বেশি কড়া। এর জেরে, আগেই যেসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে বেসরকারি অংশীদাররা ফ্যাসাদে পড়েছে। তবে বিলটিতে যেসব সংস্থান রাখা হয়েছে, আশা করা যেতে পারে তার পর আর নতুন কোনও নিয়মকানুন প্রণয়ন করার প্রয়োজন আপাতত পড়বে না। তবে 'plug and play' তত্ত্ব অনুসরণ নিয়েও সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। এর জন্য প্রায়শই কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। এবং 'করিডোর' নির্মাণের মতো অখণ্ড প্রকল্প ভেঙে ভেঙে 'প্যাকেজ'-ভিত্তিক প্রকল্প হিসাবে রূপায়িত হচ্ছে।

৪। **ভাবনায় অভিনবত্ব :** জাতীয় সড়কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে 'সোনালি চতুর্ভুজ' (GQ) গড়া ও জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে 'উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম' (NSEW) করিডোর নির্মাণ ভাবনা হিসাবে বেশ অভিনব। একই কথা খাটে 'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প'-এর বকেয়া দফার কাজ সম্পর্কেও। মামলামোকদ্দমা ও অন্যান্য জটিলতার দরুন এসব প্রকল্প রূপায়ণের গতি হয় অত্যন্ত শ্লথ হয়ে যাচ্ছে, বা কাজই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রকল্প সড়ক উন্নয়নের বিষয়ে আরও দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এজন্য অগ্রাধিকারের নিরিখে পরিকল্পনায় কিছু রদবদলও করা হয়েছে। অবশ্য, 'এক্সপ্রেসওয়ে'-এর ওপর বেশি করে জোর দিলে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ করিডোরগুলিরও কাজে আরও গতির সঞ্চার হ'ত।

৫৫০-টি জেলাকে জাতীয় সড়কের সঙ্গে জুড়বে ভারতমালা

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক, জাহাজ, জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন, গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রী সম্প্রতি 'ভারতমালা পরিযোজনা'-র কথা ঘোষণা করেন। ২০১৮ সালের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার কথা। এর জন্য ব্যয় হবে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা। ভারতমালা পরিযোজনা, মহাসড়ক সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিকে এক ছাতার তলায় আনছে (umbrella programme)। এই নতুন যোজনায় পরিকাঠামোগত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে সারা দেশজুড়ে সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থাকে যানজটমুক্ত করে তুলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতিসঞ্চার করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে.

দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করে ভারতমালা প্রধানমন্ত্রীর 'নয়া ভারত'-এর স্বপ্নপূরণ করতে সাহায্য করবে। মহাসড়ক পরিবহণের বর্তমান পরিকাঠামোতে বেশ কিছু ফাঁকফোকর আছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেই সব সমস্যার সমাধান করা হবে, যা যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দ্রুতগতি ও সাবলীলতার অন্তরায়। পিছিয়ে পড়া ও জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অঞ্চল, তীর্থ ও পর্যটনস্থল, সীমান্তবর্তী এলাকা, উপকূলবর্তী অঞ্চল ও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বাণিজ্য রুট, এসব অঞ্চলের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে, এই প্রকল্পে।

বর্তমানে দেশে ৬-টি জাতীয় করিডোর আছে। ভারতমালার দৌলতে এই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়াবে ৫০-এ। এখন মোট পণ্য পরিবহণের মাত্র ৪০ শতাংশ হয়ে থাকে জাতীয় সড়কপথে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর সেই অংশভাক বেড়ে হবে ৭০-৮০ শতাংশ। গোটা দেশের ৫৫০-টি জেলাকে জাতীয় সড়কের সঙ্গে জুড়বে ভারতমালা। এখনও পর্যন্ত মাত্র ৩০০-টির মতো জেলারই সেই কৌলীন্য আছে। দেশের

Logistic Performance Index (LPI)-এর ওপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এই প্রকল্প। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রকল্প রূপায়ণ পর্বে সড়ক নির্মাণকার্য, সংলগ্ন এলাকায় সুযোগসুবিধা ও পরিষেবা প্রদানের পরিকাঠামো গড়ে ওটা, এবং উন্নত সড়ক যোগাযোগের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভারতমালার প্রথম দফায় মোট ২৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা বানানো হবে। 'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প' (NHDP)-এর বকেয়া ১০ হাজার কিলোমিটারের কাজও এই দফাতেই সারা হবে। সব মিলিয়ে ৩৪ হাজার ৮০০ কিলোমিটার, যার আনুমানিক নির্মাণ ব্যয় ৫,৩৫,০০০ কোটি টাকা। ২০১৭-'১৮ থেকে ২০২১-'২২, এই পাঁচ বছরের মধ্যে প্রথম দফার কাজ শেষ করা হবে। প্রথম দফার কর্মকাণ্ডের খতিয়ান পেশ করা হল সারণি-১-এ।

ভারতমালার মাধ্যমে লেন সম্প্রসারণ, তথা রিং-রোড (চক্রাকার রাস্তা), বাই-পাস ও elevated corridor এবং চিহ্নিত জায়গায় logistics park নির্মাণ করে বর্তমান জাতীয় করিডোরগুলি ('সোনালি চতুর্ভুজ' ও 'উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম') যানজটমুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাতীয় করিডোরের প্রায় ৫ হাজার কিলোমিটার ভারতমালার প্রথম দফার অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১,০০,০০০ কোটি টাকা।

যেসব সড়কপথে বিপুল পরিমাণে পণ্য পরিবহণের করা হয় বা অর্থনৈতিক করিডোর হিসাবে চিহ্নিত, এরকম ২৬ হাজার ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতমালার প্রথম দফায় ওই সড়কপথের মধ্যে ৯ হাজার কিলোমিটারের জন্য ১,২০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। সড়ক পরিবহণে নিরবচ্ছিন্নতা সুনিশ্চিত করতে ও যান চলাচলের দ্রুত গতি সর্বত্র বজায় রাখতে এই করিডোরগুলির 'end-to-end' (এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত) উন্নয়নের কথা ভাবা হয়েছে। পাশাপাশি

সারণি-১
ভারতমালার প্রথম দফার কর্মকাণ্ডের খতিয়ান

কর্মকাণ্ড	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	আনুমানিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
অর্থনৈতিক করিডোর উন্নয়ন	৯,০০০	১,২০,০০০
আন্তঃকরিডোর ও ফিডার করিডোর	৬,০০০	৮০,০০০
জাতীয় করিডোরের উন্নয়ন ও যানজটমুক্তি	৫,০০০	১,০০,০০০
সীমান্তবর্তী ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সড়ক	২,০০০	২৫,০০০
উপকূলবর্তী ও বন্দর যোগাযোগের সড়ক	২,০০০	২০,০০০
এক্সপ্রেসওয়ে	৮০০	৪০,০০০
মোট	**২৪,৮০০**	**৩,৮৫,০০০**
'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প'-এর বকেয়া	**১০,০০০**	**১,৫০,০০০**
সর্বমোট	**৩৪,৮০০**	**৫,৩৫,০০০**

ভারতমালার প্রায় ৮ হাজার কিলোমিটার আন্তঃকরিডোর (যেসব রাস্তা দু'টির বেশি করিডোরকে জোড়ে) ও সাড়ে ৭ হাজার কিলোমিটার ফিডার করিডোর (যেসব রাস্তা শুধু একটি বা দু'টি করিডোরকে জোড়ে) চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ হাজার কিলোমিটারের উন্নয়নের কাজ প্রথম দফায় সারা হবে। ব্যয় হবে আনুমানিক ৮০,০০০ কোটি টাকা। বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকাঠামোগত অসামঞ্জস্য দূর করতে এই ধরনের করিডোরগুলির উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন ৩ হাজার ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা এবং নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে ২ হাজার কিলোমিটার লম্বা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সড়কের কথাও এই পরিকল্পনার অঙ্গ। এর মধ্যে প্রথম দফায় উভয়শ্রেণি মিলিয়ে থাকছে ২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা। আনুমানিক ব্যয় ২৫,০০০ কোটি টাকা।

এছাড়াও ভারতমালার আওতার প্রায় ২ হাজার ১০০ কিলোমিটার উপকূলবর্তী সড়ক ও ২ হাজার কিলোমিটার বন্দর যোগাযোগ সড়ককে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম দফায় এর মধ্যে থাকছে ২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা, যা নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ২০,০০০ কোটি টাকা। মোট ১ হাজার ৯০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন এক্সপ্রেসওয়ে বানানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৮০০ কিলোমিটার প্রথম দফার অন্তর্গত। ব্যয় হবে আনুমানিক ৪০,০০০ কোটি টাকা। 'জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প' খাতে বকেয়া ১০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজও ভারতমালার প্রথম দফায় সারা হবে। এর জন্য ব্যয় হবে প্রায় ১,৫০,০০০ কোটি টাকা।

ভারতমালার প্রথম দফার জন্য ৫,৩৫,০০০ কোটি টাকার পাশাপাশি, মহাসড়ক ক্ষেত্রের অন্যান্য প্রকল্প, যেমন, NH(O), SARDP-NE, EAP এবং LWE-এর জন্য আরও ১,৫৭,৩২৪ কোটি টাকার প্রয়োজন। সব মিলিয়ে আগামী পাঁচ বছরে এই খাতে আনুমানিক ৬,৯২,৩২৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এর জন্য ২০১৭-'১৮ থেকে ২০২১-'২২-এ কেন্দ্রীয় সড়ক তহবিল থেকে বরাদ্দ হচ্ছে ২,৩৭,০২৪ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ ৫৯,৯৭৩ কোটি টাকা, Tolling, Operation Maintenance and Transfer (ToT) সূত্রে সাম্ভাব্য আয়ের থেকে ৩৪,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ, আর জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ বা NHAI 'স্থায়ী সেতু ফি তহবিল' বা Permanent Bridge Fee Fund (PBFF)-এ সংগৃহীত শুল্ক থেকে দেবে ৪৬,০৪৮ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সব মিলিয়ে প্রায় ৬০০-টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পকে ভারতমালার আওতায় আনা হয়েছে।❑

জলসম্পদ অডিট

জলই জীবন। কথাটা আমরা শুনে আসছি সেই ছেলেবেলা থেকেই। তা সত্ত্বেও, জল নামক প্রাকৃতিক সম্পদটার প্রাচুর্যতা এবং বিনামূল্যে মেলে বলেই হয়তো যতটা গুরুত্ব তার প্রাপ্য, কখনই জল জিনিসটাকে আমরা সেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি না। আর তাই জল সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টায় খামতিটাও রয়ে গেছে বরাবরই। কিন্তু বর্তমানে রদবদল ঘটে গেছে পুরো দৃশ্যপটটিরই। জল সঙ্কট এখন এক বিশ্বজনীন সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। হিসাব করে দেখা গেছে ২০৩০ সাল নাগাদ জলের চাহিদা বর্তমানের তুলনায় ৪০ শতাংশেরও বেশি বাড়বে। ওই বছরই বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক এমন সব অঞ্চলে বসবাস করবে, যেখানে জলসম্পদ অতি বাড়ন্ত। ভারতও অচিরেই এমন এক দেশে পরিণত হতে চলেছে, জলের টানাটানি যার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠবে। কাজেই জলসম্পদ সুরক্ষার লক্ষ্যে আমাদের আশু কাজে নামাটা জরুরি। জলের ব্যবহার যথাসম্ভব কমানো এবং খুব হিসাবনিকাশ করে মাথা খাটিয়ে জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাই তাই আমাদের ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত। জলের এই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অন্যতম কার্যকরী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে জলসম্পদ অডিট। জলের ন্যূনতম অপচয় এবং প্রতি বিন্দু জলের যতদূর সম্ভব কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে এই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদটির যথাযথ সংরক্ষণই জলসম্পদ অডিটের মূল উদ্দেশ্য। এর জন্য দরকার ঘর-গৃহস্থালী, শক্তি বা বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্প, এই সব ধরনের ক্ষেত্র ও তার সাথে সাথে সেচের কাজে জলের ব্যবহার যতদূর সম্ভব কমানো তথা সঠিক পন্থায় জলের পুনর্ব্যবহার। এ ধরনের অডিট এই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদটির বণ্টন ব্যবস্থা এবং জল ব্যবহারকারীদের পরিসংখ্যানের

এক বিশদ চিত্র তুলে ধরে। ফলত, জলসম্পদের সহজতর ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সুযোগ তৈরি হয়।

জলসম্পদ অডিটের বিভিন্ন ধাপ

➢ **জল সরবরাহ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত সমীক্ষা :**

জলসম্পদের উৎস ও বণ্টন নেটওয়ার্ক (জল সরবরাহ পরিষেবার একেবারে শেষ গন্তব্য, জলসম্পদ ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত) তথা বর্জ্য জল ও অতিরিক্ত জলের গতিবিধি বিষয়ে বিস্তারিত নকশা তৈরি হল জলসম্পদ অডিটের মূল বিষয়। বিভিন্ন 'কি পয়েন্ট'-এ জলের প্রবাহ পরিমাপের যে যন্ত্রাদি বসানো হয় তার অবস্থান ও কার্যক্ষমতা, জল সরবরাহ ব্যবস্থায় জলের পাইপের ব্যাস ও ফিটিংস এসবই এই নকশার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে জলের সুষ্ঠু ব্যবহারের পরিকল্পনা ও ভবিষ্যতের চাহিদার রূপরেখা তৈরি করতে হলে জলসম্পদের বর্তমান উৎসগুলি থেকে কতটা কী মাপের ও মানের জল মিলছে, আগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলসম্পদ ব্যবহারের প্রকৃতি এসবের বিশদ সমীক্ষা নিতান্ত জরুরি। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো এবং নিকাশি জল পরিশোধনের পর পুনর্ব্যবহার, এই দুই উপায়ে জলের উৎসের সুস্থায়ী বিকাশ কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্য পরিসংখ্যানও এজন্য ধর্তব্য।

➢ **সরবরাহ প্রক্রিয়া সমীক্ষা :**

জল সরবরাহ ব্যবস্থায় বেশ কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় রয়েছে। অপরিশোধিত জলের উৎস থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিশোধন প্ল্যান্টে জল পরিবহণ, প্ল্যান্ট থেকে পরিশোধিত জল মজুত ভাণ্ডারে পরিবহণ, সেই মজুত ভাণ্ডার থেকে আবার বণ্টন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তা উপভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত। উৎস থেকে শুরু করে উপভোক্তাবিশেষের কাছে

পৌঁছানো ইস্তক, গোটা সরবরাহ ব্যবস্থার বিভিন্ন ধাপে কী পরিমাণ জল অপচয় বা বিনষ্ট হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত তার হিসাবনিকাশ রাখতে সরবরাহ ব্যবস্থার যাবতীয় স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে জল প্রবাহ পরিমাপক যন্ত্রপাতি বসানো হয়। ভবিষ্যতে জল সরবরাহ ব্যবস্থার পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও আধুনিকীকরণের কাজে এধরনের সমীক্ষা বেশ উপকারে লাগে।

➢ **জলের গুণমান :**

যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে, তাতে উপস্থিত দূষক পদার্থের প্রকৃতি ও মাত্রার উপর ভিত্তি করে জলের গুণমান নির্ণয় করতে জল বণ্টন ব্যবস্থার স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টগুলিতে নিয়মিত নজরদারির সংস্থান রয়েছে। সরবরাহ করা জল কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তথা সেজন্য কতটা কম বা বেশি পরিশোধিত জল প্রয়োজন, তার ভিত্তিতেই নকশা প্রস্তুত করে জল পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

➢ **জল সরবরাহ ব্যবস্থার অডিট :**

সেচ ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, ঘর গৃহস্থালীর কাজে জল সরবরাহ, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ-সহ আরও অন্যান্য হরেক ক্ষেত্রে জলের প্রচুর ব্যবহার হয় এবং সেই জল সরবরাহের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থাও রয়েছে। বর্তমানে কী পরিমাণে জল ব্যবহৃত হচ্ছে তথা এই সমস্ত জল সরবরাহ ব্যবস্থায় কার্যদক্ষতা ও রক্ষণাবেক্ষণের মান যাচাই করতে ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে সমীক্ষা করা জরুরি। বর্তমান ব্যবস্থার হালহকিকতের উপরই নির্ভর করে এক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ বা মানোন্নয়নের কতটা কী সুযোগসুবিধা রয়েছে। চালু সরবরাহ ব্যবস্থা কতখানি উপযোগী, কর্মদক্ষ এবং নিখুঁত তা যাচাই করে দেখাটা নিতান্ত জরুরি। এজন্য একেবারে জল সংগ্রহ থেকে শুরু করে উপভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যাবতীয় ধাপ বা পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত প্রয়োজনীয় মাপজোখের রীতি মেনে চলতে হবে। জেলা, অঞ্চল স্তরে মিটার বসানোর সংস্থান করে মোটের উপর কী পরিমাণ জল সরবরাহ হচ্ছে তার হিসাব রাখতে হবে। পাশাপাশি, উপভোক্তাদের জন্য বসাতে হবে জল-কর রাজস্ব মিটার। কতটা কী বর্জ্য জল উৎপন্ন হচ্ছে, সরবরাহকৃত জলের কতটা স্রেফ অপচয় হচ্ছে এবং তা কোথায় যাচ্ছে, তার হদিশ পেতে কাজে লাগবে মিটার বসানোর পন্থা।

➢ **পরিত্যাজ্য জলের খতিয়ান :**

গৃহস্থালীর বর্জ্য জল, সেচ ব্যবস্থায় কাজে না লাগা অতিরিক্ত পরিমাণ জল, কলকারখানার নিকাশি বর্জ্য জল ইত্যাদি নিয়েও বিস্তারিত সমীক্ষা চালানো দরকার। যাতে করে এর দরুন পরিবেশের অবনমন না ঘটে, উল্লিখিত বর্জ্য বা অতিরিক্ত জলসম্পদ থেকে মূল্যবান উপজাত পদার্থ নিষ্কাশন সম্ভবপর হয়, তথা এই জলসম্পদকে পুনর্ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়।

➢ **জলসম্পদের অডিট রিপোর্ট :**

নির্দিষ্ট কোনও জল সরবরাহ ব্যবস্থার জলসম্পদের অডিটের কাজে হাত দেওয়ার আগে যথাযথ পরিকল্পনা করে, তথা উন্নত মানের পদ্ধতি অনুসরণে এগোনো উচিত। কোনও পরিষেবা প্রদানে কী পরিমাণ জল বরাদ্দ করা হচ্ছে এবং কী পরিমাণ জল প্রকৃতপক্ষে সেই খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাকে ভিত্তিস্বরূপ গণ্য করে জলসম্পদ অডিটের কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট পরিষেবা খাতে জলের অপচয়ের পরিমাণ হিসাব করে এবং সরবরাহ ব্যবস্থার কার্যকুশলতা যাচাইয়ের পর, এর মধ্যে কী পরিমাণ জল পুনরুদ্ধার সম্ভব ও পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যেতে পারে, তথা তার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তার তালিকা তৈরি করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জলসম্পদ ব্যবহার হয় সেচের কাজে। বর্তমানে দেশে মোট ব্যবহৃত জলের ৮৩ শতাংশই ব্যয় হয় এই খাতে। কাজেই জলসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সবচেয়ে বেশি সুযোগও সেচের সূত্রেই কাজে লাগানো যেতে পারে বলে বিবেচনায় রাখতে হবে। এই সূত্রেই অবশ্য 'প্রতি জলবিন্দুর দৌলতে আরও বেশি ফলন' এই মন্ত্রসিদ্ধির পথও সুগম করে তোলার উপর জোর দেওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জলসম্পদ ব্যবহারের নিরিখে সামান্যতম কার্যকুশলতাও যদি বাড়ানো যায় তাহলেই পরিণামে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জলসম্পদ বাঁচানো যেতে পারে। যা কিনা ফের সেচ এলাকার সম্প্রসারণেরই কাজে লাগানো সম্ভব হবে। তবে শুধু সেচের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেও প্রকৃতির এই অমূল্য দান, জলসম্পদকে বাঁচানো আজ সময়ের অমোঘ দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে বৈকি।❑

সংকলন : যোজনা ব্যুরো

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফৎ অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানতে পারেন।

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : ভারতীয় সংবিধান

১. বছরের কোন দিনটিকে জাতীয় সংবিধান দিবস হিসাবে পালন করা হয়?
২. ভারতীয় সংবিধান প্রস্তুত করতে কত দিন সময় লেগেছিল?
৩. ২৬ নভেম্বর দিনটিকে কেন জাতীয় সংবিধান দিবস হিসাবে পালন করা হয়?
৪. কোন দিনটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়?
৫. সামগ্রিকভাবে কোন আইনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সংবিধানের কাঠামো?
৬. ১৯৫১ সালে প্রথমবার সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানে কত নং তপশিলটি যুক্ত করা হয়?
৭. কেন্দ্রের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary Power) প্রদান বিষয়টি কোন দেশের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে?
৮. ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানে ৫১(এ) ধারা যোগ করে কোন বিষয়ের উল্লেখ করা হয়?
৯. অধস্তন আদালতগুলি নিজেদের এক্তিয়ার-বহির্ভূত মামলার বিচার করলে ঊর্ধ্বতন আদালত কীভাবে সেই রায় নাকচ করে দিতে পারে?
১০. কত নং ধারা অনুযায়ী অবশিষ্ট বিষয়গুলিতে (Residuary Power) আইন প্রণয়নের একমাত্র অধিকার কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত?
১১. কার পূর্বসম্মতি ছাড়া বিদ্যমান রাজ্যগুলির সীমা পরিবর্তন সংক্রান্ত বিল সংসদে পেশ করা যায় না?
১২. কেন্দ্রে মন্ত্রীদের কার্যকালের মেয়াদ কার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল?
১৩. সংবিধানের কত নং ধারা হিসাবে একই ব্যক্তিকে একাধিক রাজ্যের রাজ্যপাল হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে?
১৪. রাজ্য আইনে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারলেও কোন ধরনের অপরাধীদের রাজ্যপাল ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন না?
১৫. সংবিধানের কত নং ধারায় বলা আছে যে, লোকসভায় কাজকর্ম পরিচালনা করতে স্পিকার যেসব পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত নেন তা নিয়ে কোনও আদালতই বিচার করতে পারে না?
১৬. দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যেকার বিরোধের মীমাংসা সুপ্রিম কোর্টের কোন ধরনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে?
১৭. ভারতের যে কোনও আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করার জন্য বিশেষ অনুমতি দিতে পারলেও একমাত্র কোন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনের জন্য সুপ্রিম কোর্ট অনুমতি দিতে অপারগ?
১৮. সংবিধানের কত নং ধারায় নির্বাচন কমিশন নামক স্বাধীন সংস্থা গঠনের বিধান দেওয়া হয়?
১৯. রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগের প্রস্তাবটি সংসদের কোনও কক্ষে পেশ করতে হলে তার কতদিন আগে লিখিত নোটিশ দিতে হবে?
২০. কোন দু'টি দেশ বাদে বিশ্বের বাকি সব দেশে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট কিছু শর্তপূরণ করলে 'ওভারসিজ সিজিটেন অব ইন্ডিয়া' হিসাবে গণ্য হতে পারেন?
২১. দলত্যাগ বিরোধী আইন সংবিধানের কত নং তপশিলের বিষয়বস্তু?
২২. কোনও বন্দিকে বেআইনিভাবে আটক করে রাখা হয়েছে কি না, তা বিচার করার জন্য বন্দিকে সশরীরে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিতে আদালত কোন লেখ (Writ) জারি করে?
২৩. সংবিধানের ৫০ নং ধারা অনুযায়ী বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় কোন অধ্যায়ে?
২৪. ১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে তা কী ধরনের অধিকার হিসাবে স্বীকৃত?
২৫. কোনও ব্যক্তির মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সেই অধিকার বলবৎ করার জন্য তিনি যে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হতে পারবেন, সংবিধানের কত নং ধারায় তা উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর :

১. ২৬ নভেম্বর। ২. ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন। ৩. সংবিধান সভায় দীর্ঘ বিতর্কের পর ১৯৪৯ সালের ওই দিনটিতে সংবিধান গৃহীত হয়। ৪. ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। ৫. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। ৬. নবম তপশিল। ৭. কানাডা। ৮. নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য। ৯. উৎপেষণ লেখ (Writ) জারি করে। ১০. ২৪৮ নং ধারা। ১১. রাষ্ট্রপতির সম্মতি। ১২. রাষ্ট্রপতির। ১৩. ১৩৫ নং ধারা। ১৪. মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সামরিক আইনে দোষী সাব্যস্ত অপরাধী। ১৫. ১২২ নং ধারা। ১৬. মূল এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষমতা (Original Jurisdiction)। ১৭. সামরিক আদালত। ১৮. ৩২৪ নং ধারা। ১৯. ১৪ দিন আগে। ২০. পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। ২১. দশম তপশিল। ২২. হেবিয়াস কর্পাস। ২৩. চতুর্থ অধ্যায় (রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ)। ২৪. আইনি অধিকার। ২৫. ৩২ নং ধারায়।❑

যোজনা ||| নোটবুক

এবারের বিষয় : রসগোল্লা বাংলারই

পুরীর জগন্নাথধামের ভোগের সাক্ষ্য অবধি দাখিল করা হয়েছিল বাংলার রসগোল্লার বিরুদ্ধে। কিন্তু ধোপে টিকল না কোনও যুক্তিই। গত ১৪ নভেম্বর, 'বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবসে' বাংলার জন্য এ হেন স্বীকৃতি আদায় নিয়ে হাসিঠাট্টা চললেও রসগোল্লার হক নিয়ে ওড়িশার সঙ্গে কাজিয়ায় শেষ হাসিটা হাসল বাংলাই। বছর দুয়েক আগে পুরীতে জগন্নাথদেবের নবকলেবরের আগে থেকে ওড়িশার রসগোল্লার প্রাচীনত্ব নিয়ে এই তাল ঠোকাঠুকির শুরু। কটকের কাছে পাহালের রসগোল্লাই আদি রসগোল্লা বলে দাবি করে জিআই-আদায়ের জন্য প্যানেল গড়েছিল ওড়িশা। কিন্তু নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে রসগোল্লার জিআই-এর জন্য আর্জি পেশের কাজ সেরে ফেলে বাংলা। জিআই কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয় কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলার রসগোল্লা নমুনাও। উল্লেখ্য, বাংলার রসগোল্লার হয়ে জিআই-আদায়ের জন্য রসগোল্লার উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত নথি এবং ইতিহাসবিদদের সংগৃহীত তথ্য সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করেছিলেন, রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানবিদ্যা উন্নয়ন নিগমের অন্তর্গত 'পেটেন্ট ইনফর্মেশন সেন্টার'-এর সিনিয়র সায়েন্টিস্ট মহুয়া হোমচৌধুরী।

জিআই কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : রসগোল্লার বয়স খুব বেশি হলে ১৫০ বছর। বাগবাজারের নবীন দাশ বা ফুলিয়ার হারাধন ময়রাদের হাতে তার শ্রীবৃদ্ধি। তাছাড়া, মধ্য যুগে দুধ ছিন্ন করে সৃষ্ট ছানা দেবতার নৈবেদ্যর উপযোগী নয় বলেই ধরা হ'ত। ছানা থেকে খাদ্যসামগ্রী তৈরির কৌশল সপ্তদশ শতকে বাংলাকে শেখায় পর্তুগিজরা। পরে ছানা দিয়ে মিষ্টি তৈরির কৌশল একান্তই বাংলার। বাংলার রসগোল্লার বৈশিষ্ট্য হিসেবে, নিখাদ গরুর দুধের ছানা ও চিনির রসের উপাদানের কথাও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব পাঁচ উৎপাদনের 'জিআই' ট্যাগ পেতে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। প্রথম চারটি অর্থাৎ সীতাভোগ-মিহিদানা, তুলাইপাঞ্জি ও গোবিন্দভোগ চাল নিয়ে সমস্যা খুব একটা ছিল না। গোল বেঁধেছিল পাঁচ নম্বর, অর্থাৎ, রসগোল্লাকে নিয়ে। রসগোল্লা তাদের নিজস্ব বলে দাবি করে ওড়িশা। তাদের মতে, রথযাত্রা শেষে সাত দিন মাসির বাড়ি কাটিয়ে মন্দিরে ফেরার সময়ে রসগোল্লাই জগন্নাথদেবের 'পাসওয়ার্ড'। স্ত্রী লক্ষ্মীর মান-ভঞ্জন করে মন্দিরে ঢুকতে হয় তাঁকে। হাঁড়ি-ভরা রসগোল্লা দিয়েই বৌয়ের মন গলান তিনি। রীতি মেনে এখনও মন্দিরের সেবায়েতদের একাংশ লক্ষ্মীর হয়ে ঝগড়া করেন। কেন স্ত্রীকে ফেলে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন জগন্নাথ! রীতিমাফিক এই তর্কে হার হয় জগন্নাথের প্রতিনিধিরই। মন্দিরে ঢুকতে না পেরে জগন্নাথ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন বলে একটা সময়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না মুখ্য দয়িতাপতি। পরের বার এমন ভুল আর করবেন না, বলে স্বামীর তরফে আশ্বাস পেয়ে মন গলে লক্ষ্মী ঠাকরুণের। মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের কাছে লক্ষ্মী-নারায়ণের পুষ্পাঞ্জলি পুজোর পরেই রসগোল্লা-ভোগ স্ত্রীকে অর্পণ করেন জগন্নাথ। পুরী মন্দিরের এই ট্র্যাডিশনকে হাতিয়ার করেই ওড়িশার দাবি, রসগোল্লা আসলে উৎকলজাত। আর তাই জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে খাজা-গজার শ্রীক্ষেত্র এখনও এক দিনের জন্য রসগোল্লা-নগরী হয়ে ওঠে। দোকানে দোকানে রসগোল্লা-উৎসবের ধুম পড়ে।

রসগোল্লা-কথা

- মে, ২০১৫ : কটকের কাছে পাহালের রসগোল্লাই আদি রসগোল্লাই বলে দাবি করে জিআই তকমা আদায়ে তৎপর ওড়িশার ক্ষুদ্র শিল্পমন্ত্রক।
- আগস্ট, ২০১৫ : ওড়িশাকে রুখে রসগোল্লার স্বত্ব আদায়ে গবেষণাপত্র তৈরির তৎপরতা বাংলার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিমন্ত্রকের।
- ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ : জিআই আদায়ের আর্জি পেশ বাংলার।
- ১৫ জুলাই, ২০১৬ : বিশেষজ্ঞদের ১০০ পাতার রিপোর্টের ভিত্তিতে পুরীর মন্দিরের সঙ্গে ৫০০ বছরের পুরোনো রসগোল্লা-যোগের দাবি পেশ ওড়িশার।
- ২২ আগস্ট, ২০১৬ : বাংলার রসগোল্লার হয়ে জিআই কন্ট্রোলারের সামনে শুনানি ।
- ২ আগস্ট, ২০১৭ : জিআই আদায়ে প্যানেল গঠন ওড়িশার।
- নভেম্বর, ২০১৭ : জিআই কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলার বিভিন্ন জেলার রসগোল্লার নমুনা পেশ।
- ১৪ নভেম্বর, ২০১৭ : ওড়িশার আর্জি পেশের আগেই জিআই তকমা জয় বাংলার রসগোল্লার।

জিআই কী

কোনও ভৌগোলিক অঞ্চলের পরম্পরা বা সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত বিশেষ পণ্যের স্বীকৃতি হল জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (জিআই) তকমা। এই স্বীকৃতির সুবাদে পণ্যটির কৌলীন্য বাড়ে। বিপণনের সুবিধে হয়। যেমন, মেক্সিকোর পানীয় টাকিলা, দার্জিলিঙের চা বা মহীশূরের রেশম।

স্বাভাবিকভাবেই ওড়িশার এই দাবিতে আঁতে ঘা লাগে আমবাঙালির মনে রসগোল্লার 'কলম্বাস' বলে খ্যাত নবীন দাশের বংশধর তথা 'কে সি দাশ'-এর কর্তাদের। দরবার করা হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাদের হিসেব মতো, ১৮৬৮ সালে বাগবাজারের দোকানেই ধবধবে স্পঞ্জ রসগোল্লার উদ্ভাবন ঘটান 'নবীন ময়রা'। জগন্নাথদেবকে সামনে রেখে রসগোল্লা-গৌরব ছিনিয়ে নিতে চাইছে ওড়িশা। এর পরই শুরু দড়ি টানাটানি। জিআই কর্তৃপক্ষের কাছে রাজ্য সব যুক্তি পেশ করে। প্রায় দেড়শো বছর আগে রসগোল্লার অস্তিত্ব সেভাবে কারও জানা ছিল না। চৈতন্যচরিতামৃতে কিছু ছানার উল্লেখ থাকলেও তার মধ্যে রসগোল্লার নাম নেই। জগন্নাথ দেবকে দেওয়ার জন্য যে মিষ্টিটি আগে ব্যবহার করা হ'ত তার নাম সম্ভবত ক্ষীরমোহন। এর সঙ্গে রসগোল্লার কিছু মিল থাকতে পারে, কিন্তু তা আদতে ছানার নয়। এছাড়াও জিআই কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছেন, ছানা দিয়ে মিষ্টি তৈরির প্রক্রিয়াটা পুরোপুরি বাংলার নিজস্ব। দুধ 'ছিন্ন' হয়ে ছানা তৈরি হয় বলে তা দেবতাকে উৎসর্গ করার অযোগ্য—এটা ধরে নিয়ে গোটা ভারতে ছানার দ্রব্যকে পাতে দেওয়া হ'ত না। আর এই ছানা নিয়েই বাংলার মিষ্টি কারিগরদের যত কারসাজি। প্রথমে মণ্ডা, সন্দেশ, তারপর রসগোল্লা।

ইতিহাস বলছে আধুনিক রসগোল্লা ১৮৬৮ সালে বাগবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র দাশ প্রথম তৈরি করেছিলেন। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত ইতিহাসবিদ প্রণব রায়ের লেখা 'বাংলার খাবার' বইটিতে ভিন্ন মত রসগোল্লা প্রস্তুত করা নিয়ে। সেখানে বলা হয়েছে, ১৮৬৬ সালে কলকাতার ব্রজ ময়রা রসগোল্লা তৈরি করেছিলেন। ইতিহাস অনুযায়ী, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও রসগোল্লা নামক মিষ্টিটির অস্তিত্ব ছিল না। অন্য একটি মতে, নদিয়ার দিকেও রসগোল্লার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। শোনা যায়, পর্তুগিজদের কাছ থেকে দুধ থেকে ছানার খাবার প্রস্তুত করার পদ্ধতি শিখে এই মিষ্টি প্রস্তুত করা হয়। ১৯৩০-এর দশক থেকেই বাগবাজারের নবীন দাশের পুত্র কে সি দাশ-এর সংস্থার তরফে রসগোল্লা টিন-বন্দি করার প্রযুক্তি রপ্ত করা হয়।

তবে, জিআই তকমা আদায় যুদ্ধ জয়ের একটা ধাপ মাত্র। এর পর 'বাংলার রসগোল্লা'-কে মেলে ধরার যুদ্ধটা আরও বেশি কঠিন। এখন আর ভিন্ রাজ্যের কেউ যা হোক একটা কিছু 'বাংলার রসগোল্লা' বলে বিক্রি করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কিন্তু বাংলাজুড়ে ছোটো-বড়ো দোকানে রসগোল্লার মান বজায় রাখাটাও বেশ কঠিন। গোটা রাজ্যে খুব ভালো থেকে খুব খারাপ, এক লক্ষ রসগোল্লা প্রস্তুতকারী রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির কর্তারাই মনে করেন, তাদের সকলকে সংগঠিত করার কাজটা বেশ কঠিন। তবে, জিআই-তকমা দেশে-বিদেশে রসগোল্লা বা অন্য মিষ্টির ব্র্যান্ডিংয়ে বিশেষ সাহায্য করবে বলেই সরকারি কর্তারা আশাবাদী। তাদের বক্তব্য, জিআই-সংক্রান্ত পরিদর্শক কমিটির কাছে আবেদনের ভিত্তিতেই যোগ্যতা মেপে মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের 'বাংলার রসগোল্লা'-তকমা ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হবে। রসগোল্লার জন্য রাজ্যে নির্দিষ্ট লোগো তৈরিরও কাজ চলছে।❑ [*কৃতজ্ঞতা স্বীকার :* আনন্দবাজার পত্রিকা]

গোবিন্দভোগেও বাংলা পেল জিআই তকমা

রসগোল্লা পাশাপাশি, সুগন্ধের জন্য বিখ্যাত গোবিন্দভোগ চালের জিআই তকমাও পেল রাজ্য। গত ১৩ নভেম্বর কেন্দ্র সরকারের 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অব ইন্ডিয়া'-র কাছ থেকে 'বাংলার গোবিন্দভোগ' চালের জিআই শংসাপত্রটি পেয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তর। ২০১৫ সালের ২৪ অক্টোবর 'বাংলার গোবিন্দভোগ' চালের জন্য জিআই তকমা চেয়ে আবেদন করেছিল রাজ্য কৃষি দপ্তর। আবেদনে বলা হয়েছিল, গোবিন্দভোগ চাল বাংলার ঐতিহ্য। রাঢ়বঙ্গ ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় তিন শতাব্দী আগে গোবিন্দভোগ চালের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। কলকাতা শহর তৈরির সময় হুগলির বসাক ও শেঠ পরিবার গোবিন্দপুর গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে গোবিন্দ মন্দিরের খোঁজ পান। গঙ্গার ধারেই তারা এই সুগন্ধী চালের চাষ শুরু করেন। গোবিন্দের উদ্দেশে ওই চালের ভোগ দেওয়া হ'ত বলে তার নামকরণ হয় 'গোবিন্দ ভোগ'।

বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া ও দুই চব্বিশ পরগণা মিলিয়ে কয়েক হাজার চাষি গোবিন্দভোগ চাষ করেন। সংগঠিত ও অসংগঠিতভাবে বছরে কয়েকশো কোটি টাকার গোবিন্দভোগ চাল বিক্রি হয়। গোবিন্দভোগ ধান ভাঙিয়ে চাল করার জন্য বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর এলাকাতেই অন্তত গোটা তিরিশ চালকল গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ ভারত তো বটেই গোবিন্দভোগ চাল রপ্তানি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ব্রাজিলেও। জার্মানি, কানাডা এবং লন্ডন থেকেও বরাত আসছে। মূলত জৈব সারে চাষ হওয়ায় বিদেশের বাজারে গোবিন্দভোগ চালের আলাদা গুরুত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে বাজার ধরার জন্য বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণে গোবিন্দভোগের চাষ বাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। 'বর্ধমান গোবিন্দভোগ মিলার্স অ্যাসোসিয়েশন' সূত্রের খবর, অসংগঠিতভাবে বছরে ২৫ হাজার টন চাল বিদেশে যায়, যার রপ্তানি মূল্য প্রায় ১২০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, এই সরকারের আমলে বাংলা নানা কিসিমের ঐতিহ্যশালী মিষ্টি বা কৃষিজাত পণ্যের জিআই আদায়ে কোমর বেঁধে নেমেছে। আগে শিকে ছিঁড়েছিল দার্জিলিংয়ের চা বা মালদহের লক্ষ্মণভোগ আমের কপালে। গত কয়েক বছরে গোবিন্দভোগ চাল, দিনাজপুরের তুলাইপাঞ্জি চাল, জয়নগরের মোয়া, বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা ছাড়াও কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়ার জিআই-এর জন্য আবেদন করা হয়েছে। রাণাঘাটের পান্তুয়া, বহরমপুরের ছানাবড়া, বডজোড়ার মেচা সন্দেশের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে এগোনোর চেষ্টাও চলছে।

যোজনা ডায়েরি

(২১ অক্টোবর—২০ নভেম্বর, ২০১৭)

আন্তর্জাতিক

- তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বারের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কেনিয়ায়। বিরোধীদের অভিযোগে সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট গত আগস্টের নির্বাচন বাতিল করে দিয়েছিল। গত ২৬ অক্টোবর ছিল পুনঃনির্বাচন। তুমুল প্রতিবাদ-আপত্তির মধ্যেও ৮ আগস্টের ভোটে জিতেছিলেন প্রেসিডেন্ট উহুরু কেনিয়াট্টা। প্রধান বিরোধী প্রার্থী রাইলা ওডিঙ্গাকে হারিয়ে। ওডিঙ্গা সুপ্রিম কোর্টে জানান, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গলদ ছিল। শুনানির পর সুপ্রিম কোর্ট পুনর্নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে। কিন্তু এবারেও জিতলেন কেনিয়াট্টাই।
- পদচ্যুত পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল সেদেশের দুর্নীতি দমন আদালত। সম্প্রতি পানামার একটি ল'ফার্মের ফাঁস করা তথ্যে দাবি করা হয়েছিল, বিভিন্ন দেশে একাধিক আয়ের উৎস রয়েছে শরিফ ও তার তিন ছেলেমেয়ের। যার সবটাই গোপন করেছেন তারা। সেই অর্থেই লন্ডনে বিলাসবহুল বাড়িও কিনেছেন। খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট। জুলাই মাসে কোর্টের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রীত্ব হাতছাড়া হয় শরিফের। পরে শীর্ষ আদালতের নির্দেশেই গত ৮ সেপ্টেম্বর শরিফের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে দুর্নীতি দমন আদালত। কিন্তু কোনও দিনই শুনানিতে হাজির হননি শরিফ। এর পরেই এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় শরিফের বিরুদ্ধে।
- প্রায় চার দশক ক্ষমতায় থাকার পর জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবেকে গত ১৯ নভেম্বর বহিষ্কার করল তার নিজেরই দল। যে দলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মুগাবে, সেই জ্যানু-পিএফ-এরই সদস্যরা প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য সময়সীমাও বেঁধে দেন তাকে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ, পরের দিন) বর্ষীয়ান প্রেসিডেন্ট পদত্যাগের কথা ঘোষণা না করায় তাকে ইমপিচ করার পথেই হাঁটেন তারা। এর পর অবশ্য বাধ্য হয়েই সরে দাঁড়ান মুগাবে। তার স্ত্রী গ্রেসকেও দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।
- ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর আরব দেশে পা রাখল যোগ শিক্ষা। দীর্ঘ দিন ধরেই সৌদি আরবে এর প্রচলন ছিল। তবে এত দিন তাতে সরকারি স্বীকৃতি মেলেনি। গত ১৪ নভেম্বর সেই যোগ শিক্ষাকে 'স্পোর্টস' হিসেবে মেনে নিয়েছে সৌদির শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক।

- **চিনা কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেস :**

চিনা কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসের সমাপ্তি হল গত ২৬ অক্টোবর। পলিটব্যুরো স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন সদস্যদের নাম ঘোষণার কথা থাকলেও, সেখানে প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং-এর উত্তরসূরি হিসেবে কাউকেই বাছা হয়নি। ফলে আগামী পাঁচ বছর তো বটেই, তার পরেও একাধিপত্য থাকবে শি-র। কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিনের সংবিধানে জায়গা করে নিল প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং-এর নাম এবং তার রাজনৈতিক মতাদর্শ। এই সূত্রেই তার দুই প্রবাদপ্রতিম পূর্বসূরি, চিনের চেয়ারম্যান মাও জে দং এবং শীর্ষ তেনা দেং শিয়াওপিং-এর স্তরে উন্নীত হলেন শি চিনফিং।

মাও জে দং নারীকে অর্ধেক আকাশের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু প্রতি দশ বছরে দু'বার পার্টি কংগ্রেস বসলেও মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কখনওই চোখে পড়ার মতো ছিল না। এই পার্টি কংগ্রেসের পরেও সেভাবে গুরুত্ব পেলেন না মহিলারা। সাত সদস্যের পলিটব্যুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটি 'অ্যাপেক্স ৭'-এ এসেছে পাঁচটি নতুন মুখ। শীর্ষের সবাই পুরুষ। আর পলিটব্যুরোর ২৫ সদস্যের মধ্যে মাত্র এক জনই মহিলা। তিনিও দ্বিতীয় দফায় দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগের পলিটব্যুরোয় চুনলান ছাড়াও ছিলেন আর একজন মহিলা, লিউ ইয়ানদং। তিনি ছিলেন ভাইস প্রিমিয়ার। এবার নতুন করে দায়িত্ব পাননি কোনও মহিলাই। নয়া সেন্ট্রাল কমিটিতে ২০৪ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১০ জন মহিলা। অর্থাৎ, ৪.৯ শতাংশ। যদিও পার্টি কংগ্রেসে ২২৮৭ প্রতিনিধির মধ্যে এক-চতুর্থাংশ মহিলা ছিলেন।

- **বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট সিঙ্গাপুরের :**

বাজিমাত করল এশিয়ার এক ছোট্ট দেশ। ঘোষিত হল, এই মুহূর্তে, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট সিঙ্গাপুরের। সম্প্রতি, রাষ্ট্রপুঞ্জের ১৯৩-টি সদস্য দেশ ও ছ'টি অঞ্চলের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে পাসপোর্ট শক্তির নিরিখে একটি নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে 'আর্টন ক্যাপিটাল' নামের একটি সংস্থা। তাতে উঠে এসেছে এই তথ্য। এই প্রথম কোনও এশিয়ার দেশ এই মাপকাঠিতে সেরা নির্বাচিত হল। সিঙ্গাপুরের ভিসা-ফ্রি স্কোর দাঁড়িয়েছে ১৫৯।

কার পাসপোর্টের শক্তি কত, তা মাপা হয় এই ভিসা-ফ্রি স্কোর দিয়ে। এর অর্থ, কোনও দেশের পাসপোর্ট দিয়ে কতগুলি ভিন্ন দেশে বিনা ভিসায় ঢোকা যায়, বা কতগুলি দেশে ঢোকা মাত্রই ভিসা পাওয়া যায়। গত দু' বছর ধরে এই তালিকার শীর্ষে ছিল জার্মানি। সিঙ্গাপুরবাসীদের জন্য প্যারাগুয়ে ভিসার বিধিনিষেধ তুলে দেওয়ায় এক নম্বরে উঠে এল সিঙ্গাপুর। তিনেও এশিয়ারই আরেকটি দেশ, দক্ষিণ কোরিয়া। সুইডেনের সঙ্গে যুগ্মভাবে তৃতীয়।

কয়েকদিন আগেই তুরস্ক ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র মার্কিন পাসপোর্টধারীদের সঙ্গে তাদের ভিসাবিহীন সম্পর্কে ইতি টেনেছে। তাই পিছিয়ে গেছে আমেরিকা। প্রসঙ্গত, তালিকায় ৭৫-এ রয়েছে ভারত। গত বছরের ৭৮ থেকে তিন ধাপ এগিয়ে। ভারতের ভিসা-ফ্রি স্কোর ৫১। ২২ স্কোর করে, তালিকায় শেষ স্থানে আফগানিস্তান। র‍্যাংকিং ৯৪। ৯৩ নম্বরে যৌথভাবে পাকিস্তান ও ইরাক। ৯২-এ সিরিয়া, ৯১-এ সোমালিয়া। ৮৭তম স্থান পেয়েছে কিম জং উনের উত্তর কোরিয়া।

● **কেনেডি-হত্যাকাণ্ডের নথি প্রকাশ :**

২২ নভেম্বর, ১৯৬৩। ড্যালাসে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি। প্রেসিডেন্টকে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয় প্রাক্তন নৌ-সেনা লি হার্ভি অসওয়াল্ডকে। পরে পুলিশী হেফাজতেই তাকে হত্যা করে জ্যাক রুবি নামে এক ব্যক্তি। কেনেডি হত্যার তদন্তে আর কারও নাম প্রকাশ্যে আসেনি। গোপন রাখা হয়েছিল তদন্তের রিপোর্ট। এতদিনে সেই তথ্য জনসমক্ষে আনল মার্কিন প্রশাসন, তবে সবটা নয়। ২৮০০-রও বেশি নথি প্রকাশ করা হলেও বেশকিছু রিপোর্ট গোপন রাখা হয়েছে। ১৯৯২ সালে মার্কিন কংগ্রেস কেনেডি-হত্যাকাণ্ডের যাবতীয় তথ্য জনসমক্ষে আনার নির্দেশ দিয়েছিল। সে সময়ে কংগ্রেস রিপোর্ট প্রকাশের সময়সীমাও বেঁধে দেয়, ২০১৭-র ২৬ অক্টোবর। যদিও শেষ মুহূর্তে এফবিআই ও সিআইএ-র দাবি মেনে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বেশিকিছু নথি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্তে রাজি হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১৯৯২-এ মার্কিন কংগ্রেসের তৈরি 'জেএফকে অ্যাসাসিনেশন রেকর্ড কালেকশন অ্যাক্ট'-এ অবশ্য ২৫ বছর পরের প্রেসিডেন্টকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল।

● **ক্যাটালোনিয়ার পরিস্থিতি :**

ক্যাটালোনিয়ার স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নিতে গত ২৮ অক্টোবর প্রাদেশিক পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছিল স্পেন। 'অবাধ্যতার' অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছিল প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট কার্লেস পুইজদেমঁ-সহ বিচ্ছিন্নতাকামী প্রায় সব নেতাকে। পরের দিন সরানো হয় প্রদেশটির পুলিশ প্রধানকেও। আর ঠিক তার পরেই স্পেনের প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাজয়ব্রে জানিয়ে দিলেন, ক্যাটালোনিয়ায় নতুন করে ভোট হবে আগামী ২১ ডিসেম্বর।

ক্যাটালোনিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহ, উস্কানিমূলক বক্তৃতা ও সরকারি অর্থের অপব্যবহার করে স্বাধীনতা ঘোষণার অভিযোগে চার্জ গঠন করা হয়েছে। ৬ নভেম্বর ধরা দেন কার্লেস পুইজদেমঁ ও তার কয়েকজন সহযোগী। দেশদ্রোহের অভিযোগে ভাইস-প্রেসিডেন্ট-সহ আট মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আগেই। অধরা ছিলেন প্রাক্তন প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট কার্লেস পুইজদেমঁ ও তার কিছু ঘনিষ্ঠ। বেলজিয়াম আশ্রয় দিয়েছিল পুইজদেমঁকে। ৫ নভেম্বর তাই ইউরোপীয় বিশেষ আইনে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয় কার্লেস পুইজদেমঁয়ের বিরুদ্ধে। পরের দিনই আত্মসমর্পণ করেন পুইজদেমঁ। প্রসঙ্গত, স্পেনের মোট জনসংখ্যার ১৬ শতাংশের বাস ক্যাটালোনিয়ায়; রপ্তানি বাবদ দেশের মোট আয়ে এই প্রদেশের অংশভাক ২৫.৬ শতাংশ আর জিডিপি-তে অংশভাক ১৯ শতাংশ; স্পেনে হওয়া বিদেশি বিনিয়োগের ২০.৭ শতাংশ পায় ক্যাটালোনিয়া।

● **পাক-স্থিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মার্কিন তালিকা :**

পাকিস্তানের মাটিকে ব্যবহার করে নাশকতা চালাচ্ছে এমন ২০-টি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের একটি তালিকা পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছে আমেরিকা। তালিকায় শীর্ষে রয়েছে হাক্কানি নেটওয়ার্কের নাম। মূলত উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে আফগানিস্তানে নাশকতা চালায় হাক্কানি। ভারত বিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলির মধ্যে লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ এবং হরকত-উল-মুজাহিদিনের নাম রয়েছে মার্কিন তালিকায়। পাকিস্তানের মাটিকে ব্যবহার করে এই সংগঠনগুলি ক্রমাগত ভারতে সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছে আমেরিকা। লস্কর-ই-তৈবাকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে সক্রিয় জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

● **আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্টের দিল্লি সফর :**

গত ২৩ অক্টোবর এক দিনের দিল্লি সফর সারলেন অফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি। ঘানির সঙ্গে বৈঠকে জঙ্গি ও তালিবান দমনে ভারতের সামরিক সহায়তা বহুগুণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত তিন বছরে ঘানির তিনবার ভারত সফরই প্রমাণ করে দিয়েছে, আফগান সরকারের কৌশলগত অভিমুখ। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন মঞ্চে দু' দেশের নেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে মোট ১৩ বার। গত সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখ দু' দেশের 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ কাউন্সিল'-এর বৈঠকে পরস্পরের উন্নয়নে আরও ঘনিষ্ঠ অংশীদার হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

● **বিদেশমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর :**

গত ২৩ অক্টোবর সফরের দ্বিতীয় ও শেষ দিনে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বারিধারায় ভারতীয় দূতাবাসের নতুন চ্যান্সেরি ভবনের উদ্বোধন করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। ভারতীয় চ্যান্সেরি কমপ্লেক্সে দূতাবাস ছাড়াও কর্মীদের আবাসন, ক্রীড়াকেন্দ্র ও একটি আধুনিক সংস্কৃতি কেন্দ্র থাকছে। ভারতের অর্থ সাহায্যে বাংলাদেশের মাটিতে রূপায়িত হবে এমন ১৫-টি প্রকল্পেরও ওই দিন সূচনা করেন বিদেশমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে প্রত্যন্ত পিরোজপুরে ১১-টি পানীয় জল শোধনাগার, দেড় লক্ষ মানুষ যার ফলে উপকৃত হবেন। ৩৬-টি কমিউনিটি ক্লিনিকও গড়ে তোলা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ভারতের দেওয়া অর্থে নতুন করে গড়ে তোলা হবে ঢাকায় রমনার সেই কালীমন্দির, ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সেনারা যেটি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল। সাভারে হবে ইস্কনের পাঁচতলা মন্দির। সিলেটে পাঁচতলা ছাত্রাবাস।

● **ইজরায়েলে যৌথ সামরিক মহড়া :**

আট দেশের যৌথ সামরিক মহড়ায় যোগ দিতে এই প্রথমবার ইজরায়েল গেল ভারতীয় বায়ুসেনা। সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস বিমানে যাত্রা করা ৪৫ জনের এই বাহিনীতে গরুড় কম্যান্ডোরাও রয়েছেন। ভারত ছাড়া সাতটি দেশ এই মহড়ায় অংশ নিল, তাদের মধ্যে ছ'টিই ন্যাটোর পূর্ণাঙ্গ সদস্য—আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, গ্রিস, পোল্যান্ড। ইজরায়েল ন্যাটোর পূর্ণাঙ্গ সদস্য না হলেও, মেডিটারেনিয়ান ডায়ালগের অংশ হিসেবে তারা ন্যাটোর সহযোগী। ন্যাটোর বাইরের রাষ্ট্র হিসেবে এই মহড়ায় অংশ নিল একমাত্র ভারতই। ইজরায়েলে আয়োজিত এই সামরিক মহড়ার নাম 'ব্লু ফ্ল্যাগ-২০১৭'। দু' বছরে একবার এই মহড়া হয়। এ বছর ২ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত মহড়া চলে। ইজরায়েলের উভাদ এয়ার ফোর্স বেসে আয়োজিত এই মহড়ায় অংশগ্রহণকারী সব বাহিনী পরস্পরের কাছ থেকে নানা সামরিক কৌশল শেখে।

● **ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মোদীর বৈঠক :**

গত ৩১ অক্টোবর ইতালির প্রধানমন্ত্রী পাওলো জেন্তিলোনির সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর শীর্ষ বৈঠক হয়। দীর্ঘ এক দশক পর কোনও ইতালীয়

প্রধানমন্ত্রী পা রাখলেন নয়াদিল্লিতে। ওই দিন হায়দরাবাদ হাউসে মোট ছ'টি চুক্তিতে সই করে দু' দেশ। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শক্তি, রেল সুরক্ষার মতো বিষয়গুলিতে চুক্তির পাশাপাশি মোদী ও জেন্তিলোনির মধ্যে আলোচনা হল সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতা এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে। প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনার পর প্রকাশিত হয় যৌথ বিবৃতি।

● **পাকিস্তানকে এড়িয়ে পণ্য রপ্তানি আফগানিস্তানে :**

গত ৩০ অক্টোবর ইরানের চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে আফগানিস্তানে পণ্য রপ্তানি করে ভারত। অচিরেই পণ্য আনা-নেওয়ার একটি বিকল্প পথ হয়ে উঠবে এটি। আগামী কয়েক মাসে মোট ১১ লক্ষ টন গম এই পথে কাবুলে পাঠাবে নয়াদিল্লি। নতুন এই পথটির ব্যবহার বাড়লে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান যেমন লাভবান হবে, তেমনই কৌশলগত লাভ ভারতেরও। বস্তুত, পাক বাগড়ার কারণেই এই বিকল্প পথটি বেছে নিতে হয়েছে ভারত ও আফগানিস্তানকে। 'আফগানিস্তান-পাকিস্তান ট্রানজিট ট্রেড এগ্রিমেন্ট' থাকা সত্ত্বেও ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে কাবুলে পণ্য যাওয়া আটকে দিচ্ছে ইসলামাবাদ। সম্প্রতি যা নিয়ে সরব হন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি। তবে পরিবর্ত রুট চালু করার চেষ্টাটা চলছিল গত এক বছর ধরেই। ২০১৬ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইরান সফরে গিয়ে প্রথমবার আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা করা এবং একটি ট্রানজিট করিডোর তৈরির জন্য ত্রিমুখী চুক্তির ধারণা তুলে ধরেন।

● **ম্যানিলায় আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে মোদী :**

Association of South East Asian Nations (ASEAN)-ভুক্ত দেশগুলি হল থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, মায়ানমার, ক্যাম্বোডিয়া, লাওস ও ব্রুনেই। পাপুয়া নিউ গিনি ও ইস্ট তিমোর পর্যবেক্ষক সদস্য। এরই ৩১তম শীর্ষ সম্মেলন আয়োজিত হয় সম্প্রতি। গত ১৩ নভেম্বর আসিয়ান-ভারত সম্মেলন ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির বৈঠকে যোগ দিতে ম্যানিলা সফরে যান নরেন্দ্র মোদী। সম্মেলন চলাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তার পার্শ্ববৈঠকও হয়। চিনা প্রধানমন্ত্রী লি কেচিয়াং-এর সঙ্গেও কথা হয়। এছাড়া ফিলিপিন্সের রাজধানীতে এই সম্মেলনে যোগ দিতে হাজির জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী শিন্‌জো আবে ও ম্যালকম টার্নবুলের সঙ্গেও আলাদাভাবে বৈঠক করেন মোদী। গত ১৫ নভেম্বর আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

● **কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস-এর যাত্রা শুরু :**

২০০৮ সালের ১৪ এপ্রিল। আর ২০১৭ সালের ৯ নভেম্বর। 'মৈত্রী'-র পরে 'বন্ধন'। দু' দেশের সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে যাত্রা শুরু হল দ্বিতীয় ট্রেনটির। গত ১৬ নভেম্বর যাত্রী নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করে বন্ধন এক্সপ্রেস (বিস্তারিত জানতে এই সংখ্যার উন্নয়নের রূপরেখা বিভাগটি দেখুন)।

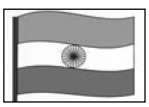

জাতীয়

➢ চিনা সাবমেরিনের নজরদারিতে মহিলা নৌসেনা নিয়োগ করা হল। ভারত মহাসাগরের উপর বিশেষ বিমান থেকে এই নজরদারি চালানো হবে। নৌসেনার তরফে জানানো হয়েছে, মার্কিন প্রযুক্তিতে তৈরি Poseidon 8-India (P-8I) এবং রাশিয়ান প্রযুক্তিতে তৈরি Ilyushin Il-38 বিমান থেকে নজরদারি চালাবে ওই বাহিনী। পাশাপাশি, শত্রুপক্ষের সাবমেরিন ভারতের জলসীমায় ঢুকে পড়লে, তা ধ্বংস করার মতো উপযুক্ত প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে তাদের।

➢ প্রত্যন্ত ত্রিপুরাকে রেলপথে সরাসরি রাজধানী নয়াদিল্লির সঙ্গে যুক্ত করতে গত ২৯ অক্টোবর সূচনা হল আগরতলা-আনন্দ বিহার (নয়াদিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেস-এর। স্বাধীনতার ২৫ বছর পর, পৃথক ত্রিপুরা রাজ্য গঠন করা হয় ১৯৭২ সালে। ২০১৪ সালের পর, প্রথমে মিটার গেজ তুলে ফেলে দেশের মূল রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে জুড়তে ত্রিপুরায় ব্রড গেজ লাইন বসানো হয়। এরপর এরাজ্যকে দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ট্রেন চালু করে রেলমন্ত্রক। এবার চালু হল রাজধানী এক্সপ্রেস।

➢ গত ২৫ অক্টোবর মাদ্রাজ হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, তামিলনাড়ুতে ব্যানার, হোর্ডিং-এ জীবিত কোনও ব্যক্তির ছবি দেওয়া চলবে না। চেন্নাইয়ের বাসিন্দা তিরুলোচনা কুমারীর একটি আবেদনের ভিত্তিতেই হাইকোর্টের এই রায়। মামলাকারীর বাড়ির সামনে একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বোর্ড, ব্যানার আর পতাকা লাগিয়ে গিয়েছিল। পুরসভাকে এসব সরাতে বলেও কোনও কাজ হয়নি।

● **বন্দর উন্নয়নের নীল-নকশা :**

দেশের ১২-টি বড়ো বন্দরের আধুনিকীকরণের নীল-নকশা (ব্লু-প্রিন্ট) তৈরি। গত ২২ অক্টোবর একথা জানান কেন্দ্রীয় জাহাজ ও সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নিতিন গড়কড়ী। এজন্য সব মিলিয়ে ১৪২-টি সম্প্রসারণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও, দেশে নতুন বন্দর তৈরির পরিকল্পনাও করা হয়েছে। একাজে মোট খরচ হবে ৯০ হাজার কোটি টাকা। চলতি বছরের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে এই ১২-টি বন্দরে পণ্য ওঠা-নামার পরিমাণ ৩.২৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২.৬৪ কোটি টনে। গত বছর তার পরিমাণ ছিল ৩১.৬১ কোটি টন। দেশের আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এই বন্দরগুলি। সেজন্য নির্দিষ্ট সময় মেনে দ্রুত এগুলির আধুনিকীকরণ জরুরি। ১৪২-টি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মধ্যে ৫৭-টিতে ইতোমধ্যেই কাজ চলছে। এবং একটির কাজ ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ। প্রসঙ্গত, এই ১২-টি বন্দরের মধ্যে রয়েছে—কলকাতা (হলদিয়া-সহ), পারাদীপ, কান্ডলা, মুম্বই, জেএনপিটি, মার্মাগাঁও, নিউ মেঙ্গালুরু, কোচি, চেন্নাই, এন্নার, ভি ও চিদম্বরনর, বিশাখাপত্তনম। দেশের পণ্য সরবরাহের ৬১ শতাংশই হয় এই বন্দরগুলির মাধ্যমে। এর মধ্যে চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ছ'মাসে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) উল্লেখযোগ্য হারে পণ্য খালাস বেড়েছে কোচিতে। তার পরেই রয়েছে কলকাতা (হলদিয়া-সহ)। সামগ্রিকভাবেও কলকাতায় পণ্য ওঠা-নামার বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১১.৯৫ শতাংশ।

● **আধার সংক্রান্ত খবরাখবর :**

❖ **সাংবিধানিক বেঞ্চ গড়ল সুপ্রিম কোর্ট :** আধার মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পাঁচ সদস্যের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করল সুপ্রিম কোর্ট। মোবাইল নম্বর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করা নিয়ে একাধিক মামলা জমে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই সমস্ত মামলাগুলোর চটজলদি নিষ্পত্তি করার জন্যই ৩০ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত নেয়। প্রসঙ্গত, সবক্ষেত্রে আধার বাধ্যতামূলক করার বিরোধিতায় আগেই সুপ্রিম কোর্টে একগুচ্ছ মামলা হয়েছে। পাঁচ বছর আগে প্রথম মামলাটি দায়ের হয়। এখন মামলার সংখ্যা ২২-এ পৌঁছেছে। গত ৩১ অক্টোবর কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেল

কে. কে. বেণুগোপাল আধার মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর কাছে আর্জি জানান।

❖ **আধার লিঙ্ক করতে কেন্দ্রের নির্দেশ বহাল :** ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার লিঙ্কের বিষয়ে কেন্দ্রের নির্দেশকেই বহাল রাখাল সুপ্রিম কোর্ট। গত ৩ নভেম্বর এই মামলার শুনানি ছিল। ওই দিন আদালত সাফ জানিয়ে দেয়, এ বিষয়ে তারা কোনও স্থগিতাদেশ জারি করবে না। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাংবিধানিক বেঞ্চই নেবে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার লিঙ্ক বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু কেন্দ্রের এই নির্দেশের বিরোধিতা করে বেশকিছু আবেদন জমা পড়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। আধার লিঙ্কের জন্য গ্রাহকদের কাছে এসএমএস পাঠিয়ে চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ অনেক দিন ধরেই উঠছে ব্যাঙ্ক ও টেলিকম সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গ তুলে ব্যাঙ্ক ও টেলিকম সংস্থাগুলোকে তিরস্কারও করে আদালত। ব্যাঙ্ক ও টেলিকম সংস্থাগুলো থেকে এভাবে এসএমএস পাঠিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যাতে আতঙ্ক সৃষ্টি করা না হয় সেদিকে কেন্দ্রকে নজর দিতে বলেছে আদালত।

❖ **সহজ হচ্ছে মোবাইল-আধার লিঙ্ক পদ্ধতি :** জানুয়ারি থেকে ঘরে বসেই চটজলদি তিনটি সহজ পদ্ধতিতে মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার নম্বর লিঙ্ক করা যাবে। এগুলি হল, ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (OTP), মোবাইল অ্যাপ এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স ফেসিলিটি (IVRS)। ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড দিয়ে সিম কার্ড ভেরিফিকেশন করা অনেক সহজ হবে বলে টেলিকম মন্ত্রক সূত্র খবর। এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবেন সিনিয়র সিটিজেন এবং প্রতিবন্ধীরা। শুধু আধার লিঙ্কের সুবিধাই নয়, আধার রি-ভেরিফিকেশনও হয়ে যাবে ঘরে বসে। ভেরিফিকেশন করতে লোক আসবে বাড়ির দরজায়। যারা দীর্ঘকালীন কোনও কঠিন কোনও রোগে আক্রান্ত, এই সুবিধা পাবেন তারাও। কোনও গ্রাহক নিজের নামে একাধিক সিম কার্ড ব্যবহার করলে, একটি সিম আধারের সঙ্গে সংযুক্ত হলে অন্য সিমগুলোও ভেরিফাই করে নেওয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করেও ১২ সংখ্যার আধার নম্বরের সঙ্গে মোবাইল নম্বর সংযুক্ত করা যাবে। মোবাইল থেকে ইন্টার‍্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স বা আইভিআরএস পদ্ধতিতে যেভাবে গ্যাস বুক করেন, সেভাবেই আধার নম্বর সংযুক্তিরও অপশন রাখা হচ্ছে। নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, গ্রাহকরা যাতে অনলাইনে এই আধার লিঙ্কের নতুন সুবিধাগুলি পান, সেই অপশন রাখতে বলা হয়েছে টেলিকম অপারেটরদের।

❖ **রেলে দ্বিগুণ টিকিট :** অনলাইনে যারা টিকিট বুকিং করেন তাদের জন্য সুখবর আনল রেল। নিয়ম অনুযায়ী এতদিন অনলাইনে মাসে ৬-টা টিকিট বুক করতে পারতেন যাত্রীরা। এবার সেই নিয়মে ছাড় দিল রেল। ছ'টা নয়, এবার থেকে ১২-টা টিকিট বুক করতে পারবেন যাত্রীরা। রেল জানিয়েছে, মাসে ছ'টা টিকিট কাটার ক্ষেত্রে আধার ভেরিফিকেশনের কোনও প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু কোনও যাত্রী যদি মাসে ছ'টার বেশি টিকিট বুক করতে চান, তা হলে আইআরসিটিসি-র পোর্টালে গিয়ে তার আধার নম্বর লিঙ্ক করাতে হবে। গত ২৬ অক্টোবর থেকে এই নিয়ম কার্যকরী করেছে রেল। আইআরসিটিসি-র পোর্টালে গিয়ে 'মাই প্রোফাইল' ক্যাটাগরিতে যেতে হবে। ওই ক্যাটাগরিতে ঢুকে আধার নম্বর আপডেট করাতে হবে। আধারের সঙ্গে যে মোবাইল নম্বর রেজিস্টার করা আছে ভেরিফিকেশনের জন্য তাতে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) আসবে। সেই ওটিপি দিয়েই ভেরিফাই করিয়ে পোর্টালে আপডেট করিয়ে নেওয়া যাবে আধার।

❖ **রেশন বন্ধ নয় :** কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্য সরকারকে এক বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে, আধার বা বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা কাজ করুক বা না করুক, রেশন কার্ডের ভিত্তিতে বরাদ্দ পণ্য দিতেই হবে। কোনও অবস্থাতেই তা বন্ধ করা যাবে না। খাদ্য মন্ত্রকের এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সন্দেহাতীতভাবে যদি প্রমাণিত হয় যে রেশন গ্রহীতা ভুয়ো, তবেই সংশ্লিষ্ট তথ্য-ভাণ্ডার থেকে তার নাম বাদ দিয়ে বরাদ্দ রেশন বন্ধ করা যাবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যদি কারও আধার না থাকে বা আধার সংযোগ কাজ না করে কিংবা বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা গোলমাল করে তবে তা আলাদাভাবে নথিভুক্ত করে রেশন দিতে হবে। পরে ডিজিটাল ব্যবস্থার গণ্ডগোল ঠিক করা বা যাদের আধার নেই তাদের আধার করানোর দায়িত্বও সরকারের ঘাড়েই বর্তেছে। খাদ্য মন্ত্রকের বক্তব্য, এক্ষেত্রে রেশন গ্রহীতার কোনও ভূমিকাই নেই। কেন্দ্রীয় এই সিদ্ধান্তের কথা একেবারে নিচের স্তরে, রেশন ডিলারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিলারদের লাইসেন্সও কেড়ে নেওয়া হতে পারে বলে খাদ্য মন্ত্রক জানিয়েছে।

● **পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ কমিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট :**

পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের জন্য বরাদ্দ ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ কমিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এতদিন পর্যন্ত গাড়ি দুর্ঘটনা বা অন্য পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে বিভিন্ন খাতে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হ'ত। শীর্ষ আদালতের রায়ে সেই অঙ্ক কমে দাঁড়াল ৭০ হাজারে। গত ৩ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারকের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় শুনিয়েছে।

● **রেল টিকিটে 'তৃতীয় লিঙ্গ'-এর স্থান :**

পুরুষ বা মহিলা নয়, ট্রেনে চড়ার জন্য নিজেদের এবার ট্রান্সজেন্ডার হিসাবেই চিহ্নিত করতে পারবেন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিরা। ট্রেনের টিকিট কাটার ফর্মে এবার নতুন করে যোগ হবে 'টি' অপশন। 'টি', অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার। সম্প্রতি প্রতিটি জোনকে চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে রেলওয়ে বোর্ড। গত ১৭ অক্টোবর রেলওয়ে বোর্ডের তরফ থেকে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রক বর্তমানে তৃতীয় লিঙ্গদের নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করছে। মন্ত্রক থেকেই এই সিদ্ধান্তের কথা রেলকে জানানো হয়। তাতে সায় দিয়েছে রেল। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে তৃতীয় লিঙ্গের মর্যাদা পেয়েছে ট্রান্সজেন্ডাররা। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের আগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লিঙ্গের জায়গায় তাদের পুরুষ/স্ত্রী-র মধ্যে ফেলা হ'ত। সুপ্রিম কোর্ট তাদের তৃতীয় লিঙ্গের মর্যাদা দেওয়ার পর পাসপোর্ট, রেশন কার্ড, ব্যাঙ্ক ফর্ম এবং ভোটার কার্ডে পুরুষ এবং স্ত্রী কলামের সঙ্গে হয় 'টিজি' (ট্রান্সজেন্ডার), 'ভিন্ন' লিঙ্গ অথবা 'টি' লেখাটি যুক্ত হয়। এবার রেলও সে পথে হাঁটল।

● **ধনীদের নিয়ে সমীক্ষা :**

ধনকুবেরের তালিকায় প্রথম সারিতেই রয়েছে ভারত ও চিন। সম্পত্তির নিরিখে ইউরোপের দিকে পাল্লা ভারী হলেও সংখ্যার বিচারে প্রথম স্থানটিই দখল করে রেখেছে এই দুই দেশ। এমনই তথ্য উঠে এসেছে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায়। সুইস ব্যাঙ্ক ইউবিএস এবং প্রাইস ওয়াটার কুপার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে ৭৫ শতাংশ বিলিয়নেয়ার ভারত ও চিনের বাসিন্দা। ২০১৫ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে বিলিয়নেয়ারের সংখ্যা বেড়েছে ১০ শতাংশ। ধনকুবেরের তালিকায় যাদের নাম নতুন

যোগ হয়েছে তারা সবাই ভারত এবং চিনের বংশোদ্ভূত। এমনটাই জানাচ্ছে সুইস ব্যাঙ্কের রিপোর্ট। ২০১৬ সালের হিসেবে, এশিয়ায় মোট বিলিয়নেয়ারের সংখ্যা ৬৩৭, যেখানে মার্কিন মুলকে ৫৬৩। তৃতীয় স্থান দখলে রেখেছে ইউরোপ। সেখানে বিলিয়নেয়ারের সংখ্যা ৬৪২। তবে সম্পত্তির নিরিখে এখন শীর্ষস্থানটি ধরে রেখেছেন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। সম্প্রতি ফোর্বসের তালিকা অনুযায়ী, ভারতে বিলিয়নেয়ারের সংখ্যা ১০১। শীর্ষ ধনীর তালিকায় রয়েছেন রিলায়েন্স গ্রুপের কর্ণধার মুকেশ অম্বানী। দ্বিতীয় স্থানে উইপ্রোর আজিম প্রেমজি এবং তৃতীয় হিন্দুজা ব্রাদার্স।

অন্যদিকে, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের তালিকার একেবারে শীর্ষে রয়েছে মধ্য প্রাচ্যের দেশ কাতার। সেদেশে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১ লক্ষ ২৪ হাজার মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮১ লক্ষ টাকা। লুক্সেমবার্গের স্থান কাতারের ঠিক পরেই। এই দেশের জনসংখ্যা মাত্র ৬ লক্ষ। তবে মাথাপিছু আয় চমকে দেওয়ার মতো, বার্ষিক ১ লক্ষ ৯ হাজার মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ব্রুনাইয়ে জিডিপি-র হার অনেকটাই কমে গিয়েছিল। তবে তেলের বাজার ফের ঘুরে দাঁড়ানোয় সেই হার বেড়েছে অনেকাটাই। মাত্র ৪ লক্ষ জনসংখ্যার এই দেশে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৭৬ হাজার মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৯ লক্ষ টাকা। আইএমএফ-এর হিসেব অনুযায়ী নরওয়ের মাথাপিছু বার্ষিক আয়ে ৭০ হাজার মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় আয় ৪৫ লক্ষ টাকা। আর ভারতের স্থান ১২৬ নম্বরে। ভারতে বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৬ হাজার মার্কিন ডলার। অর্থাৎ, প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। তবে ভারতের থেকেও পিছিয়ে পাকিস্তানের স্থান ১৩৭ নম্বরে আর বাংলাদেশ রয়েছে ১৪৩-এ। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে ২৬-এ। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের স্থান ২৭ নম্বরে।

● **ভারত-চিন সীমান্তে নতুন ৫০-টি চৌকি :**

বর্তমানে ভারত-চিন সীমান্তে ১৭৬-টি সীমান্ত চৌকি রয়েছে। নজরদারি আরও জোরদার করতে ভারত-চিন সীমান্তে ৫০-টি নতুন চৌকি গড়ার কথা ঘোষণা করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। গত ২৪ অক্টোবর গ্রেটার নয়ডায় ভারত-তিব্বত (আইটিবিপি) সীমান্ত পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে তিনি জানান, সীমান্ত চৌকিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে অরুণাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচলপ্রদেশ সীমান্তে ২৫-টি রাস্তাও বানানো হবে। পেট্রোলিংয়ের সুবিধার জন্য দেওয়া হবে বিশেষ স্নো-স্কুটার এবং কম ওজনের শীতপোষাকও। তাছাড়াও সীমান্তে নজরদারির জন্য আইটিবিপি-র হাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ইলেকট্রনিক নাইট-ভিশন ডিভাইস, থার্মাল ইমেজার, যুদ্ধক্ষেত্রে নজরদারির জন্য রাডার, দিক নির্ণয়কারক, গ্রাউন্ড সেন্সর এবং অত্যধিক ক্ষমতাসম্পন্ন টেলিস্কোপও সরবরাহ করা হবে বলে স্থির করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জি-স্যাট কমিউনিকেশনের মাধ্যমে এবার থেকে সীমান্তে নজরদারি চালাতে পারবে আইটিবিপি।

● **সড়কে নামল সুখোই :**

গত ২৫ অক্টোবর আগরা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে নেমে পড়ে বায়ুসেনার সি-১৩০জে হারকিউলিস বিমান। আর তার সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় সাম্প্রতিককালে বায়ুসেনার অন্যতম বড়ো মহড়া। গত বছরেই কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গডকড়ী জানিয়েছিলেন, দেশের কয়েকটি সড়ককে প্রয়োজনে রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে তার মন্ত্রক। কোন সড়কগুলিকে এ কাজে ব্যবহার করা হবে তা স্থির করতে একটি কমিটিও তৈরি করা হয়। আপাতত ১২-টি সড়ককে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের মাওবাদী প্রভাবিত এলাকার কয়েকটি সড়কও রয়েছে।

● **'জেন্ডার ভালনারিবিলিটি ইনডেক্স' সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশিত :**

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে 'প্ল্যান ইন্ডিয়া' প্রথমবার 'জেন্ডার ভালনারিবিলিটি ইনডেক্স' সমীক্ষা চালায়। সম্প্রতি তার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে মেয়েদের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ও স্বাধীনতা—সব দিক মিলিয়ে দেশের মধ্যে সেরা তিনটি রাজ্য গোয়া, কেরল ও মিজোরাম। প্রথম আটটি রাজ্যের তালিকায় রয়েছে মণিপুর এবং সিকিমও। আবার ওই তালিকাতেই একেবারে শেষের ছ'টি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে অরুণাচলপ্রদেশ। সবচেয়ে খারাপ ফল করা রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে দেশের রাজধানী দিল্লি, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। প্রতিবেদন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৪০.৭ শতাংশ মেয়ের বিয়ে ১৮ বছরের আগে হয়। ৬৬.৪ শতাংশ মেয়ে নিরক্ষর। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে প্রথম মণিপুর। পয়লা সারিতে রয়েছে মিজোরাম, মেঘালয়ও। মেয়েদের নিরাপত্তার উত্তর-পূর্বে সেরা ত্রিপুরা। অসম কোনও ক্ষেত্রেই ভালো ছবি দেখাতে পারেনি। নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক পরিস্থিতি—সব মিলিয়ে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি অরুণাচলপ্রদেশের। সব রাজ্যের মধ্যে তাদের স্থান ২৬ নম্বরে। সমীক্ষা অনুযায়ী নারী ও শিশুর পরিস্থিতি বিচারে নাগাল্যান্ডের অবস্থা সন্তোষজনক হলেও অসম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার ফল মোটেই সন্তোষজনক নয়।

মেয়েদের নিরাপত্তার শীর্ষে গোয়া। এক্ষেত্রে প্রথম দশে উত্তর-পূর্বেরই পাঁচ রাজ্য। কিন্তু মেয়েদের নিরাপত্তার সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা উত্তরপ্রদেশের (৩০)। তার পরেই দেশের মধ্যে শোচনীয়তম স্থান (২৯) পশ্চিমবঙ্গের। জন্ম নথিভুক্তিকরণেও একইভাবে তালিকার শেষে উত্তরপ্রদেশের ঠিক আগে পশ্চিমবঙ্গ। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে ১৮ নম্বরে। নারী শিক্ষায় প্রথম দশে উত্তর-পূর্বের প্রতিনিধি শুধু সিকিম (২)। অরুণাচলপ্রদেশ রয়েছে ২৯ নম্বরে। জন্মের আগে ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা, প্রতিষেধক ও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব, পরিচ্ছন্নতার অভাব, কন্যাভ্রূণ ও নবজাতককে হত্যা, গর্ভপাত, স্কুলে না পড়ানো, কম বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণ, পণপ্রথা, পাচারের মতো ঘটনা এখনও এই অঞ্চলে যে হারে ঘটছে—তাতে মেয়েদের পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

● **বিধানসভা নির্বাচন :**

❖ **হিমাচলপ্রদেশে ভোটগ্রহণ :** গত ৯ নভেম্বর ৫০ লক্ষের উপর মানুষ হিমাচলপ্রদেশে ভোট দেন। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রায় এক হাজার তিব্বতি, যারা হিমাচলপ্রদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। ৫০ শতাংশ ভোটারের বয়স ৪০ বছরের নিচে। পুরুষ ভোটার সংখ্যা ২৭ লক্ষ ৭০ হাজার, মহিলা ভোটার ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার ও ট্রান্সজেন্ডার ১৪ জন। ৬৮-টি আসনের বিধানসভার ভোটে মোট প্রার্থী সংখ্যা ৩৩৮। পুরুষ প্রার্থী ৩১৯ ও মহিলা ১৯। হিমাচলপ্রদেশের সবচেয়ে উঁচু, প্রায় ১৫ হাজার ফুট উপরের হিক্কিম বুথে ভোটার ছিলেন ১৯৪ জন। উল্লেখ্য, স্বাধীন ভারতে প্রথম ভোটের প্রথম ভোটদাতা শ্যামসরণ নেগি হিমাচলপ্রদেশেরই বাসিন্দা। নির্বাচন কমিশন তাকে স্বীকৃতিও দিয়েছে। ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম ভোটগ্রহণ হয়। আবহাওয়ার কারণে হিমাচলপ্রদেশেই শুরু হয় প্রথম দফার ভোট। আর সেই ভোটেই প্রথম

ভোট দিয়েছিলেন শ্যামসরণ। এখন তার বয়স ১০০ বছর। এর আগে সব নির্বাচনেই তিনি ভোট দিয়েছেন। ভোট দিলেন এবারও। এই প্রথমবার ভোটগ্রহণ হয় Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)-যুক্ত Electronic Voting Machine (EVM)-এ। অর্থাৎ, প্রত্যেক ভোটার কাকে ভোট দিচ্ছেন তা নিজে দেখতে পান এমন বৈদ্যুতিন ভোটগ্রহণ যন্ত্র। ১৮ ডিসেম্বর ভোটের ফল ঘোষণা হওয়ার কথা।

❖ **গুজরাট ভোটের নির্ঘণ্ট :** মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এ. কে. জ্যোতি জানিয়েছেন গুজরাট বিধানসভার ভোট হবে দু' দফায়। ডিসেম্বরের ৯ এবং ১৪ তারিখে। ফল ঘোষণা হবে ১৮ ডিসেম্বর। গুজরাট বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ১৮২। প্রথম দফার ভোট হবে ১৯ জেলার ৮৯ আসনে। দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ১৪ জেলার ৯৩ আসনে। অবিলম্বে আদর্শ নির্বাচনী বিধি কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গুজরাটের সব কেন্দ্রে এবার ভোটগ্রহণ হবে Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)-যুক্ত Electronic Voting Machine (EVM)-এ। বর্তমান গুজরাট বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবে আগামী ২৩ জানুয়ারি। নির্বাচনী প্রচারে কোনও প্রার্থী ২৮ লক্ষ টাকার বেশি খরচ করতে পারবেন না। সমস্ত বর্ডার চেক পোস্টে ভোটের সময় বসানো হবে সিসিটিভি। গুজরাটের জনরায় নেওয়া হবে ৫০ হাজার ১২৮-টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে।

● **প্রতিবন্ধীদের জন্য খুলল ডাক্তারি পড়ার দরজা :**

মেডিক্যাল পড়ার বাধা কাটাতে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছিল প্রতিবন্ধীদের। অবশেষে ডাক্তারি পঠনপাঠনে তাদের অধিকার স্বীকার করে নিলে মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া বা এমসিআই। গত ৩১ অক্টোবর মেডিক্যাল কাউন্সিলের জেনারেল বডি মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২১ ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষ এবার থেকে মেডিক্যলে বসার সুযোগ পাবেন। তারা যদি মারাত্মক ধরনের প্রতিবন্ধী হন, তাহলেও তাদের বাধা দেওয়া হবে না। সেজন্য নিয়মবিধি বদলাচ্ছে কাউন্সিল। নতুন ব্যবস্থায় দৃষ্টিহীন থেকে শুরু করে ক্ষীণদৃষ্টি মানুষ, বধির, বামন, 'মাসকুলার ডিসট্রফি'-তে আক্রান্ত মানুষ, শরীরের নিচের অংশে ৭০ শতাংশের বেশি পঙ্গুত্ব রয়েছে এমন মানুষ 'মাল্টিপল স্কেলেরোসিস'-এ আক্রান্ত মানুষ, বৌদ্ধিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন মানুষের মতো অনেকেই আগামী শিক্ষাবর্ষে মেডিক্যালের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ বসতে পারবেন। এবং সফল হলে ডাক্তারি পড়তেও পারবেন। এতদিন এমসিআই-এর নিয়ম অনুযায়ী শরীরের নিচের অংশে ৫০-৭০ শতাংশ পঙ্গুত্ব রয়েছে এমন মানুষ ছাড়া আর কোনও ধরনের প্রতিবন্ধীই মেডিক্যালে বসার অনুমতি পেতেন না।

পশ্চিমবঙ্গ

➢ মাছ চাষের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর নয় বাংলা। তাই মাছের সরবরাহ বাড়াতে অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের উপরে নির্ভর না করে এই ক্ষেত্রে বেসরকারি লগ্নি টানতে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে 'মউ' বা সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করছে রাজ্য সরকার। এ রাজ্যের গ্রামে গ্রামে মাছের উৎপাদন বাড়াতে গত তিন বছরে ৪৪-টি মউ সই করেছে মৎস্য দপ্তর। তার মধ্যে ২০১৫ সালে ১২-টি, ২০১৬ সালে ১৪-টি এবং ২০১৭ সালে ১৮-টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রস্তাবিত লগ্নির পরিমাণ ১,২৮৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০-টি সংস্থা উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে। তাদের লগ্নির পরিমাণ প্রায় ৩৪০ কোটি টাকা।

➢ National Assessment and Accreditation Council (NAAC)-এর মূল্যায়নে কলকাতার অন্যতম সেরা কলেজ সেন্ট জেভিয়ার্সের সঙ্গে সমানে টক্কর দিল মেদিনীপুর কলেজ। ফলাফলেও জেভিয়ার্সের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে মেদিনীপুরের স্বশাসিত কলেজটি। তৃতীয় পরিদর্শন শেষে প্রাপ্ত পয়েন্টের নিরিখে পূর্ব ভারতে এখন মেদিনীপুর কলেজের স্থান দ্বিতীয় আর দেশের মধ্যে সপ্তম। সেখানে ৩.৭১ পয়েন্ট পেয়ে পূর্ব ভারতে প্রথম স্থানে রয়েছে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

● **কিশোরী শক্তি যোজনা :**

কিশোরীদের অপুষ্টি দূর করে তাদের স্বনির্ভর করতে বছর ছয়েক আগে রাজ্যের সাত জেলায় 'সবলা প্রকল্প' চালু হয়েছিল। সেই ধাঁচেই বাকি জেলাগুলিতে 'কিশোরী শক্তি যোজনা' নামে নতুন প্রকল্প চালু করছে রাজ্য সরকার। গত ৩১ অক্টোবর বহরমপুর সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পরে রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা একথা জানান। মুর্শিদাবাদ দিয়েই এই প্রকল্পের সূচনা হল; পরে বাকি জেলাগুলিকেও ধীরে ধীরে এর আওতায় আনা হবে। প্রয়োজনীয় অর্থের ৬০ শতাংশ কেন্দ্র এবং ৪০ শতাংশ রাজ্য দেবে। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ১১ হাজার স্কুলছুট মেয়েও এই প্রকল্পের আওতায় আসবে।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদহ, নদিয়া, পুরুলিয়া ও কলকাতায় সবলা প্রকল্প চালু হয়। বাকি জেলাগুলিতে ১১-১৮ বছরে মেয়েদের নিয়ে চালু হবে নতুন যোজনা। পুষ্টিঘাটতি মেটাতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতাভুক্ত মেয়েদের আয়রণ ও ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট দেওয়া হবে। স্বনির্ভর করতে দেওয়া হবে নানা প্রশিক্ষণ। স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে।

● **ডাল চাষ বাড়াতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার :**

প্রোটিনে ভরপুর বলে একদিকে যেমন ডালের পুষ্টিগুণ খুব বেশি, তেমনই ডালের গাছ বাতাসের নাইট্রোজেনকে মাটিতে বন্দি করে জমির উর্বরতাকে বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ। পশ্চিমবঙ্গে ডাল চাষ বাড়াতে আগামী দিনে অন্য ভুমিকায় দেখা যাবে রাজ্যের মহিলাদের। আর্থিক অস্বাচ্ছ্যলের কারণে গ্রামের মহিলাদের খাদ্যে প্রোটিনের মাত্রা কম থাকে। ডাল সেই অভাব পূরণ করতে পারে। আবার ডাল থেকে তৈরি বড়ি-সহ অন্যান্য পণ্য বিকল্প আয়ের পথও খুলে দিতে পারে। পাশাপাশি ডাল চাষে খরচ কম, পরিশ্রমও বিশেষ করতে হয় না ও জল লাগে না বললেই চলে। এই কারণেই মহিলাদের আরও বেশি করে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে ডালের চাহিদা রয়েছে বছরে ১২ লক্ষ টনের মতো। সেখানে কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে রাজ্যে ডাল উৎপাদন হয়েছে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টনের মতো। অর্থাৎ, প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টনের মতো ডালের ঘাটতি রয়েছে। যা মেটাতে হয় আমদানি করে। রাজ্যজুড়ে মুগ, মুসুর, ছোলা, খেসারির মতো ডালের উৎপাদন বাড়াতে কয়েক বছর ধরেই উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। মূলত ধান চাষের পর পড়ে থাকা জমিতে কম খরচে কীভাবে ডাল চাষ করা যায় মহিলাদের সেই প্রশিক্ষণই দেওয়া হচ্ছে। এই কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে রাজ্যের কৃষি দপ্তর ও কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থাও।

● **সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জন্য বেনফিস-এর উদ্যোগ :**

বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবন (ম্যানগ্রোভ), সুন্দরবনে মাছের খাদ্যভাণ্ডার যথেষ্ট। বিদেশে রপ্তানিযোগ্য কাঁকড়া, চিংড়ি থেকে ইলিশ, পার্সে, খলসে, ট্যাংরা, ভেটকি কিংবা ভোলা, পমফ্রেট, ম্যাকরেলের ছড়াছড়ি। ঢালাও মাছের পোনা সুন্দরবন থেকে চালান হয় অন্যত্র। কিন্তু মাছ ধরতে হিমশিম দশা মৎস্যজীবীদের। এখনও নদীর পাড়ে নৌকো ভেড়ানোর ঘাট নেই; কাদাজল ঠেলে এগোতে হয়। প্রত্যন্ত এলাকায় নেই মাছ বিক্রির সুবিধাও। তাই বরফকলের অভাবে মাছ পচে এন্তার।

এবার গরিব মৎস্যজীবীদের স্বার্থে এগিয়ে এসেছে বেনফিশ। তাদের পরিকল্পনামাফিক রাষ্ট্রীয় বিকাশ যোজনার একটি প্রকল্প কাজে লাগিয়ে সুন্দরবনের জন্য মাছ ধরা থেকে বিপণনের পরিকাঠামো গড়ায় সায় দেওয়া হয়েছে। নয়া প্রকল্পে প্রত্যন্ত সুন্দরবনে বাসন্তীর ঝাড়খালি, পাথরপ্রতিমার জি প্লট, কুলতলির কাঁটামারি ও রায়দিঘিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ওই তল্লাটে পাড় বাঁধিয়ে মৎস্যজীবীদের জন্য ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার হবে। মাছ সংরক্ষণে তৈরি হবে ২৫ টনের বরফ কল। মাছ ধরার জাল সারাইয়ের কেন্দ্র হবে। মাছ নিলামের বাজারও তৈরি হবে।

● **কালো চালের বিক্রি বাড়াতে তৎপরতা :**

এবার মাউসে ক্লিক করেই ঘরে বসে মিলবে কোচবিহারের ব্ল্যাক রাইস। কালো রঙের ওই চাল 'কালোভাত' নামেও পরিচিত। পুষ্টিগুণ, আয়রন সমৃদ্ধই শুধু নয়, সুগন্ধি এই চাল ক্যান্সার প্রতিরোধেরও সহায়ক বলে গবেষকদের একাংশের দাবি। সব মিলিয়ে ব্ল্যাক রাইসের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এবার বিপণন বাড়াতে অনলাইনে কালো চাল বিক্রির পরিকল্পনা পাকা। সাতমাইল এলাকার একটি ফার্মার্স ক্লাব কৃষি দপ্তরের পাশাপাশি নাবার্ডের সহযোগিতা নিয়ে ওই ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই অনলাইনে ব্ল্যাক রাইসের বিক্রি শুরু হওয়ার কথা।

অন্যদিকে, বিদেশের রপ্তানির জন্য বাংলার কালো চালের উৎপাদন আরও বাড়াতে চুক্তি চাষের পথে হাঁটতে চায় রাজ্য সরকার। চুক্তি অনুযায়ী, কৃষকের ফলন কিনে নেবে রপ্তানিকারক বেসরকারি সংস্থা। গত বছর ৫০ বিঘে জমিতে চাষ করে কালো চাল মিলেছিল ২২ টন। এবার চাষ হয়েছে ৩৫০ বিঘে জমিতে। অন্তত ১০০ টন ফলন পাওয়ার আশা করছে কৃষি দপ্তর। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ফসল মাঠ থেকে তোলার কথা।

● **সাইবার অপরাধের মোকাবিলা করতে :**

এরাজ্যে তো বটেই, গোটা দেশজুড়ে বাড়ছে সাইবার অপরাধের রমরমা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ গবেষণা কেন্দ্র গড়ছে রাজ্য। রাজারহাটে এই কেন্দ্র তৈরির বিষয়টি মন্ত্রিসভায় ইতোমধ্যেই পাস হয়েছে। কেন্দ্র 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র কথা ঘোষণা করেছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক কাজ অনলাইনে করার কথা বলছে। দেশজুড়ে বাড়ছে অনলাইন শপিং ও ই-লেনদেন। তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই কাজ যত বাড়বে ততই সাইবার নিরাপত্তাকে জোরালো করতে হবে। তবে শুধু সাইবার অপরাধ বা অনলাইন লেনদেন নয়, খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, চুরির মতো ঘটনারও তদন্তেও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর হিসেব বলছে, ফি বছরই দেশে সাইবার অপরাধ বাড়ছে। এরাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়।

● **ভগিনী নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষ :**

প্রথা ভেঙে এবার ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালন করল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। এতদিন পর্যন্ত শুধু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, মা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের অন্য শিষ্য এবং রাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনই পালন করা হ'ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে। কিন্তু রামকৃষ্ণের ভাবান্দোলন প্রচার ও ভারতের প্রতি ভগিনী নিবেদিতার অবদানকে সম্মান-শ্রদ্ধা জানাতে তার জন্ম সার্ধশতবর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবছর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি পরিষদের সভায়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সারা দেশব্যাপী সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখায় নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান হচ্ছে। এর মধ্যে ভারতের ৭৬-টি কেন্দ্র ও বিদেশের ৯-টি কেন্দ্র রয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয়ের তরফেও ওই সার্ধশতবর্ষ পালন অনুষ্ঠান পালন শুরু হবে বলে ২২ অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান সঙ্ঘের সহকারি সাধারণ সম্পাদক তথা নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির চেয়ারম্যান স্বামী বলভদ্রানন্দ। ২৮ অক্টোবর 'নিবেদিতা স্মরণ' অনুষ্ঠানটি হয় উত্তর কলকাতায় স্বামীজীর বাড়িতে। ৩০ ও ৩১ অক্টোবর গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত হয় 'নিবেদিতা মনন' অনুষ্ঠান। পাশাপাশি সারা ভারতজুড়ে চলবে অনুষ্ঠান। ২০১৮-র অক্টোবর বা নভেম্বরে বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠে হবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

● **পাট শিল্পের জন্য পদক্ষেপ :**

পাটচাষিদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য এই প্রথম নিজেদের উদ্যোগে চটের বস্তা কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রক। মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য বস্তা কিনতে যত টাকাই খরচ করুক না কেন তার পুরোটাই কেন্দ্র মিটিয়ে দেবে। এতদিন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এমনকী ওড়িশার মতো রাজ্য নিজেদের উদ্যোগে চটের বস্তা কিনলেও পশ্চিমবঙ্গ কিনত না। প্রসঙ্গত, চটের বস্তা কেনায় কেন্দ্র বছরে কম-বেশি ৬,০০০ কোটি টাকা খরচ করে। তার মধ্যে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা, এই দু'টি রাজ্যেই ৩,০০০ কোটি টাকার বস্তা লাগে। এরাজ্যের চালকলগুলিই নিজেদের জন্য বাজার থেকে বস্তা কিনে নিত। এই প্রথম রাজ্য সরকার সরাসরি নিজেদের সংস্থা, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিগমের মাধ্যমে জুট কমিশনারের কাছ থেকে চটের বস্তা কিনতে চলেছে।

এর পাশাপাশি, রাজ্যের চটকলগুলিকে সব ধরনের কাঁচা পাট কেনার নির্দেশ দিয়েছে বস্ত্রমন্ত্রক। বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, নিচু বা মাঝারি মানের কাঁচা পাট কম কিনছে চটকলগুলি। ফলে কেন্দ্রীয় পাট নিগমের ঘরে পড়ে থাকছে মজুত পাট। বাড়তি পাট কিনতে পারছে না তারা। মার খাচ্ছেন চাষিরাও। বস্ত্রমন্ত্রক নিগমকেও চাষিদের কাছ থেকে পাট কেনা বাড়াতে বলেছে। জুট কমিশনার পুরো বিষয়টির উপর নজরদারি চালাবেন। দেশে পাট শিল্পে প্রায় ৯,০০০ কোটি টাকার বার্ষিক লেনদেন হয়। এর মধ্যে চাল, গম, চিনির জন্য ৬,০০০ কোটিতে শুধু চটের বস্তা কেনে কেন্দ্র। এ বছর পাট নিগম সারা দেশে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ৬৬ হাজার বেল (১ বেল হল ১৮০ কেজি কাঁচা পাট) কাঁচা পাট কিনেছে।

● **চিকিৎসকদের বন্ড সংক্রান্ত মামলার রায় :**

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বন্ড সই করিয়ে সরকারি চাকরিতে ধরে রাখা এবং গ্রামে পরিষেবা দিতে বাধ্য থাকার কথা জানিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি ২০১৪ সালে জারি করেছিল রাজ্য সরকার, ৩ নভেম্বর আদালত তা

খারিজ করার পক্ষে রায় দিয়েছে। বিচারপতি অবশ্য বলেছেন, এখন থেকে ডিগ্রিধারীদের এক বছর কোনও সরকারি হাসপাতলে কাজ করলেই চলবে। কোনও চিকিৎসক তাতে রাজি না হলে সরকারকে বন্ডের টাকা বা ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ লক্ষ টাকা দিতে হবে। প্রসঙ্গত, সরকারি হাসপাতালে ডিগ্রিধারীদের এক বছর কাজ করার নিয়ম ২০১৩ সাল থেকে চালু ছিল রাজ্যে। আদালত সেটাই বজায় রাখতে বলেছে।

● **গজলডোবায় প্রথম পর্যটক থানা হচ্ছে :**

শুধুমাত্র পর্যটকদের কথা ভেবে আলাদা থানা তৈরির ভাবনা। রাজ্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ট্যুরিস্ট থানা হচ্ছে গজলডোবা মেগা ট্যুরিজম হাব 'ভোরের আলো'-য়। 'ভোরের আলো ট্যুরিস্ট পুলিশ স্টেশন' নামে ওই থানা চালু হওয়ার কথা। ইতোমধ্যেই তিস্তার বাঁধ ও ক্যানালের মাঝামাঝি জায়গায় থানা তৈরির জন্য ৮০ কাঠা জমি বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, সামনের দিকে একটি থানা ভবন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাকি জমিতে পুলিশের একটি অতিথি নিবাস তৈরি হবে। থানায় কেবলমাত্র পর্যটকরাই অভিযোগ জানাতে পারবেন। থানার পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকদের দায়িত্বও হবে পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। বছরখানেকের মধ্যে এই থানার কাজ শেষ হওয়ার কথা।

এই মুহূর্তে গজলডোবার মিলনপল্লিতে শিলিগুড়ি পুলিশের একটি ক্যাম্প রয়েছে। তা ভক্তিনগর থানার আওতায়। এখানেই প্রায় ৪০০ একর জায়গা জুড়ে গজলডোবা মেগা ট্যুরিজম প্রকল্প তৈরির কাজ এগোচ্ছে। ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়লে ট্যুরিস্ট থানার গুরুত্ব বাড়বে। প্রসঙ্গত, পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বছর কয়েক আগে বিহারের রাজগির, সহর্ষ, পশ্চিম চম্পারণ ও বৈশালীতে ট্যুরিস্ট থানা তৈরির ভাবনা হয়েছিল। সেখানকার থানার মধ্যেই আলাদা একটি 'ট্যুরিস্ট সেল' খোলা হয়েছে। সেই হিসেবে 'ভোরের আলো' প্রথম পূর্ণাঙ্গ ট্যুরিস্ট পুলিশ স্টেশন হতে চলেছে।

● **স্কুলে সেফটি সিকিউওরিটি মনিটরিং কমিটি :**

শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে স্কুলে স্কুলে কমিটি গড়ার নির্দেশ দিয়েছে স্কুলশিক্ষা দপ্তর। সম্প্রতি দপ্তর থেকে সব জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে এই মর্মে একটি নির্দেশিকা পাঠানো হয়। তাতে স্কুলে পড়ুয়াদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পৃথক কমিটি গড়তে বলা হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষককে কমিটির চেয়ারম্যান করে দু'জন অভিভাবক-প্রতিনিধি, একজন শিক্ষিকা (স্কুলে যদি কোনও শিক্ষিকা না থাকেন তবেই শিক্ষককে নেওয়া যাবে) এবং পুলিশ বা স্বাস্থ্য দপ্তর কিংবা দমকলের প্রতিনিধিদের নিয়ে পাঁচ সদস্যের 'সেফটি সিকিওরিটি মনিটরিং কমিটি' গড়তে হবে। উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কমিটিতে রাখতে হবে স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতিকেও।

স্কুল ক্যাম্পাসকে শিশুদের শরীর ও মনের পক্ষে পুরোপুরি নিরাপদ করে তুলতে বলা হয়েছে সরকারি নির্দেশিকায়। বলা হয়েছে, স্কুলে পানীয় জল থেকে শুরু করে 'মিড-ডে মিল'-এর সুষ্ঠু পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। স্কুল-কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এখন বহুমুখী। মিড-ডে মিলের খাবার রান্না থেকে পরিবেশন স্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় হচ্ছে কি না, তা যেমন খতিয়ে দেখতে হবে। সমতুল দায়িত্ব নিয়ে স্কুলের পানীয় জলের নমুনা পরীক্ষা করাতে হবে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কোনও পরীক্ষাগারে। সেই সঙ্গে স্কুল-চত্বরে সিসিটিভি-র ক্যামেরা বসানো, ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচালয় গড়ে তোলার কথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায়।

● **রাজ্যে প্রথম স্বয়ংক্রিয় গাড়ি পরীক্ষা কেন্দ্র :**

কলকাতা তথা রাজ্যে এই প্রথম স্বয়ংক্রিয় গাড়ি পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে বেহালায়। বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের পাশে পরিবহণ দপ্তরের যে শাখা অফিস রয়েছে সেখানে একটি স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে। এছাড়া রাজ্যের আরও তিনটি জায়গায় স্বয়ংক্রিয় গাড়ি পরীক্ষা কেন্দ্র গড়তে চায় রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। নীলগঞ্জ, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়িতে। বেহালায় পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরিতে লাগবে আট একর জমি। দেবে রাজ্য সরকার। খরচ হবে প্রায় ১৭ কোটি টাকা। পুরোটাই দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সংক্রান্ত যাবতীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করবে কেন্দ্রের অধীনে থাকা পুণের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব রোড ট্রান্সপোর্ট।

বর্তমানে গাড়ির সার্টিফিকেট অব ফিটনেস পরীক্ষা নিয়ে অনেক সময়েই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। নতুন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু হলে এই অভিযোগ কমবে। কারণ, হাতে-কলমে গাড়ির ধোঁয়া এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি পরীক্ষা করতে গিয়ে পরীক্ষক চাইলেই নানা কারচুপি করতে পারেন। নতুন পদ্ধতিতে সেই সুযোগ কার্যত থাকছেই না। নতুন ব্যবস্থা পুরোপুরি কম্পিউটার চালিত। একটি বড়ো মাঠকে তিন-চারটি লেনে ভাগ করা হবে। লেনগুলিতে গাড়ির উপরে নজরদারির জন্য কয়েকটি মেশিন বসানো থাকবে। ওই সব মেশিন চালনার জন্য মূল কেন্দ্র থাকবে একটি কম্পিউটার। কোনও গাড়ি ওই লেনের মধ্যে দিয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির নানান তথ্য মূল কম্পিউটারে চলে আসবে। সেগুলি এক জায়গায় এনে বিশ্লেষণ করে কম্পিউটার জানিয়ে দেবে, গাড়িটি পরীক্ষায় সফল কি না। প্রাথমিকভাবে ওখানে গাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরু হবে। পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালকদের গাড়ি চালানোর দক্ষতাও পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

অর্থনীতি

- ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বরকে যুক্ত করা বাধ্যতামূলক বলে গত ২১ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি জারি করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। অ্যান্টি মানি লন্ডারিং বা কালো টাকা প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী, ৫০ হাজার টাকার বেশি ব্যাঙ্ক লেনদেনের ক্ষেত্রে আধার কার্ডের তথ্য নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ মতো শুধু ওই সব ক্ষেত্রেই আধার নম্বর কাজে লাগানো হবে। গত জুনেই নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং ৫০ হাজার টাকা ও তার বেশি অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আধারের উল্লেখ বাধ্যতামূলক করে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বর্তমান সব ব্যাঙ্ক গ্রাহককে আধার নম্বর জমা দিতে হবে। তা না হলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট।
- মজবুত অর্থনীতির জন্য জরুরি পোক্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে চলতি ও আগামী অর্থবর্ষ মিলিয়ে মোট ২.১১ লক্ষ কোটি টাকা শেয়ার মূলধন জোগানোর কথা ঘোষণা করল কেন্দ্র। গত ২৪ অক্টোবর মন্ত্রকের শীর্ষ কর্তাদের

সঙ্গে নিয়ে করা সাংবাদিক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন, ২.১১ লক্ষ কোটির মধ্যে ১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা আসবে বাজারে বন্ড বেচে। বাকি ৭৬ হাজার কোটি বাজেট বরাদ্দ থেকে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে মূলধন জোগানোর জন্য বন্ড ছাড়তে গিয়ে ফি বছর অন্তত ৯,০০০ কোটি টাকা সুদ গুনতে হবে ঠিকই। কিন্তু সেই দাওয়াই কাজ দেবে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং তার হাত ধরে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে।

➢ নয়া রেকর্ড গড়ে এই প্রথম ৩৩ হাজারের চৌকাঠ পেরল সেনসেক্স। গত ২৫ অক্টোবর সেনসেক্সের পাশাপাশি নজির গড়ল নিফ্‌টিও। ওই দিন সকালে ৫০০ পয়েন্ট উপরে উঠে ৩৩,১১৭ অঙ্কে পৌঁছয় শেয়ার বাজারের সূচক। সেই সঙ্গে নিফ্‌টি ছুঁয়ে ফেলে ১০,৩৪০ অঙ্ক।

● **১৩ বছর পর ভারতের রেটিং বাড়াল মুডি'জ :**

মুডি'জ ক্রেডিট রেটিং-এর তালিকায় অনেকটা উপরে উঠে এল ভারত। গত ১৭ নভেম্বর আমেরিকার এই সংস্থাটি ভারতের ক্রেডিট রেটিং আপগ্রেড করায় ভারতের অবস্থান এখন 'বিএএ২'। প্রায় ১৩ বছর পর ভারতের ক্রেডিট রেটিং বাড়াল মুডি'জ। ২০০৪-এ যখন শেষ আপগ্রেড হয়েছিল, তখন ভারতের রেটিং ছিল 'বিএএ৩'। নিম্নতম লগ্নিকে এই রেটিং-এর পর্যায়ে ফেলা হয়। কেন্দ্র সরকারের ব্যাপক আর্থিক ও প্রতিষ্ঠানগত সংস্কারের নিরিখে এবার ভারতের ক্রেডিট রেটিং করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মুডি'জ।

এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, জিএসটি, নোটবন্দি-সহ বেশকিছু আর্থিক সংস্কারের কারণে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি এখন বেশ ভালো। কিছু ক্ষেত্রে তা প্রত্যাশার মাত্রাও ছাড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, এমন আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ভারত সরকারের পরিকল্পনায় রয়েছে, যেগুলো দেশের বাণিজ্য, উৎপাদন, দেশি ও বিদেশি লগ্নির ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। সরকার আর্থিক পরিকাঠামোর বিকাশে নন-পারফর্মিং লোন, বায়োমেট্রিক পদ্ধতি, ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার-এর মতো যেসব নীতি নিয়েছে তার প্রশংসা করে মুডি'জ জানিয়েছে, কেন্দ্র এধরনের সংস্কার চালিয়ে গেলে আগামী দিনে দেশের আর্থিক বৃদ্ধি বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছবে।

● **বিশ্বাসযোগ্যতায় বিশ্বে তৃতীয় ভারত :**

মুডি'জ-এর পর এবার ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম (ডব্লুইএফ)। বিশ্বাসযোগ্যতার নিরিখে ভারত সরকারকে তিন নম্বরে রেখেছে ডব্লুইএফ। তাদের সাম্প্রতিকতম রিপোর্টে ডব্লুইএফ জানিয়েছে, বিশ্বাসযোগ্যতার নিরিখে বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় এদেশের সরকার। তালিকায় সুইৎজারল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া পরেই রয়েছে ভারতের স্থান। বিশ্বব্যাপী এক সমীক্ষা চালায় অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)। সেই সমীক্ষার উপর ভিত্তি করেই বিশ্বাসযোগ্য দেশের তালিকার প্রকাশ করেছে ডব্লুইএফ। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতি রুখতে যে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং কর ব্যবস্থায় যেসব সংস্কারসাধন করেছে, তার ফলে দেশের আমজনতার আস্থা অনেকটাই বেড়েছে। প্রায় ৭৪ শতাংশ ভারতীয় জানিয়েছেন, তারা সরকারের কাজে খুশি।

● **বিশ্বব্যাঙ্কের সহজে ব্যবসার রিপোর্ট-এ প্রথম একশোয় :**

এক লাফে ত্রিশটি সিঁড়ি টপকে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহজে ব্যবসা করার মাপকাঠিতে এই প্রথম একশোর গণ্ডিতে পা রাখল ভারত। 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস'-এ বিশ্বের ১৯০-টি দেশের মধ্যে তার স্থান দাঁড়াল ১০০তম। চোখে পড়ার মতো উন্নতি ১০-টির মধ্যে মাত্র ৪-টি মাপকাঠিতে। রিপোর্ট বলছে, ব্যবসা শুরুতে ভারত ১৫৫-তম স্থান থেকে ১৫৬-তে নেমেছে। ১৮১তম স্থানে নির্মাণের অনুমতিতে।

● **জিএসটি সংক্রান্ত খবরাখবর :**

❖ এক ধরনের পণ্যে (বিশেষত, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্ষেত্রে) একই কর। ছোটো শিল্প ও ব্যবসায়ীদের জিএসটি সমস্যার কিছুটা সমাধান। আর ২৮ শতাংশের চড়া হারের আওতা থেকে বেশকিছু পণ্যকে বার করে আনা। এই সমস্ত প্রস্তাব রাজ্যগুলির কাছে পাঠিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের সম্প্রতি এ সংক্রান্ত 'অ্যাপ্রোচ পেপার' দিয়েছে জিএসটি পরিষদ। সেখানে একই গোত্রের বিভিন্ন পণ্যের উপর করের হারে সামঞ্জস্য আনার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী, ফিটমেন্ট কমিটির হাতে প্রায় এক লক্ষ পণ্যের তালিকা আছে। দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই একই ধরনের পণ্যে নানা হারে কর ধার্য হয়েছে। এর মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে করের হারে সাম্য আনাই হবে প্রধান লক্ষ্য।

❖ গত ১০ নভেম্বর জিএসটি পরিষদের সিদ্ধান্ত, এসি ও নন-এসি, সমস্ত রেস্তোরাঁতেই জিএসটি এবার ৫ শতাংশ। কিন্তু আগে মেটানো করের টাকা (ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট) ফেরত মিলবে না। দিনে ৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত ঘর ভাড়ার হোটেলের রেস্তোরাঁতেও জিএসটি ৫ শতাংশ। ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ফেরতের সুবিধা নেই। এর বেশি ভাড়ার হোটেলের রেস্তোরাঁয় কর ১৮ শতাংশ। সঙ্গে থাকছে আগে মেটানো করের টাকা ফেরতের সুবিধা। এতদিন বাতানুকূল রেস্তোরাঁয় জিএসটি ছিল ১৮ শতাংশ, না হলে ১২ শতাংশ।

❖ ১৭৮-টি পণ্য সস্তা হচ্ছে। এতদিন ওই পণ্যগুলির ওপর জিএসটি ধার্য ছিল ২৮ শতাংশ। এবার সেটা কমে হচ্ছে ১৮ শতাংশ। পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) নেটওয়ার্ক প্যানেলের প্রধান, বিহারের অর্থমন্ত্রী সুশীল মোদী জানিয়েছেন, জিএসটি-র কর-কাঠামো অনেকটাই বদলে ফেলা হয়েছে ১০ নভেম্বর জিএসটি কাউন্সিলের ২৩তম বৈঠকে। ২২৮-টি পণ্যের মধ্যে মাত্র ৫০-টির ক্ষেত্রে সর্বাধিক হারে জিএসটি, ২৮ শতাংশ ধার্য হয়েছে। বাকি ১৭৮-টি পণ্যের ওপর জিএসটি ধার্য হয়েছে ৫, ১২ বা ১৮ শতাংশ হবে। কর-কাঠামো সংশোধনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে গুয়াহাটিতে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে বসেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

❖ রপ্তানিকারীরা যাতে দ্রুত জিএসটি-র আওতায় রিফান্ড পেতে পারেন, তার জন্য নিয়ম আরও সরল করল কেন্দ্র। তারা এবার থেকে ফর্ম পূরণ করে তা হাতে হাতেও জমা দিতে পারবেন। আগে শুধু অনলাইনেই ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে বলা হয়েছিল রপ্তানিকারীদের। পরোক্ষ কর পর্ষদ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রিফান্ড সংক্রান্ত ফর্ম পূরণ করে তা সংশ্লিষ্ট কমিশনারের হাতে জমা দেওয়া যবে। লক্ষ্য রপ্তানিকারীদের কাঁচামাল খাতে আগে মেটানো কর দ্রুত ফেরতের ব্যবস্থা করা। কারণ, ওই টাকা হাতে না পেলে টান পড়ছে তাদের কার্যকরী মূলধনে। কাঁচা মালে মেটানো কর রিফান্ড ছাড়াও এই ব্যবস্থা তাদের জন্য, যারা বিশেষ আর্থিক অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ করেছেন এবং পরিষেবা রপ্তানিতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্মিলিত জিএসটি বা আইজিএসটি মিটিয়েছেন।

❖ জিএসটি নেটওয়ার্ক-এর পক্ষ থেকে ৫ নভেম্বর জানানো হয়েছে, রপ্তানি সংস্থাকে এই রিফান্ড-এর দাবি জানানোর সুবিধা করে দিতে জিএসটিআর-১ ফর্মে আলাদা একটি সারণি টেবিল ৬এ যোগ করা হয়েছে। রপ্তানিকারী সংস্থা পণ্য পাঠানোর সময়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের

কাছ থেকে যে শিপিং বিল হাতে পায়, তার ভিত্তিতেই ওই সারণিতে আগে মেটানো কর সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করা যাবে। আগে সংক্ষিপ্ত জিএসটিআর ৩বি ফর্মে রপ্তানিকারীরা যেসব তথ্য দিয়েছেন, সেগুলিও কাজে লাগানো যাবে। উল্লেখ্য, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে বহু করদাতাই ওই সংক্ষিপ্ত ফর্মে কর জমা দিয়েছেন। রিফান্ডের টাকা রপ্তানিকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে, কিংবা তাদের চেক ইস্যু করা হবে।

❖ জিএসটি সংক্রান্ত কমিটির সদস্য মনোনীত হলেন ব্যবসায়ী সংগঠন, দ্য কনফেডারেশন অব অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স বা সিএআইটি-র প্রতিনিধি প্রবীণ খান্ডেলওয়াল। ব্যবসায়ী মহলকে গুরুত্ব দিতেই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত। অনুমোদিত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন : সেন্টার ফর লিগাল পলিসি-র রিসার্চ ডিরেক্টর অর্ঘ্য সেনগুপ্ত, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিনোদ জৈন, ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান এক্সপোর্টস অর্গানাইজেশনের সিইও অজয় সহায়, লঘু উদ্যোগ ভারতীর প্রেসিডেন্ট ওম প্রকাশ মিত্তল। আহ্বায়ক হিসেবে আছেন কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের অবসরপ্রাপ্ত চিফ কমিশনার গৌতম রায়। জিএসটি আইনের নানা রদবদল খতিয়ে দেখে কমিটি রিপোর্ট দেবে।

❖ নগদের জোগান বাড়াতে ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহের জন্য হাতে পাওয়া আগামে জিএসটি মেটানোর নিয়ম বাতিল হল। ব্যবসা দেড় কোটি টাকার মধ্যে হলে এই সুবিধা মিলত। ব্যবসায়ীদের তা নিয়ে ক্ষোভ ছিল, কারণ ভ্যাট বা উৎপাদন শুল্কের জমানায় তা দিতে হ'ত না। তবে কম্পোজিশন স্কিমে (বার্ষিক ব্যবসা ১ কোটি পর্যন্ত) এই নিয়ম খাটবে না।

❖ গত ১৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জিএসটি-র আওতায় মুনাফাখোর প্রতিরোধ কর্তৃপক্ষ তৈরির সিদ্ধান্তে সায় দেয়। জিএসটি আইনেই এর বিধান ছিল। কর্তৃপক্ষের শীর্ষে থাকছেন সচিব পর্যায়ের অফিসার। জাতীয় স্তরে স্থায়ী কমিটি ও রাজ্য স্তরে স্ক্রিনিং কমিটি—অভিযোগ জমা তাদের কাছেই। তদন্ত করবেন কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর পর্ষদের ডিরেক্টর জেনারেল সেফগার্ডস)। অভিযোগ সঠিক প্রমাণ হলে দাম কমানোর নির্দেশ। বেআইনি মুনাফা ফেরত বা গ্রাহক কল্যাণ তহবিলে জমা। প্রয়োজনে জরিমানা, জিএসটি নথিভুক্তি বাতিল।

● **কৃষি খাদ্যে ৬৮ হাজার কোটি লগ্নির চুক্তি :**

ভারতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষিক্ষেত্রে বিপুল পুঁজি ঢালার প্রতিশ্রুতি মিলেছে। যার মোট অঙ্ক ৬৮ হাজার কোটি টাকা। ৩ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে শুরু হয় তিন দিনের ওয়ার্ল্ড ফুড ইন্ডিয়া, ২০১৭। উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতালি, জার্মানি ও ডেনমার্কের খাদ্য ও কৃষির মন্ত্রীরাও হাজির ছিলেন অনুষ্ঠানে। উদ্বোধনের দিনেই প্রায় ১৩-টি চুক্তি সই হয় বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে। মন্ত্রকের দাবি, এই বিপুল পুঁজির হাত ধরেই এক দিকে যেমন কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যপূরণ হবে, তেমনই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে হবে বিপুল কর্মসংস্থান। যেসব সংস্থা লগ্নির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাদের অন্যতম পেপসিকো, কোকা কোলা, আইটিসি, পতাঞ্জলি, অ্যামাজন, আরব আমিরশাহির শরফ গ্রুপ, ইয়েস ব্যাঙ্ক। পেপসিকো ঢালবে ১৩,৩০০ কোটি টাকা, কোকা কোলা ১১,০০০ কোটি, আইটিসি ১০,০০০ কোটি।

● **ব্যাঙ্কে আরও চার স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প :**

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে টাকা জমার পথ সহজ করতে আরও হাট করে দেওয়া হল ব্যাঙ্কের দরজা। এতদিন ওই ধরনের চারটি প্রকল্পে ডাকঘরের পাশাপাশি ব্যাঙ্কের মাধ্যমেও টাকা জমা দেওয়া যেত। তালিকায় যোগ হচ্ছে আরও চারটি স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প। সমস্ত সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পাশাপাশি এর অনুমতি পেয়েছে তিন বেসরকারি ব্যাঙ্কও। এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ও অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক। স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলি সবই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। এতে জমা টাকার উপর সুদও মেটায় তারাই। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রকল্প বিক্রি হলে তার জন্য কমিশন পায় ব্যাঙ্কগুলি। এতদিন স্বল্প সঞ্চয়ের যে চারটি প্রকল্পে লগ্নিকারীরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা জমা দিতে পারতেন, সেগুলি হল, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিপিএফ), কিসান বিকাশ পত্র-২০১৪, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা এবং প্রবীণ নাগরিক জমা প্রকল্প (সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিম-২০০৪)। এখন থেকে বাকি চারটিতেও ডাকঘরের পাশাপাশি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া যাবে। এগুলি হল, ১৯৮১ সালে চালু হওয়া জাতীয় মেয়াদি আমানত প্রকল্প, ১৯৮৭ সালে চালু হওয়া জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প বা মাসিক আয় প্রকল্প, ১৯৮১ সালে চালু হওয়া জাতীয় রেকারিং জমা প্রকল্প এবং জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট বা এনএসসি-র অষ্টম ইস্যু।

● **'২০২২-এ নতুন ভারত' :**

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০২২ সালকে পাখির চোখ করে গড়ে উঠছে নতুন ভারতের স্বপ্ন। '২০২২-এ নতুন ভারত' নামে রূপরেখায় নীতি আয়োগের দাবি, এখন থেকে টানা ৮ শতাংশ বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে পারলে, ২০৪৭ সালে বিশ্বের প্রথম তিন অর্থনীতির মধ্যে ঠাঁই পাবে ভারত। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সিইও ক্রিস্টালিনা জর্জিভাও গত ৪ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া'জ বিজনেস রিফর্মসের মঞ্চে বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যবিত্ত অর্থনীতিগুলির মধ্যে জায়গা করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে ভারত। আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরে বেশ কিছু স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনার ছবি উঠে এসেছে নীতি আয়োগের রূপরেখায়। বলা হয়েছে, অন্তত ৫০০ জন বাস করেন (কিছু ক্ষেত্রে ২৫০ জন) এমন সমস্ত গ্রাম প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক প্রকল্পে জুড়ে যেতে পারে ২০১৯ সালের মধ্যেই। ২০২২-এর মধ্যে দেশে মাথা তুলতে পারে ২০-টি বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ওই বছরের মধ্যে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার শপথ নেওয়া জরুরি বলেও মনে করে তারা।

খেলা

- দেশের সেরা স্নুকার প্লেয়ার পঙ্কজ আডবাণী। আইবিএসএফ ওয়ার্ল্ড বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ১২ নভেম্বর ইংল্যান্ডের মাইক রাসেলকে হারিয়ে নিজের ১৭তম বিশ্ব খেতাবটি জিতে নিলেন। আডবাণী রাসেলকে হারান ৬-২-এ। যে কোনও খেলার সঙ্গে যুক্ত এদেশের সমস্ত ক্রীড়াবিদের তুলনায় সব থেকে বেশিবার বিশ্ব খেতাব জিতেছেন এই ভারতীয় ক্রীড়াবিদ।
- গত ২৮ জুলাই থেকে ২৮ অক্টোবর পঞ্চম মরসুমের প্রো কবাডি লিগ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের টুর্নামেন্টে অংশ নেয় মোট ১২-টি দল। এর মধ্যে ইউপি যোদ্ধা, তামিল থালাইভাস, হরিয়ানা স্টিলার্স ও গুজরাট ফর্চুনজায়েন্টেস-এর মতো ৪-টি নতুন দলও ছিল। গুজরাট ফর্চুনজায়েন্টেস ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পাটনা পাইরেটস-এর কাছে পরাস্ত হয়। এই নিয়ে তৃতীয়বার এই পেশাদার কবাডি প্রতিযোগিতা জিতল পাটনা পাইরেটস।
- পাকিস্তানের কিরন বালুচের ২৪২ ও মিতালি রাজের ২১৪ রানের ইনিংসের ঠিক পরেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন এলিসা।

মেয়েদের অ্যাশেজের একমাত্র টেস্টে ২১৩ রানের ইনিংস খেলে নজির গড়েন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার এলিসা পেরির। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নর্থ সিডনি ওভালে দিন-রাতের টেস্টের তৃতীয় দিনে ৩৭৪ বলে ২৬-টি চার ও একটি ছয় মেরে এই রেকর্ড গড়লেন। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৯৫ ছিল তার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বোচ্চ রান। প্রসঙ্গত, ক্রিকেট ছাড়া ফুটবল বিশ্বকাপেও খেলেছেন এলিসা।

- আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির দ্রুততম শতরান করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলার। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৩৫ বল-এ। ইনিংস শেষে ৩৬ বল-এ ১০৬ রানে অপরাজিত ছিলেন মিলার। এখানেই শেষ নয়, মহম্মদ সইফুদ্দিন-এর এক ওভারে মারলেন ৫-টি ছয়ও। গত ২৯ অক্টোবর পচেস্ট্রুমে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকারই রিচার্ড লেভির ৪৫ বল-এ ১০০ রানের রেকর্ডটি ভেঙে দেন।
- বরোদা অনূর্ধ্ব ১৯ দলের অধিনায়ক মোহিত মোঙ্গিয়া। বরোদার হয়ে কেরলের বিরুদ্ধে ২৪৬ বলে মোহিতের ব্যাট থেকে আসে ২৪০ রান। কোচবিহার ট্রফিতে এর আগে বরোদার হয়ে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল নয়ন মোঙ্গিয়ার। ১৯৮৮-তে নয়ন মোঙ্গিয়ার ব্যাট থেকে এসেছিল ২২৪ রান। মোহিত সেই রানকে ছাপিয়ে গেলেন ২০১৭ সালে। প্রসঙ্গত, নয়ন মোঙ্গিয়ারই ছেলে মোহিত। বাবার রেকর্ড তো ভাঙলেনই সঙ্গে বরোদা অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে কোচবিহার ট্রফিতে সর্বোচ্চ রানও লিখে নিলেন নিজের নামের পাশে।
- অবসর নেবেন আগেই জানিয়েছিলেন। গত ৬ নভেম্বর হঠাৎই সেই অবসর ঘোষণা করে দিলেন ইতালির তারকা ফুটবলার আন্দ্রে পির্লো। ৩৮ বছরের প্রাক্তন এই জুভেন্তাস তারকা খেলেছেন ইন্টারমিলান, এসি মিলান-এর মতো ক্লাবের হয়ে। অবসর ঘোষণার আগের দিনই বর্তমান ক্লাব নিউইয়র্ক সিটির হয়ে খেলেছেন কলোম্বাস ক্রিউয়ের বিরুদ্ধে। পির্লোর ঝুলিতে রয়েছে বিশ্বকাপ, দু'টো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং ছ'টি সিরি 'এ' ট্রফি। পির্লো বিখ্যাত ছিলেন তার ফ্রি-কিকের জন্য। সঙ্গে তাকে 'আর্কিটেক্ট'-ও বলা হ'ত। কারণ, তিনি ছিলেন প্লে মেকার।
- গত ১৭ নভেম্বর চতুর্থ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হল। এই মরসুমের ফাইনাল হবে ২০১৮-র ১৭ মার্চ, কলকাতায়। এবার টুর্নামেন্টে খেলছে দশটা দল। নতুন সংযোজন জামশেদপুর এফসি আর বেঙ্গালুরু এফসি দল।

● ১২-টি ডবল সেঞ্চুরির রেকর্ড পূজারার :

রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে রেকর্ড করলেন চেতেশ্বর পূজারা। নিজের নামের পাশে লিখে নিলেন ১২-টি ডবল সেঞ্চুরি। ছাপিয়ে গেলেন বিজয় মার্চেন্টকে। দ্বিতীয় দিন সৌরাষ্ট্রর হয়ে পূজারা থেমেছিলেন ১২৫ রানে। প্রতিপক্ষ ছিল ঝাড়খণ্ড। তৃতীয় দিন নেমে মার্চেন্টের ১১-টি ডবল সেঞ্চুরির রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেলেন পূজারা। ৩৫৫ বলে পূজারার ২০৪ রানের ইনিংসে ছিল ২৮-টি বাউন্ডারি। ১০-টি ডবল সেঞ্চুরি রয়েছে রাহুল দ্রাবিড়, সুনীল গাভাস্কর ও বিজয় হাজারের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মার্চেন্টের রেকর্ড অটুট ছিল ৭০ বছরের বেশি। এতদিন পর তাকে কেউ ছাপিয়ে গেল। পূজারার ১২-টি ডবল সেঞ্চুরির মধ্যে তিনটি এসেছিল টেস্ট ক্রিকেটে। তার মধ্যে দু'টো ট্রিপল সেঞ্চুরি। উল্লেখ্য, বিশ্ব ক্রিকেটে এই রেকর্ড রয়েছে ডন ব্র্যাডম্যানের দখলে।

● আইসিসি র‍্যাঙ্কিং :

❖ ১০ দিনের মধ্যেই আবার সেরার আসন ছিনিয়ে নিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি। গত ৩০ অক্টোবর একদিনের ক্রিকেটে কেরিয়ারের সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ স্থান ফিরে পেলেন। পয়েন্টে ছাপিয়ে গেলেন শচীন তেন্ডুলকরকে। এর ১০ দিন আগেই বিরাটকে ছাপিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডিভিলিয়ার্স। কিন্তু ১০ দিনের বেশি সেই স্থান ধরে রাখতে পারলেন না। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করতেই আবার শীর্ষে বিরাট। ২-১-এ সিরিজও জিতে নিয়েছে ভারত। তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে বিরাটের মোট রান ২৬৩। রেটিং পয়েন্ট পৌঁছে গিয়েছে ৮৮৯-এ। ভারতীয়দের মধ্যে এটাই সেরা। এর আগে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ছিল ৮৮৭, শচীনের দখলে। ১৯৯৮-এ এই পয়েন্টে পৌঁছেছিলেন শচীন তেন্ডুলকর। বিরাটের সঙ্গে রোহিত শর্মাও তার কেরিয়ারের সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্ট (৭৯৯) নিয়েও র‍্যাঙ্কিংয়ে সাত নম্বরেই থেকে গেলেন। প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি একধাপ উঠে জায়গা করে নিলেন ১১ নম্বরে। বোলিংয়ের শীর্ষে অবশ্য এখনও পাকিস্তানের হাসান আলি। অন্যদিকে, ভারতের জসপ্রীত বুমরাহ কেরিয়ারের সেরা র‍্যাঙ্কিং তিন নম্বরে জায়গা করে নিলেন। এই সিরিজে মোট ছ'টি উইকেট পেয়েছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগতভাবে তুলে আনলেও ভারত কিন্তু ছাপিয়ে যেতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ১২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দু' পয়েন্ট পিছনে ভারত।

❖ ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ব্যাটিং শীর্ষে উঠে এলেন আরও একজন ভারতীয়। মহিলা দলের অধিনায়ক মিতালি রাজ। ছিলেন দ্বিতীয় স্থানে, ৩০ অক্টোবর প্রকাশিত আইসিসি ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিংয়ে একধাপ উঠে মিতালি চলে এলেন শীর্ষে। দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়ার এলিস পেরি। তৃতীয় নিউজিল্যান্ডের অ্যামি স্যাটারওয়েট। সেরা দশে ভারতের আর রয়েছেন কেবল হরমনপ্রীত কৌর। এই দু'জন ছাড়া সেরা কুড়িতে আর কোনও ভারতীয়র জায়গা হয়নি। ওডিআই বোলিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারতের ঝুলন গোস্বামী। শীর্ষে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মারিজেন কাপ। বোলিংয়ের সেরা দশে ঝুলন ছাড়া আর কোনও ভারতীয়ের জায়গা হয়নি। সেরা কুড়িতে রয়েছেন একতা বিস্ত, শিখা পাণ্ডে ও রাজেশ্বরী গায়েকওয়াড়। অল রাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশের মধ্যে সাত নম্বরে রয়েছেন দীপ্তি শর্মা। দশম ঝুলন গোস্বামী। সেরা কুড়িতে রয়েছেন আরও দু'জন ভারতীয়। ১৬ ও ১৭ নম্বরে শিখা পাণ্ডে ও হরমনপ্রীত কৌর। শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ার এলিস পেরি।

● হকিতে 'ডবল' এশিয়া চ্যাম্পিয়ন ভারত :

আগামী বছর নভেম্বরে হকি বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে ভারতে। তার ঠিক এক বছর আগে একই সঙ্গে এশিয়া হকিতে 'ডাবল' চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় উচ্ছ্বসিত গোটা দেশ। প্রথমে ২২ অক্টোবর ভারতের পুরুষ দল ঢাকায় মালয়শিয়াকে ২-১-এ হারিয়ে এশিয়া কাপ জেতে। আর তার পর আবার গত ৫ নভেম্বর জাপানের কাকামিগাহারায় চিনকে সাডেন ডেথে ৫-৪ গোলে হারিয়ে ১৩ বছর পর এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতের মহিলা হকি দল। ফলে ভারতের দু'টি দলই জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বকাপেও।

● ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে সেরার লড়াই :

ভারত সেরা সাইনা নেহওয়াল। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে সেরার লড়াইয়ের ফাইনালে সাইনা বনাম পিভি সিন্ধু। নাগপুরে ২১-১৭, ২৭-২৫ ফলে পিভি সিন্ধুকে হারিয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন সাইনা। দু'জনই হায়দরাবাদি কন্যা। প্রথম জন পাঁচ বছর আগে লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ

পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় জন গত বছর রিও-তে পান রুপো। সিন্ধু বিশ্বের দু' নম্বর খেলোয়াড় আর এগারো নম্বর সাইনা। গত ৮ নভেম্বর নাগপুরে জাতীয় ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে শুরুতেই ২-০ এগিয়ে গিয়েছিল সিন্ধু। দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে, ২১-১৭-এ সাইনা জিতে নেন প্রথম গেম। দ্বিতীয় গেমেও এক ছবি। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ২৭-২৫ ফলে সিন্ধুকে হারিয়ে দশ বছর পরে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। সাইনা শেষবার জাতীয় ব্যাডমিন্টনে নেমেছিলেন ২০০৭ সালে। সিন্ধু অবশ্য চার বছর আগেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন এই টুর্নামেন্টে।

ছেলেদের মধ্যে ভারত সেরা এইচএস প্রণয়। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচে তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে দু' নম্বরে থাকা কিদম্বি শ্রীকান্তকে হারান ২১-১৫, ১৬-২১, ২১-৭। ফর্মের তুঙ্গে থাকা সতীর্থকে হারিয়ে প্রথম জাতীয় খেতাব জিতলেন প্রণয়। পাঁচটি সুপার সিরিজের ফাইনালে উঠে তার মধ্যে চারটিতে জিতে লিন ড্যান, লি চং ওয়েই ও চেন লং-এর রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলা সতীর্থকে হারিয়ে দেন তিনি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দু' জনের শেষ তিনটি মোকাবিলায় শ্রীকান্তই জেতেন। শেষবার প্রণয় শ্রীকান্তকে হারিয়েছিলেন ২০১১ সালের টাটা ওপেন। শ্রীকান্তের মতো খেতাব এ মরসুমে না থাকলেও আন্তর্জাতিক স্তরে দুরন্ত ফর্মে আছেন প্রণয়ও। ইন্দোনেশিয়া সুপার সিরিজ ও ফরাসি ওপেন সুপার সিরিজের সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন। চলতি মরসুমেই মালয়েশিয়ার প্রাক্তন বিশ্বসেরা লি চং ওয়েই-কে দু'বার ও চেন লং-কে একবার হারিয়ে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ১১ নম্বরে পৌঁছন প্রণয়। প্রণয় ছাড়াও টুর্নামেন্টে এবার দারুণ সফল অশ্বিনী পোনাপ্পা। দ্বি-মুকুট জিতলেন তিনি। প্রথমে সাতউইকসাইরাজ রানকিরেড্ডি-র সঙ্গে জুটি বেঁধে মিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হন। পাশাপাশি ডাবলসে এন সিকি রেড্ডি-র সঙ্গে জুটি বেঁধে ফাইনালে জেতেন।

● **ফরাসি ওপেন সুপার সিরিজে জয় শ্রীকান্তের :**

গত ২৯ অক্টোবর জাপানের কেন্তা নিশিমোতো-কে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে ফরাসি ওপেন সুপার সিরিজ জিতে নিলেন ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা কিদম্বি শ্রীকান্ত। এই নিয়ে দু' সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় সুপার সিরিজ খেতাব জিতলেন শ্রীকান্ত। জাপানের প্রতিপক্ষকে মাত্র ৩৪ মিনিটে ২১-১৪, ২১-১৩ ফলে হারিয়ে দেন। এই জয়ের ফলে অর্জন করলেন বিরল এক কৃতিত্বও। এক ক্যালেন্ডার বর্ষে শ্রীকান্তই প্রথম খেলোয়াড় যিনি চারটি সুপার সিরিজ খেতাব জিতলেন। আর সুপার সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিকও সম্পন্ন করেছেন।

সুপার সিরিজকে ব্যাডমিন্টনে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির টুর্নামেন্ট বলা যেতে পারে। ব্যাডমিন্টনে এখনও সর্বোচ্চ স্বীকৃতি ধরা হয় অলিম্পিক্সে সোনা জয়কে। তার পরেই অল ইংল্যান্ড ওপেন এবং বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। এরপর ধরা হয় সুপার সিরিজ প্রিমিয়ার খেতাব। অল ইংল্যান্ড সুপার সিরিজ প্রিমিয়ার টুর্নামেন্টের মধ্যে পড়ে। সেই বিভাগে আরও রয়েছে চিন, ইন্দোনেশিয়া, ডেনমার্ক বা মালয়েশিয়া ওপেন। যদিও অলিম্পিক্স ছাড়া ব্যাডমিন্টনে অল ইংল্যান্ড ওপেনের কদরই এখনও সবচেয়ে বেশি রয়েছে বেশিরভাগ ক্রীড়াপ্রেমীর কাছে। ভারতীয়দের মধ্যে যে টুর্নামেন্ট জিতেছেন প্রকাশ পদুকোন এবং পুলেল্লা গোপীচন্দ।

● **ব্যাডমিন্টনের র‍্যাঙ্কিংয়ে শ্রীকান্তের রেকর্ড :**

দারুণ ফর্মে রয়েছে ভারতের শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্ত। ২০১৭ সালে পর পর সেরার শিরোপা উঠেছে ২৪ বছরের এই ভারতীয়ের মাথায়। যার ফলে চার থেকে দু' ধাপ উঠে দুয়ে জায়গা করে নিলেন শ্রীকান্ত। সদ্য প্রকাশিত ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলস র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের হয়ে সর্বকালের সেরা স্থান পেলেন। তার কেরিয়ারের সেরা র‍্যাঙ্কিং তো বটেই সঙ্গে কোনও পুরুষ ভারতীয় শাটলারেরও এটাই সেরা র‍্যাঙ্কিং। ২০১৭ সালে রেকর্ড চারটি সুপার সিরিজ জিতে নিয়েছেন শ্রীকান্ত। যার ফলে তার রেটিং পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৭৩ হাজার ৪০৩। তার আগে রয়েছেন ভিক্টর অ্যাক্সেলসেন। যাকে গত অক্টোবর মাসেই ডেনমার্ক ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে দিয়েছিলেন শ্রীকান্ত। সেটাই ছিল শ্রীকান্তের এই বছরের চতুর্থ সুপার সিরিজ জয়। পুরুষদের সিঙ্গলস র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ উঠে এগারোতে জায়গা করে নিয়েছেন এইচএস প্রণয়।

● **ফের এশিয়া সেরা মেরি কম :**

এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতলেন মেরি কম। এই নিয়ে পঞ্চমবার। তবে, পাঁচবার সোনা জিতলেও ৪৮ কেজি বিভাগে এটাই ৩৫ বছর বয়সী মেরির প্রথম সোনা। গত এক বছর ধরে ভারতীয় দলের হয়ে বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, আয়ারল্যান্ড সফরে গেলেও কোথাও ফাইনালে ওঠা হয়নি অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী এই বক্সারের। অবশেষে এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেই বাজিমাত। গত ৮ নভেম্বর খেতাবি লড়াইয়ে মেরি মুখোমুখি হয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার প্রতিপক্ষ হিয়াং মি কিমের। ফাইনালের লড়াইয়ে মেরির পক্ষে খেলার ফল ৫-০। ২০১৪-এর পর এটিই রাজ্যসভার সদস্য ও তিন সন্তানের মা মেরি কমের প্রথম আন্তর্জাতিক সোনা। প্রায় দু' দশক ধরে তিনি বক্সিং রিংয়ে রয়েছেন। এশিয়ান গেমস থেকে শুরু করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ—সোনা জিতেছেন সব জায়গায়। আর এবার সোনা জিতলেন অবসর নিয়ে ফিরে আসার পরেও। প্রসঙ্গত, দশ জনের ভারতীয় দল অংশ নিয়েছিল টুর্নামেন্টে। 'ফেদারওয়েট' শ্রেণিতে ভারতের সোনিয়া ল্যাথার রুপো জেতেন। এছাড়াও ভারতের হয়ে অন্যান্য বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন প্রিয়াঙ্কা (৬০ কেজি), সরিতা দেবী (৬৪ কেজি), লাভলিনা বরগোঁহাই (৬৯ কেজি), শিক্ষা (৫৪ কেজি) ও সীমা পুনিয়া (+ ৮১ কেজি)।

● **কমনওয়েলথ শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষে ভারত :**

ব্রিসবেনে কমনওয়েলথ শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৬-টি সোনা ও ৭-টি করে রুপো ও ব্রোঞ্জ মেডেল জিতে পদক তালিকায় শীর্ষে ভারত। গত ২৮ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর চলে এই প্রতিযোগিতা। পুরুষদের মধ্যে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগে জয়জয়কার ভারতীয় শুটারদেরই। এই বিভাগে সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ—তিনটেই চলে আসে ভারতীয়দের দখলে। শাহজার রিজভি সোনা জেতার পাশাপাশি, রুপো ও ব্রোঞ্জ জেতেন ওমকার সিং ও জিতু রাই। এছাড়া পুরুষ বিভাগে সোনা জিতেছেন প্রকাশ নাঞ্জপা (৫০ মিটার পিস্তল), সত্যেন্দ্র সিং (৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পসিশনস) ও অঙ্কুর মিত্তল (ডাবল ট্র্যাপ)।

ভারতের মেয়েরা জেতেন দু'টি সোনা। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে সোনা জয়ী অর্জুন অ্যাওয়ার্ড জয়ী হিনা সিধু। দুই অস্ট্রেলিয়ান প্রতিপক্ষ এলিনা গ্যালিয়াবোভিচ এবং ক্রিস্টি গিলম্যানকে হারিয়ে। ২৪০.৮ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জেতেন হিনা, অন্যদিকে ২৩৮.২ পয়েন্ট নিয়ে রুপো জেতেন এলিনা গ্যালিয়াবোভিচ। ২১৩.৭ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন অপর অস্ট্রেলিয়ান ক্রিস্টি গিলম্যান। অন্যদিকে, পূজা ঘাটকর সোনা জেতেন মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল বিভাগে। এই বিভাগে রুপোও গিয়েছে ভারতীয় শুটার অঞ্জুম মৌদগিলে দখলে। ব্রোঞ্জ পেয়েছেন সিঙ্গাপুরের মার্টিনা লিন্ডসে ভেলোসো।

● **আইএসএসফে বিশ্বকাপে সোনা জিতু-হিনা জুটির :**

আইএসএসএফ বিশ্বকাপে প্রথম সোনা জিতল ভারত। গত ২৪ অক্টোবর ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টের ফাইনালে ভারতকে সোনা এনে দিলেন জিতু রাই এবং হিনা সিধু জুটি। এশিয়ান গেমস এবং কমনওয়েলথ গেমে সোনা জয়ী জিতু এবং অর্জুন অ্যাওয়ার্ড জয়ী হিনা জুটি ছিল এই ইভেন্টে অন্যতম ফেভারিট। এই নিয়ে তৃতীয়বার মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা জিতল জিতু-হিনা জুটি। ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল ফ্রান্স। রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ফ্রান্সকে। চিন এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছে। মিক্সড টিম ইভেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এই বছরই পরীক্ষামূলকভাবে বিশ্বকাপে চালু করা হয়। ২০২০ টোকিও অলিম্পিকেও একে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

● **জাতীয় স্কুল ভলিবল চ্যাম্পিয়ন বাংলার মেয়েরা :**

জাতীয় অনূর্ধ্ব ১৭ স্কুল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা বাংলার মেয়েরা। প্রতিযোগিতায় ৬-টি ম্যাচের মধ্যে ৫-টিতেই স্ট্রেট সেটে জেতে তারা। 'স্কুল গেমস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া' আয়োজিত ৬৩তম ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ গত ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের নার্লাজেলায়। ফাইনাল হয় ৩১ অক্টোবর। গ্রুপ লিগের খেলায় উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব এবং গোয়াকে হারিয়ে নক-আউট পর্যায়ে পৌঁছয় বাংলা। কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের সামনে ছিল কেরল। সেমিফাইনালে তামিলনাড়ুকে ৩-০ সেটে হারায় বাংলা। ফাইনালে মহারাষ্ট্রের মুখোমুখি হয়। ২৫-১৫, ২৫-১২, ২৫-২০ পয়েন্টের ব্যবধানে জিতে সেরার শিরোপা অর্জন করে বাংলার মেয়েরা। তবে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে বাংলার ছেলেদের। গ্রুপ লিগে তিনটির মধ্যে দু'টি ম্যাচ জিতলেও উত্তরাখণ্ডের কাছে হারে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উত্তরাখণ্ড নক-আউট পর্যায়ে পৌঁছয়।

● **বাসেল ওপেনে বিজয়ী রজার ফেডেরার :**

গত ২৯ অক্টোবর খুয়ান মার্টিন দেন পোত্রো-কে হারিয়ে বাসেল ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হলেন রজার ফেডেরার। ফল ৬-৭, ৬-৪, ৬-৩। এখানেই ২০১২ এবং ২০১৩ সালে দেল পোত্রোর কাছে হেরে গিয়েছিলেন ফেডেরার। নিজের ৯৫তম এটিপি টুর্নামেন্ট জিতে ট্রফি জয়ের সর্বকালের সেরার তালিকায় ফেডেরার উঠে এলেন দু' নম্বরে। সামনে এখন শুধু জিমি কোনর্স (১০৯)। একই সঙ্গে র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে থাকা রাফায়েল নাদালের আরও কাছে চলে এলেন তিনি। দেল পোত্রোর বিরুদ্ধে ফেডেরারের কেরিয়ার রেকর্ড এখন ১৮-৬। বছরটা এই সুইস টেনিস কিংবদন্তির পক্ষে দারুণ কেটেছে। দু'টো গ্র্যান্ড স্ল্যাম ছাড়াও এসেছে অন্য ট্রফি। এমনকী র‍্যাঙ্কিংয়েও এক নম্বর হওয়ার দিকে এগোচ্ছেন তিনি।

● **আবার অবসরের ঘোষণা হিঙ্গিসের :**

অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন চিন ওপেনের ডাবলসে। ব্যস্ত মরসুম শেষের ডব্লিউটিএ ফাইনালসে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক টেনিস থেকে হঠাৎ অবসরের ঘোষণা করলেন মার্টিনা হিঙ্গিস। সিঙ্গলস এবং ডাবলস মিলিয়ে পেশাদার কেরিয়ারে ৩৫-টি খেতাব জয়ী ৩৭ বছর বয়সী সুইস তারকা দীর্ঘ কেরিয়ারে এই নিয়ে তৃতীয়বার অবসরের ঘোষণা করলেন। ২২ বছর বয়সে প্রথমবার হিঙ্গিস জানান অবসরের সিদ্ধান্ত। ২০০৩ সালে। কিন্তু কোর্টে ফিরে আসেন ২০০৬ সালে। তার বিরুদ্ধে এই সময়েই নিষিদ্ধ মাদক নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। দু' বছর সাসপেন্ডও হন এবং ২০০৭-এ আবার অবসর নেন। ছ' বছর পরে ফের হিঙ্গিসের প্রত্যাবর্তন ২০১৩-এ। হিঙ্গিস মেয়েদের টেনিসে ছ'জন খেলোয়াড়ের অন্যতম যার সিঙ্গলস এবং ডাবলস দু'টি বিভাগেই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে আসার কৃতিত্ব রয়েছে। কনিষ্ঠতম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী হিসেবে নজির গড়েছিলেন ১৯৯৬ সালে উইম্বলডনের ডাবলসে হেলেনা সুকোভার সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন হয়ে। ১৯৯৭-এ মাত্র ১৬ বছর বয়েসে বিশ্বের এক নম্বর হন।

● **হকিতে ২২ গোলে জয় ভারতের :**

জুনিয়ারদের হকিতে আমেরিকাকে গোলের মালা পরাল ভারত। গত ২৫ অক্টোবর মালয়েশিয়ার জোহর বারুতে ২০১৭ সুলতান অব জোহর কাপে আমেরিকাকে ২২-০ গোলে উড়িয়ে দিলেন দিলপ্রীত সিং-হরমনজীত সিং-রা। গোলরক্ষক ছাড়া প্রত্যেকেই এই ম্যাচে গোল করেন ভারতের হয়ে। ম্যাচে ভারতের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন বিশাল আন্টিল, দিলপ্রীত সিং, হরমনজীত সিং এবং অভিষেক। ম্যাচের সর্বোচ্চ গোলদাতাও হরমনজীত। চার গোল করেন অভিষেকও। ভারতের হয়ে দু'টি গোল করেন মণীন্দ্র সিং এবং একটি করে গোল করেন প্রতাপ লাকরা, রবিচন্দ্র মইরাংথেম, রশন কুমার, শিলানন্দ লাকরা এবং বিবেক প্রসাদ। অন্যদিকে, একটিও গোল করতে পারেনি আমেরিকা।

● **২০১৮ ফিফা বিশ্বকাপ :**

❖ **বাদ পড়ল ইতালি :** রাশিয়া বিশ্বকাপের মূল পর্বে পৌঁছতে ব্যর্থ হল ইতালি। ১৯৫৮ সালের পর এই প্রথম বিশ্ব ফুটবলের মেগা টুর্নামেন্টে নিজেদের জায়গা পাকা করতে ব্যর্থ চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এই দেশ। ঘানা, আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস-এর পর চতুর্থ হেভিওয়েট দল হিসেবে ব্যর্থ ইতালি। গত ১৪ নভেম্বর ফিরতি লিগের খেলায় সুইডেনের মুখোমুখি হয়েছিল ইত্যালি। প্রথম ম্যাচে সুইডেনের কাছে পিছিয়ে থাকায় এই ম্যাচে জিততেই হ'ত বুফনের দলকে। কিন্তু ১-০ গোলে ইত্যালিকে ব্যাকফুটে ফেলে বিশ্বকাপে মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিল সুইডেন। ওই দিনই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়ার কথা জানিয়ে দেন ইতালির কিংবদন্তি গোলরক্ষক বুফন। বিশ্বকাপের মঞ্চে সর্বাধিকবার যোগ্যতা অর্জন করার রেকর্ড রয়েছে ব্রাজিলের দখলে। ২০ বার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানি, ১৬ বার। ঠিক পরেই রয়েছে ইতালির নাম। তারা অংশ নিয়েছে ১৪ বার।

❖ **অফিশিয়াল বল :** নাম 'টেলস্টার ১০'। রাশিয়া বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল। সেই বলের প্রথম ছবি ট্যুইট করল এক ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা। সেই ছবিতে বল হাতে দেখা গেল জিনেদিন জিদান, দেল পিয়েরো, জাভি আলোন্সো, কাকা ও লুকাস পোদোলোস্কি। বলের উদ্বোধনে ছিলেন বিশ্ব ফুটবলের এই তারকা ফুটবলাররা। যেখানে লেখা ছিল, "স্কোয়াড গোলস"। ভিডিওতে রয়েছেন স্বয়ং মেসি-ও। ২০১৮ সালের ১৪ জুন থেকে রাশিয়ায় শুরু হবে এবারের বিশ্বকাপ। ফাইনাল ১৫ জুলাই। এক মাসের এই বিশাল কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে ৩২-টি দেশ।

● **নিউজিল্যান্ডকে একদিনের ও টি-২০ সিরিজে হারাল ভারত :**

গত ২২ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসে। একদিনের ও টি-২০ সিরিজ দু'টোই ভারত ২-১-এ জেতে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য—

☐ প্রথম একদিবসীয় ম্যাচটি (২২ অক্টোবর, মুম্বাই) ছিল বিরাট কোহলির ক্রিকেট জীবনের ২০০তম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এদিন শতরান করেও আরও দু'টি নজির গড়েন তিনি—২০০তম

একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে সেঞ্চুরি করা দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হলেন; আর, একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শতকের তালিকায় পৌঁছে গেলেন দু' নম্বরে।

☐ তৃতীয় একদিবসীয় ম্যাচে (২৯ অক্টোবর, কানপুর) বিরাট কোহলি একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৯ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁলেন এবং ইনিংসের সংখ্যার নিরিখে হয়ে উঠলেন বিশ্বের দ্রুততম ব্যাটসম্যান। এদিনই তিনি রোহিত শর্মার সঙ্গে জুটি বেঁধে ২৩০ রানের পার্টনারশিপ গড়ে তোলেন, যা কি না এই জুটির চতুর্থ দ্বি-শতরানের পার্টনারশিপ। এই ওয়ান ডে-তে কোহলি করলেন তার ৩২তম সেঞ্চুরি। সামনে শুধু শচীন তেন্ডুলকর (৪৯-টি)। আর একটানা ৭-টি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতে নতুন কীর্তি গড়লেন অধিনায়ক হিসেবে। ছাপিয়ে গেলেন দ্রাবিড়, ধোনিদের। তাদের ছিল টানা ৬-টি সিরিজ জয়।

☐ প্রথম টি-২০ ম্যাচে (১ নভেম্বর, দিল্লি) একদিকে টি-২০-তে অভিষেক হল শ্রেয়াস আইয়ারের আর অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেন বর্ষীয়ান পেসার আশিস নেহরা।

☐ দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ (৪ নভেম্বর, রাজকোট)-এ টি-২০-তে অভিষেক হল মহম্মদ সিরাজের। এদিনই প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে বিরাট কোহলি টি-২০-তে ৭ হাজার রান করেন।

☐ তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ (৭ নভেম্বর, তিরুবনন্তপুরম)-এ দেশের ৫০তম আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মাঠ হিসেবে অভিষেক হল গ্রিনফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের।

● **যুব বিশ্বকাপের আসর ভারতে :**

গত ৬ থেকে ৮ অক্টোবর প্রথমবার ভারতে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের আসর বসে। আয়োজক ভারত-সহ মোট ২৪-টি দল অংশগ্রহণ করে। মোট ৫২-টি ম্যাচ খেলা হয় দিল্লি, গোয়া, গুয়াহাটি, কোচি, কলকাতা ও মুম্বাই-এ। কলকাতায় ফাইনাল ম্যাচে স্পেনকে ৫-২ গোলে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হল ইংল্যান্ড। তাও আবার অল-উইন চ্যাম্পিয়ন, অর্থাৎ সারা টুর্নামেন্টে তার একটি ম্যাচও হারেনি।

প্রসঙ্গত, অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলে এতদিন সর্বোচ্চ দর্শকের রেকর্ড ছিল চিনের হাতে। ১৯৮৫-তে চিনের মাটিতেই শুরু হয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ। সেইবার দর্শক সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৭৬। ফাইনাল ডে-র আগে পর্যন্ত ভারত পৌঁছে গিয়েছিল ১২ লক্ষ ১৪ হাজার ২৭-এ। ব্যবধান মাত্র ৬,৯৪৯। ফাইনাল ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে, সেই দিনই তৃতীয় স্থানের জন্য ব্রাজিল বনাম মালি ম্যাচেই সেই লক্ষ্যকে ছাপিয়ে গেল কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। ৫৬ হাজার ৪৩২ জন দর্শক এসেছিলেন সেই ম্যাচ দেখতে। এই ম্যাচেই ভেঙে যায় রেকর্ড। ফাইনালের আগে পর্যন্ত দর্শক সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৫৯ জন। পরে ফাইনাল ম্যাচের সময় সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬ হাজার ৬৮৪-তে। সব মিলিয়ে এবার ভারতে দর্শক সংখ্যা হল ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৪৩।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

➢ দূষণ কমাতে গত ১৫ নভেম্বর নতুন ঘোষণা করল তেলমন্ত্রক। তেল সংস্থাগুলির সঙ্গে কথা বলে মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আগামী পয়লা এপ্রিল থেকেই দিল্লিতে ভারত স্টেজ-৬ (বিএস-৬) মানের জ্বালানি চালু হবে। রাজধানী সংলগ্ন অঞ্চলে ২০১৯-এর এপ্রিল থেকেই এই উন্নত তেল চালু করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতেও সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

● **দূষণে অকালমৃত্যুতে শীর্ষে ভারত :**

দূষণের জেরে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অকালমৃত্যুর ঘটনা ঘটে ভারতে। বিশ্বজোড়া সমীক্ষার ভিত্তিতে গোটা পৃথিবীতে দূষণজনিত অকালমৃত্যুর হিসেব তুলে ধরেছে দ্য ল্যানসেট মেডিক্যাল জার্নাল। হিসেব বলছে, বায়ুদূষণ, জলদূষণ এবং অন্যান্য দূষণের কারণে ২০১৫ সালে গোটা পৃথিবীতে অকালমৃত্যু হয়েছিল প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষের। এর মধ্যে ২৫ লক্ষই ভারতে। রিপোর্ট আরও বলছে, ২০১৫ সালে পৃথিবীতে প্রতি ছ'টি অকালমৃত্যুর একটি হয়েছে দূষণজনিত অসুস্থতার জেরে। ধূমপান, অনাহার বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরেও এত অকালমৃত্যু সেবছর হয়নি পৃথিবীতে। এড্‌স, যক্ষ্মা এবং ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সম্মিলিত সংখ্যা এই দূষণজনিত অকালমৃত্যুর সংখ্যার চেয়ে ঢের কম। দূষিত বা বিষাক্ত পরিবেশের জেরে মৃত্যু, অসুস্থতা এবং সেরে ওঠা বাবদ পৃথিবীতে মোট খরচের পরিমাণও চোখ কপালে তোলার মতো, ৪ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি ডলার, গোটা পৃথিবীর অর্থনীতির ৬.২ শতাংশ। এই রিপোর্টে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা এশিয়ার। ২০১৫ সালে দূষণজনিত কারণে ৯০ লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যুর মধ্যে ২৫ লক্ষ হয়েছে ভারতে, ১৮ লক্ষ চিনে। এছাড়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়ার মতো এশীয় দেশগুলিতেও বার্ষিক অকালমৃত্যুর সংখ্যার ২০ শতাংশই দূষণের কারণে। আফ্রিকার দক্ষিণ সুদান বা ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের হাইতিতেও দূষণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে।

● **'গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স' তালিকায় ছ' নম্বরে ভারত :**

রোজ বদলাচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ুর মর্জি, মেজাজ। বদলাচ্ছে স্থানীয় জলবায়ুও। পরিবেশবিদেরা জানাচ্ছেন জলবায়ুর এই খামখেয়ালিপনার পিছনে রয়েছে বিশ্ব উষ্ণায়ণ। তার সম্ভাব্য কারণ বাড়তে থাকা দূষণ। আন্তর্জাতিক পরিবেশ গবেষণা সংস্থা জার্মানওয়াচ বহুদিন ধরেই বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা চালায়। ওই সমীক্ষাকে বলা হয় 'গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স' বা 'সিআরআই'। বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, সুনামি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তার ফলে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি, দুরারোগ্য ব্যাধি, মহামারীর প্রকোপ—সব কিছুর নিরিখে এই সমীক্ষা চালানো হয়। ২০১৬ সালের সমীক্ষায় সিআরআই-এর বিচারে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ভারত। প্রথম পাঁচে হাইতি, জিম্বাবোয়ে, ফিজি, শ্রীলঙ্কা এবং ভিয়েতনাম। দশম স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাইপেই, ম্যাসেডোনিয়া এবং বলিভিয়াও রয়েছে প্রথম দশের মধ্যেই।

জার্মানওয়াচের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৬ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভারতে সর্বাধিক প্রাণহানি এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে এদেশের প্রায় ২,১১৯ জন মানুষ। সম্পত্তিহানি হয়েছে প্রায় ২,১০০ কোটি ডলার (ভারতীয় টাকায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৫৮ কোটি টাকা)। ১৯৯৭ সালের সিআরআই অনুযায়ী ভারতের স্থান ছিল দ্বাদশে। ক্রমশ সেই অবস্থার অবনতি হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯৭ সালে ১১ হাজার প্রাকৃতির বিপর্যয়ের ঘটনার প্রায় ৫ লক্ষ ২০ হাজার প্রাণহানি হয়েছিল।

গত ২০ বছরের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে হন্ডুরাস, ময়ানমার এবং হাইতি। তারপর আছে নিকারাগুয়া, ফিলিপিন্স এবং বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড়ো প্রভাব পড়ে ২০১৫

সালে। বন্যা এবং ভূমিধ্বসের কারণে আফ্রিকা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তৃর্ণ এলাকা তছনছ হয়ে যায়। বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে বাঁচতে প্যারিসে ১৯৬-টি দেশ সমবেত হয়ে একটি খসড়া তৈরি করে। তাতে বলা হয়, পৃথিবীর তাপমাত্রা যেন বর্তমানের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি না বাড়ে, সেটা নিশ্চিত করাই হোক বিশ্বের লক্ষ্য।

● **দূষণ ঠেকাতে বাজি প্রাকৃতিক গ্যাস :**

দূষণহীন জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। নিজেদের আয়ের পথ প্রশস্ত করতে তিন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাও এর উপর বাড়তি নজর দিতে চায়। তাদের আশা, কয়েক বছরের মধ্যে এই গ্যাস বিপণন থেকে সংস্থার আয়ের ৫-১৫ শতাংশ উঠে আসবে। এখন যা কার্যত শূন্য। ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম-এর দাবি, মূলত তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করেই ভারতে এর বাড়তি চাহিদা মেটানো যাবে। কাজে লাগানো হবে পূর্ব উপকূলে সঞ্চিত গ্যাসের ভাঁড়ারও। আগামী এক দশকের মধ্যেই তা সম্ভব হবে বলে দাবি ওই তিন সংস্থার। এর জন্য এলএনজি আমদানি টার্মিনাল এবং পাইপলাইন তৈরির পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। শহরাঞ্চলে এধরনের গ্যাস জোগাতে পরিকাঠামো তৈরি করা হবে।পূর্বাঞ্চলে চাহিদা বেশি থাকবে। প্রাকৃতিক গ্যাস কাজে লাগানো যায় রান্না, বিদ্যুৎ তৈরি, পরিবহণে। কেন্দ্রের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে এর ব্যবহার বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা।

● **জীববৈচিত্র্য হারাচ্ছে বৈকাল হ্রদ :**

বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো আর গভীর হ্রদ বৈকাল। রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় প্রায় ৩১,৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বৈকাল হ্রদকে ১৯৯৬ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা দেয় ইউনেস্কো। প্রায় সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি প্রকারের উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীর বাস বৈকালে। তবে হ্রদের বর্তমান হাল কপালে ভাঁজ ফেলেছে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের। যে স্বচ্ছ জলের জন্য বৈকালের খ্যাতি, ক্রমশ সেই স্বচ্ছতা হারিয়ে যাচ্ছে। হ্রদের তলা ঢেকে গেছে পচা শ্যাওলায়। হারিয়ে যাচ্ছে একের পর এক মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী। এমন পরিবর্তনের জন্য কিছুটা হলেও আবহাওয়া বদল ও অতিরিক্ত মাছ শিকারকেই দুষছেন বিজ্ঞানীরা। চলতি বছর অক্টোবরের শুরুতেই, হ্রদে মাছ ধরার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার। 'অমুল' নামে এক বিশেষ ধরনের স্যালমন মাছ, যা গত ২৫ বছর ধরে একমাত্র বৈকালেই পাওয়া যেত, সংখ্যা কমেছে তারও। অতিরিক্ত মাছ ধরার জন্যই বিপর্যস্ত হচ্ছে সামুদ্রিক জীবন। ইউনেস্কো জানাচ্ছে, গত ক'মাসে যে হারে মাছের সংখ্যা কমেছে, তা উদ্বেগজনক। হ্রদের জল আর কোনওভাবেই দূষণভার নিতে পারছে না, তারই ইঙ্গিত জলের নিচে জমে থাকা শ্যাওলা।

● **বৈষ্ণোদেবীতে পুণ্যার্থীর সংখ্যা বেঁধে দিল পরিবেশ আদালত :**

বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে তীর্থযাত্রী সংখ্যা বেঁধে দিল ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এনজিটি)। দিনে ৫০ হাজারের বেশি পুণ্যার্থী সেখানে পুজো দিতে ঢুকতে পারবে না বলে ১৩ নভেম্বর জানায় ট্রাইব্যুনাল। অতিরিক্ত লোকজনকে হয় অর্ধকুয়াড়ি বা কাটরায় আটকে দিতে হবে। পাশাপাশি, মন্দির কমপ্লেক্সের ভিতরে যাবতীয় নির্মাণকার্য সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে বলেছে ট্রাইব্যুনাল। এনজিটি-র তরফে জানানো হয়, বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাওয়ার জন্য একটি নতুন রাস্তা ২৪ নভেম্বর খুলে দেওয়া হবে। তবে সেই রাস্তায় শুধু পায়ে হেঁটে বা ব্যাটারিচালিত যানেই যাওয়া যাবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

- 'ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অর্গানাইজেশন'-এর অনুমতি নিয়ে একটি অ্যাপ তৈরি হয়েছে, 'স্ট্রোক রিস্কোমিটার'। সেখানে বয়স, ওজন, উচ্চতা, রক্তচাপ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে ২০-টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরেই প্রযুক্তি জানিয়ে দেবে, আগামী পাঁচ বছরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্ট্রোকের ঝুঁকি কতটা। প্রায় প্রত্যেকেই এখন স্মার্ট ফোনে বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করেন। 'স্ট্রোক রিস্কোমিটার' অ্যাপের ব্যবহার খুবই সহজ। ঝুঁকির মাত্রা বাড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- চাঁদের মাটিতে বিশাল এক সুড়ঙ্গের খোঁজ পেলেন জাপানের বিজ্ঞানীরা। এই সুড়ঙ্গকে এক দিনের জন্য মানুষের থাকার উপযুক্ত করে তোলা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তারা। ১৯৭১-এ চাঁদের মাটিতে পা ফেলার আগে নাসার বিজ্ঞানীরা দাবি করেছিলেন, চাঁদের মাটির নিচে বড়ো সুড়ঙ্গ আছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে কয়েক মাইল জুড়ে লাভা জমে ফাঁপা অংশের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীদের দাবি, অনেকটা হাওয়াই দ্বীপের কাউমুনা লাভা টিউবের মতো দেখতে এই সুড়ঙ্গগুলি। তবে সেসময় প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে বিষয়টা বেশি দূর এগোয়নি। সম্প্রতি জাপানের সেলেনোলজিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপ্লোরার (সেলেন) মারিয়াস পাহাড়ের কাছে এই সুড়ঙ্গটি খুঁজে পেয়েছে। প্রায় ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৩৩০ ফুট চওড়া এই সুড়ঙ্গটি। মনে করা হচ্ছে, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সাড়ে ৩০০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে।
- সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের জসপুরে টি-রেক্সের মতো দেখতে এক অদ্ভুত প্রাণীর দেহাবশেষ মিলেছে। তবে এই দেহাবশেষটি ঠিক কোথা থেকে পাওয়া গিয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। এমনকী সেটা কোন প্রাণীর দেহাবশেষ তাও এখনও নিশ্চিত করে জানা যায়নি। প্রাণীটির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, গত অক্টোবর মাসেই গুজরাতের কচ্ছ থেকে একটি কঙ্কাল উদ্ধার হয়। সেটি ইকথিওসরের বলে দাবি করেছিলেন অনেকে। ইকথিওসর একটি প্রাগৈতিহাসিক সামুদ্রিক প্রাণী। এছাড়াও মার্চ মাসে মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূট থেকে ১৫০ কোটি বছর পুরনো লাল শৈবালের জীবাশ্ম মেলে।

● **বিশ্বের প্রথম রোবট নাগরিক :**

সোফিয়া হল ইন্টেলিজেন্স হিউম্যানয়েড রোবট। হ্যানসন রোবটিক্স-এর পরীক্ষাগারে সোফিয়াকে তৈরি করার দায়িত্বে ছিলেন ডেভিড হানসন। এধরনের মানব-রোবট তৈরির ক্ষেত্রে খ্যাতি রয়েছে তার। হ্যানসন রোবটিক্স-এর পরীক্ষাগারে তৈরি হওয়া রোবটগুলির মধ্যে আধুনিকতম সোফিয়া। চটপট যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে সে রীতিমতো দড়। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের সামনে দাঁড়াতে দেখা গেছে তাকে। সাবলীলভাবে যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখা গিয়েছে। সুরেলা কণ্ঠে গান গাইতেও শোনা গেছে। শুধু সংবাদ মাধ্যম নয়, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি, শিল্পপতিদের সঙ্গেও সমান সাবলীনভাবে কথা বলতে দেখা গেছে তাকে। দেখা গিয়েছে আলোচনার মঞ্চে তথা উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনেও যোগ দিতেও। এবার বিশ্বের প্রথম রোবট হিসেবে নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পেতে চলেছে সোফিয়া। সৌদি আরব তাকে সেদেশের নাগরিকত্ব দিচ্ছে।

● **মশা মারার ফাঁদ-যুক্ত আলো :**

মানুষের নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে আসা ল্যাকটিক অ্যাসিড মশাদের আকর্ষণ করে। তাদের টেনে আনে মানুষের দিকে। মশার সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়েই মালয়েশিয়ায় তৈরি হয়েছে এক নতুন ধরনের সৌর আলো। তবে ল্যাকটিক অ্যাসিড নয়। এক্ষেত্রে মশাদের টোপ হাল্কা ঘনত্বের কার্বন ডাই-অক্সাইড। কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রকের পরামর্শদাতা শান্তিপদ গণচৌধুরী সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা দেখেছেন, আলোর অতিবেগুনি রশ্মির সঙ্গে টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইডের বিক্রিয়ায় মৃদু (কম ঘনত্বের) কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হচ্ছে। আর আলো জ্বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই মশারা আলোর দিকে ছুটে আসছে। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাই তৈরি করা হয়েছে এক বিশেষ ধরনের সৌর বিদ্যুৎচালিত আলো। আলোগুলো জ্বলার পর তা থেকে নির্গত কম ঘনত্বের কার্বন ডাই-অক্সাইড ফাঁদের মতো টেনে আনে মশাদের। নিচে রাখা জালে মশারা আটকে গিয়ে মারা পড়বে।

● **পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বিরলতম হাঙরের হদিশ :**

অতলান্ত মহাসাগরের তলায় থাকা রাক্ষুসে হাঙর। ৮ কোটি বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরে সাড়ে ৫ হাজার ফুট গভীরতায় সাঁতরে বেরিয়েছে। বেধড়ক মাছ ধরা বন্ধ করার অভিযানে নেমে হালে পর্তুগালে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের একটি সৈকতে ডাইনোসর যুগের সেই হাঙরের হদিশ পেয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির গবেষকরা। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই 'ফ্রিলড শার্ক'-দের বলে 'কিয়ামাইডোসেলাকাস অ্যাঙ্গুইনাস'। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রজাতির হাঙররাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বিরলতম প্রাণীদের অন্যতম। মাথাটা ঠিক সাপের মতো। দাঁতের সংখ্যা ৩০০। অস্ত্রোপচারের নিডলের মতো ধারালো সেই দাঁতগুলি সাজানো ২৫-টি সারিতে। কানকোগুলি ব্লাডারের মতো ফোলানো। লম্বায় এরা ৬ ফুটেরও বেশি হতে পারে। মূলত জাপান, নিউজিল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ায় মহাসাগরের অনেক গভীরেই এদের বসবাস। কোনওভাবে তা চলে এসেছিল পর্তুগালে, আটলান্টিক মহাসাগরের একটি সৈকতে। তবে কীভাবেই বা ডাইনোসর যুগের এই প্রাণীরা এতদিন ধরে টিকে রয়েছে পৃথিবীর বুকে, তা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি বিজ্ঞানীরা।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিনোদন

● **নিলামে রেকর্ড দা ভিঞ্চির ছবির :**

৫০০ বছরের পুরোনো নিলাম সংস্থা, 'ক্রিস্টিজ' লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-র ছবি 'সালভাতোর মুন্ডি' (বিশ্বের ত্রাতা) নামক ছবিটি নিলামে তুলেছিল। গত ১৬ নভেম্বর নিউ ইয়র্কে সেটি বিক্রি হল ৪৫ কোটি ডলারে। এই প্রথম কোনও শিল্পকর্ম এমন রেকর্ড দামে বিক্রি হল। এর আগে ২০১৫ সালের মে মাসে পিকাসোর আঁকা 'ওমেন অব অ্যালজিয়ার্স' নামে ছবিটি নিলাম হয়েছিল ১৭.৯৪ কোটি ডলারে। সেই রেকর্ডই এবার ভেঙে গেল। 'সালভাতোর মুন্ডি' নামে ছবিটি ভিঞ্চি এঁকেছিলেন ১৫০৫ সালের কিছু পরে। রেকর্ড গড়া ওই ছবিটি যিশু খ্রিস্টের। ছবিতে তিনি এক হাত তুলে রয়েছেন এবং তাঁর জন্য হাতে রয়েছে একটি কাঁচের গোলক।

● **মিস ওয়ার্ল্ড ভারতের মানুষী ছিল্লার :**

এশিয়ার মধ্যে ভারতই প্রথম মিস ওয়ার্ল্ডের খেতাব ছিনিয়ে নিয়েছিল। সেটা ১৯৬৬ সাল। সেবার ডাক্তারির ছাত্রী রীতা ফারিয়া ভারত তো বটেই, এশিয়ার ইতিহাসে প্রথম মিস ওয়ার্ল্ড হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে তার ঠিক অর্ধ শতাব্দী পর সেই একই খেতাব জয় করলেন আর এক ডাক্তারি ছাত্রী। তিনি মানুষী ছিল্লার। ১০৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে হরিয়ানার মেয়ে মানুষী ১৮ নভেম্বর মিস ওয়ার্ল্ড ২০১৭ নির্বাচিত হয়েছেন। চিনের সান্যা সিটিতে মানুষীর মাথায় বিশ্ব সুন্দরীর মুকুট পরিয়ে দেন গত বছরের সেরা, পুয়ের্তো রিকোর স্টিফেনি ডেল ভ্যালে। উল্লেখ্য, রীতা ফারিয়ার পর দীর্ঘ কয়েক দশক ভারত থেকে কেউ ওই খেতাব জেতেননি। শেষে খরা কাটে ১৯৯৪ সালে। সেবার বিশ্ব সুন্দরীর খেতাব পেয়েছিলেন ঐশ্বর্যা রাই। তারপর ১৯৯৭ সালে ডায়না হেডেন, ১৯৯৯ সালে যুক্তামুখী এবং ২০০০ সালে প্রিয়ঙ্কা চোপড়া মিস ওয়ার্ল্ডের শিরোপা পেয়েছেন। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় এর আগে ১৯৯৪ সালে সুস্মিতা সেন মিস ইউনিভার্সের খেতাব নিয়ে এসেছিলেন ভারতে। ২০০০ সালে সেই একই খেতাব এনেছিলেন লারা দত্ত।

প্রয়াণ

● **গিরিজা দেবী :**

প্রয়াত প্রবাদপ্রতিম শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী গিরিজা দেবী (৮৮)। গত ২৪ অক্টোবর কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। ওই দিনই সকালে বুকে ব্যাথার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাকে। সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়। অনেক দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন শিল্পী। ১৯২৯-এর ৮ মে বারাণসীতে জন্ম গিরিজা দেবীর। ছিলেন বেনারস ঘরানার শিল্পী। ধ্রুপদী ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি ঠুংরিকে জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে তার যথেষ্ট অবদান ছিল। বারাণসী থেকে পরে কলকাতায় চলে আসেন। তারপর এই শহরেই থেকে যান গিরিজা দেবী। বেনারস ঘরানার এই শিল্পী পূরব অঙ্গের ঠুংরি পরিবেশনায় এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিলেন। তার কণ্ঠে দাদরা, টপ্পা, কাজরি ছিল শ্রোতাদের পছন্দের শীর্ষে। নিয়মিত আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। ২৬ এবং ২৯ অক্টোবর জয়পুর ও পুণেতে অনুষ্ঠান করার কথা ছিল। পেয়েছেন পদ্মশ্রী (১৯৭২), পদ্মভূষণ (১৯৮৯) এবং পদ্মবিভূষণ (২০১৬) সম্মান।

● **দিনা ওয়াদিয়া :**

পাকিস্তানের কয়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্নার কন্যা দিনা ওয়াদিয়া (৯৮) গত ২ নভেম্বর নিউ ইয়র্কে মারা গেলেন। জিন্না বিয়ে করেছিলেন পার্সি পরিবারের মেয়ে রতনবাইকে। কিন্তু কিছু দিন পরে তারা আলাদা হয়ে যান। রতনবাই তার কিছু পরে মারাও যান। মেয়ে দিনা তাই বাবার কাছেই মানুষ। ১৯১৯ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাত পেরিয়ে, অর্থাৎ ১৫ তারিখে তার জন্ম হয়েছিল বম্বের বাড়িতে। পরে ১৪ আগস্টই পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস হয়ে দাঁড়ায়, ১৫ ভারতের। ততদিনে অবশ্য বাবার সঙ্গে বেশ কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে মেয়ের। কারণ দিনাও বিয়ে করেছিলেন পার্সি পরিবারে, সেটা জিন্না মন থেকে মানতে পারেননি। জিন্নার শেষকৃত্যেই দিনা প্রথমবার পাকিস্তানে যান। মুম্বইয়ের শিল্পপতি নেভিল ওয়াদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন দিনা। নুসলি ওয়াদিয়া এবং ডায়না ওয়াদিয়া তাদের সন্তান।

● **ইয়ানা নোভোতনা :**

দীর্ঘ দিন ধরেই ভুগছিলেন ক্যানসারে। গত ১৯ নভেম্বর শেষ পর্যন্ত ৪৯ বছর বয়সে শেষ হল উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ইয়ানা নোভোতনার জীবনযাত্রা। চেক প্রজাতন্ত্রের নোভোতনা ১৯৯৮ সালে মহিলাদের সিঙ্গলস উইম্বলডন জিতেছিলেন। মহিলা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের এক বার্তায় জানানো হয়েছে, ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর চেক প্রজাতন্ত্রে তার নিজের শহরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই সময় তার পরিবারের সকলেই ছিলেন তার কাছে। ১৯৮৮ সালে নোভোতনা ফাইনালে হারিয়েছিলেন নাথালি তাউজিয়াতকে। খেলার ফল ছিল ৬-৪, ৭-৬ (৭-২)। সেবারই সেমিফাইনালে মার্টিনা হিঙ্গিসকে হারিয়েছেন নোভোতনা। এরপর ডব্লুটিএ। ট্যুরে ২৪-টি সিঙ্গলস টাইটেল জিতেছিলেন। তাছাড়া ১২-টি গ্রান্ডস্লাম ডাবলস ও চারটি মিক্স ডাবলসও রয়েছে তার ঝুলিতে।

● **প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি :**

প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা বেশ কয়েক বারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন ২০ নভেম্বর নয়াদিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালে মারা যান। ২০০৮ সালে নবমীর রাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দেশের তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। তাকে দ্রুত পশ্চিমবঙ্গের কালিয়াগঞ্জ থেকে নয়াদিল্লির এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। পরে তাকে এইমস থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল দিল্লিরই ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালে। সেখানেই প্রয়াত হলেন। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, মাসখানেক ধরে তার অসুস্থতা বেড়েছিল। ৭২ বছরের রাজনীতিক আর সেই অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারলেন না।

বিবিধ

● **গিনেস রেকর্ডে ভারতের খিচুড়ি :**

দিল্লির আন্তর্জাতিক খাদ্য উৎসবে বিশ্বরেকর্ড গড়ে ৫ নভেম্বর খিচুড়ি রান্না হল ৯১৮ কেজি। মিলল গিনেস বুকে স্বীকৃতি। পরবর্তী ধাপে ভারতের এই 'সুপার ফুড'-কে গোটা পৃথিবীতে জনপ্রিয় করার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। ইন্ডিয়া গেট প্রাঙ্গনে রান্নার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল আগের দিন রাত থেকেই। সকালে রান্না শুরু। রান্না শেষে ক্রেন দিয়ে বিশাল হাঁড়িটিকে ওজন করালে দেখা যায়, মোট ৯১৮ কেজি খিচুড়ি রান্না হয়েছে। বিদেশে খিচুড়িকে জনপ্রিয় করাটা লক্ষ্য হওয়ায় রান্না দেখতে ডাকা হয়েছিল অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিকে। রান্না শেষে ভারতের 'সুপার ফুড' চেখেও দেখেন তারা। পরে ওই খিচুড়ির একটি বড়ো অংশ বিতরণ করা হয় অনাথ শিশু ও দিল্লির বস্তিবাসীদের মধ্যে।

● **বিশ্বের ক্ষমতাশালী ১০০ জন মহিলা :**

সম্প্রতি বিশ্বের ক্ষমতাশালী ১০০ জন মহিলার নামের তালিকা প্রকাশ করেছে মার্কিন ম্যাগাজিন 'ফোর্বস'। তালিকার শীর্ষে রয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল। এ নিয়ে মোট ১২ বার শীর্ষস্থানে রয়েছে তার নাম। দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মেলিন্ডা গেটস, বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও বিল গেটসের স্ত্রী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কা রয়েছেন ১৯ নম্বরে। প্রথম এই তালিকায় তিনি স্থান পেয়েছেন। তালিকায় ৩০ নম্বরে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বছরের তুলনায় ছয় ধাপ উপরে উঠে এসেছেন। গত বছরের তুলনায় একটু পিছিয়ে গিয়েছেন মায়ানমারের নোবেল জয়ী নেত্রী অং সাং সু চি। গতবারের তালিকায় তিনি ২৬-এ ছিলেন। এবার রয়েছেন ৩৩ নম্বরে।

তালিকায় পাঁচ জন ভারতীয় মহিলার নামও রয়েছে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সিইও চন্দা কোছার রয়েছেন ৩২ নম্বরে। এইচসিএল এন্টারপ্রাইজ-এর সিইও রোশনী নাদার মালহোত্রা রয়েছেন তালিকায় ৫৭ নম্বরে। এইচটি মিডিয়ার চেয়ারপার্সন এবং এডিটোরিয়াল ডিরেক্টর শোভনা ভারতীয়া রয়েছেন তালিকার ৯২ নম্বরে। এরপরই নাম রয়েছে বায়োকনের প্রতিষ্ঠাতা কিরণ মজুমদার শ'-এর। পেপসিকো সিইও ইন্দ্রা নুয়ির নাম রয়েছে তালিকার ১১ নম্বর স্থানে। বিশ্বের ১০০ জন ক্ষমতাশালী মহিলার তালিকায় ঢুকে পড়েছেন আরও এক ভারতীয়, ৯৭ নম্বরে রয়েছেন অভিনেত্রী প্রিয়ঙ্কা চোপড়া।

● **বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতাকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি :**

এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতাকে 'মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' এবং 'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ'-এর স্বীকৃতি দিল ইউনেস্কো। ইতিহাস বলে, শেখ মুজিবুর রহমানের এই ১৭ মিনিটের জ্বালাময়ী বক্তৃতা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সর্বস্ব পণ করে স্বাধীনতার লড়াইয়ে নামার প্রেরণা জোগায়। পাকিস্তান সরকার মুজিবকে গ্রেপ্তার করলেও ভারতের সর্বতো সহযোগিতায় স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে বাঙালি জাতি। এই স্বীকৃতির জন্য ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুজিবকন্যা তথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

● **৭০-টি ভারতীয় শব্দ অক্সফোর্ড ইংরাজি ডিকশনারিতে :**

তামিল ও তেলুগুতে 'আন্না' শব্দের অর্থ বড়ো ভাই। আদ্যন্ত এই ভারতীয় শব্দটিই এবার জায়গা করে নিল অক্সফোর্ডের ইংরাজি অভিধানে। সেই সঙ্গে উর্দু শব্দ 'আব্বা' মানে বাবা, 'বড়ো দিন' (ক্রিসমাস), 'বাপু' (বাবা), 'ব্স' (থামা), 'চাচা' (কাকা)-ও জায়গা পেয়েছে অভিধানে। তামিল, তেলুগু, উর্দু, গুজরাতি, হিন্দি, বাংলা মিলিয়ে মোট ৭০-টি ভারতীয় শব্দের সন্ধান মিলবে এবারের অক্সফোর্ড ইংরাজি অভিধানে। শব্দগুলি ভারতীয় সংস্কৃতি, সম্পর্ক বা খাবারের সঙ্গে যুক্ত। যেমন—'গুলাব জামুন' (মিষ্টি), 'কিমা', 'মির্চ', 'মির্চ মশলা', 'নমকিন', 'দম', 'গোস্ত'। রোজকার কথায় ব্যবহৃত হয় এমন কিছু শব্দও এবার পাওয়া যাবে ইংরাজি অভিধানে। যেমন—'জুগাড়', 'ছি ছি', 'ফান্ডা', 'আচ্ছা', 'নাটক', 'চুপ', 'টাইমপাস'। সম্মানসূচক কিছু শব্দ যেমন 'জি', 'মাতা', 'জয়'-এর যেমন দেখা মিলবে অভিধানে, তেমনি 'চামচা', 'দাদাগিরি'-রও দেখা মিলবে। চলতি কথায় ব্যবহৃত হয় এমন কিছু শব্দও জায়গা করে নিয়েছে অভিধানে। যেমন, 'চাক্কা জ্যাম'। তাছাড়া, 'দেবী', 'দিদি', 'সেবক'—রয়েছে এই শব্দগুলিও। বাসস্থান অর্থে ব্যবহৃত শব্দেরও দেখা মিলবে। তার মধ্যে রয়েছে—'নগর', 'নিবাস', 'কিলা' বা কেল্লা। 'সূর্য নমস্কার', 'টপ্পা' (লোকসঙ্গীত) ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এই শব্দগুলিও স্থান পেয়েছে অক্সফোর্ডের ইংরাজি অভিধানে।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী
(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এবারও সাফল্যে No.1

1st EXE WBCS - 2015
Souvik Ghosh

1st CTO WBCS - 2015
Moumita Sengupta

1st CTO WBCS - 2014
Suraiya Gaffar

2nd CTO WBCS - 2014
Md Shabbar Khan

2nd DSP WBCS - 2014
Saquib Ahmed

4th EXE WBCS - 2016
Shantanu Singha Thakur

5th EXE WBCS - 2016
Debjit Dutta

6th EXE WBCS - 2016
Tuhin Subhra Mahanty

3rd SCFS WBCS - 2016
Dipanjan Jana

4th CTO WBCS - 2014
Amartya Debnath

4th EXE WBCS - 2014
Abhishek Basu

4th DSP WBCS - 2014
Rohed Shaikh

WBCS Gr. A-এর মোট সাফল্যের মধ্যে আমাদের ছাত্রছাত্রীর শতকরা হার

YEAR	PSC-এর মোট সিলেকশন	অ্যাকাডেমিকের ছাত্রছাত্রী	সাফল্যের শতকরা হার
WBCS-2016	67	21	31.5%
WBCS-2015	113	30	27%
WBCS-2014	182	43	24%
WBCS-2013	149	35	23%

SUCCESS RATE OF ACADEMIC ASSOCIATION

WBCS SCANNER 4th Edition

'এখন আরোও বেশী তথ্য, আরোও বেশি পৃষ্ঠা, আরোও বেশি কমন'

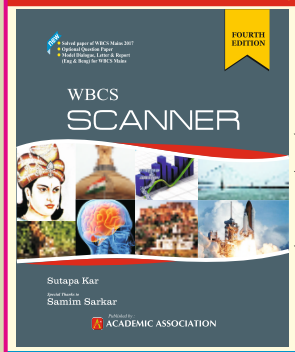

● ১৯ বছরের প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সমাধান ●২০১৭, ২০১৬, ২০১৫, ২০১৪ মেন প্রশ্নপত্রের সমাধান ● কমনযোগ্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ● বাংলা এবং ইংরেজী (কম্পালসারি) বিষয়ের নমুনা ডায়লগ, চিঠি , রিপোর্ট; এবং প্রতিবেদন ● অপশনাল-২০১৭ এর প্রশ্ন।

প্রকাশিত হল

✆ 7031842001, 9038786000

অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্স

ইয়ারবুক অ্যান্ড প্রিলি প্র্যাকটিস্ সেট

এতে পাবেন

● ডব্লুবিসিএস প্রিলি প্র্যাকটিস সেট (বাংলা এবং ইংরাজী উভয় মাধ্যমে) ● সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ● কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রচুর এম.সি.কিউ (বাংলা) ● ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতির টিপস্

এছাড়াও থাকছে ডব্লুবিসিএস টপারের সাক্ষাৎকার ঃ সাফল্যের সূত্রে

প্রথম প্রকাশঃ ২২শে ডিসেম্বর, ২০১৭

✆ 7031842001, 9038786000

WBCS-2018 মেনসের ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

H.O : The Self Culture Institute 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

✆ 9038786000
9674478600
9674478644

Website : www.academicassociation.in ■ Centre: Uluberia-9051392240 ✹Barasat-9073587432 ✹Berhampur-9474582569 ✹Birati-9674447451 ✹ Medinipur-9474736230 ✹Darjeeling-9832041123 ✹Siliguri-9474764635

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

December, 2017
R.N.I. No. 19740/69

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

১২৫ কোটি ভারতীয় দুর্নীতি ও কালো টাকার বিরুদ্ধে বৃহত্তম যুদ্ধে নেমে বিজয়ী !

বিমুদ্রীকরণের বিপুল ও ঐতিহাসিক সাফল্য

দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কালো টাকার হদিশ

দেশের জনসংখ্যার ০.০০০১১ শতাংশ মানুষ দেশে মোট নগদ টাকার ৩৩ শতাংশ জমা দিয়েছেন

১৭.৭৩ লক্ষ সন্দেহজনক লেনদেনের হদিশ

২৩.২২ লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩.৬৮ লক্ষ কোটি সন্দেহ-জনক নগদ টাকা জমা পড়ে

৬ লক্ষ কোটি টাকার উচ্চ-মূল্যের নোট বাস্তবে কমেছে

সন্ত্রাসবাদ ও নকশালবাদের কোমর ভেঙ্গে গেছে

কাশ্মীরে পাথর ছোঁড়ার ঘটনা ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে

বামপন্থী উগ্রবাদের ঘটনা কমেছে ২০ শতাংশেরও বেশি

৭.৬২ লক্ষ নকল নোট উদ্ধার হয়েছে

সাফসুতরো অর্থনীতির দিশায় এক দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী পদক্ষেপ

কালো টাকার লেনদেনে যুক্ত শেল কোম্পানিগুলির অসাধু চক্রের হদিশ

শেল কোম্পানির ওপর 'সার্জিকাল স্ট্রাইক', ২.২৪ লক্ষ কোম্পানির ঝাঁপ বন্ধ

বিমুদ্রীকরণের পর ৩৫ হাজার শেল কোম্পানি প্রায় ৫৮ হাজার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৭ হাজার কোটি টাকা জমা করেছে ও উঠিয়েছে

সংগঠিত ক্ষেত্রে গরিবদের জন্য আরও বেশি রোজগারের সুযোগ হয়েছে

কর্মচারীদের পুরো বেতন সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা

১.০১ কোটি নতুন EPFO নিবন্ধিভুক্ত হয়েছে

১.৩ কোটি কর্মচারী ESIC-এ নথিভুক্ত হয়েছেন; এদের সকলের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা

বিমুদ্রীকরণের জেরে করদাতাদের সংখ্যায় অভূতপূর্ব বৃদ্ধি

- করদাতাদের সংখ্যায় ২৬.৬০% বৃদ্ধি, ২০১৫-'১৬-তে ৬৬.৫৩ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০১৬-'১৭-তে হয়েছে ৮৪.২১ লক্ষ
- 'ই-রিটার্ন'-এর সংখ্যায় ২৭.৯৫% বৃদ্ধি, ২০১৬-'১৭-তে ২.৩৫ কোটি থেকে বেড়ে ২০১৭-'১৮-তে ৩.০১ কোটি

সীমিত-নগদের মাধ্যমে স্বচ্ছ অর্থনীতির দিশায় ভারত এক লাফে অনেকটা এগোলো

- ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে ৮৭ কোটি ডিজিটাল লেনদেন হয়; ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৮ কোটি; অর্থাৎ, ৫৮% বৃদ্ধি
- এ পর্যন্ত ১৫.১১ লক্ষ POS যন্ত্র চালু ছিল; বিমুদ্রীকরণের পর মাত্র এক বছরেই ১৩ লক্ষেরও বেশি নতুন POS যন্ত্র চালু করা হয়েছে

বিমুদ্রীকরণের জেরে দেশবাসীর প্রচুর ফায়দা হয়েছে, যেমন কি না ব্যাঙ্ক ঋণে সুদের হার হ্রাস, ঘরবাড়ি ক্রয় সস্তা ও সহজ, পুর প্রশাসনগুলির আয় বৃদ্ধি।

davp22201/13/0007/1718

সত্যমেব জয়তে
ভারত সরকার

বিমুদ্রীকরণ থেকে আপনি কী পেলেন ?

জানার জন্য QR কোড স্ক্যান করুন

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক ৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।